প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৪

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আজ অবক্ষয়ের লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট। সেই অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক 'অপসংস্কৃতি' এই সাধারণ কথাটির মধ্য দিয়ে পরিব্যক্ত। অপসংস্কৃতির সমস্যা আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ তথা সুস্থ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা সমাজের মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রেরই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে উঠেছে।

আমরা এই সংকলন গ্রন্থে আদর্শ-সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির বিকার এই দুই দিক সম্বন্ধেই যতদূর সম্ভব একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সূত্রপাত করলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য নিয়ে চারদিকে বিচার বিতর্ক চিন্তামন্থন চলুক, এই আমাদের অভিপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সাহিত্যে ও বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুপরিচিত প্রবীণ ও নবীন ষোলজন বিশিষ্ট প্রগতিশীল লেখক তাঁদের মূল্যবান রচনা পাঠিয়ে এই গ্রন্থের পরিকল্পনার রূপায়ণ চেষ্টায় সহযোগিতা করেছেন, এঁদের প্রত্যেকেরই কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ সাহিত্য সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। তাঁকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বইখানির প্রকাশক হিসাবে আমাদের কিছু নিবেদন আছে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে যে সকল মতামত ব্যক্ত হয়েছে সেগুলি সেই সেই প্রবন্ধের লেখকের উদ্দিষ্ট বক্তব্যের অঙ্গ। সংশ্লিষ্ট লেখকই তাঁর স্বকীয় বক্তব্যের জন্য দায়ী। তার সঙ্গে আমাদের জড়ালে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করা হবে। প্রকাশক হিসাবে আমাদের ভূমিকা এখানে পরিবেশকের—ওই ভূমিকা পালনেই আমাদের দায়িত্ব শেষ।

তবু যে পূর্বোক্ত ষোলজন বিশিষ্ট লেখকের রচনা আমরা এই গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একত্র সন্নিবদ্ধ ও প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি সে এই কারণে যে, এঁদের সকলেরই চিন্তার মধ্যে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটেছে এবং সে-দৃষ্টিকোণ হলো অগ্রসর ভাবনার, সমাজচেতনা মণ্ডিত সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শের প্রতি আনুগত্যপরায়ণতার। আমরা চাই সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির বিষয়ে এঁরা এঁদের প্রবন্ধে তাঁদের পরিণত চিন্তার ফল হিসাবে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করেছেন সে সম্বন্ধে দেশব্যাপী একটা আলোচনার আলোড়ন উঠুক, পক্ষে বিপক্ষে বিষয়টির সকল দিক নিয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-বিচারণা চলুক।

অর্থাৎ এককথায়, আমরা এখানে একটি মুদ্রিত শব্দের আলোচনা-চক্রের (সিম্পোসিয়াম) উদ্বোধন করলাম। এর প্রভাব চারদিকে অনুভূত হোক, এই আমরা দেখতে চাই।

এই গ্রন্থের সংকলনে আমরা একাধিক জনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্থার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা বিশেষ সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করতে হয়। এঁরা নিজেরা সংকলনে তো লিখেছেনই, লেখা সংগ্রহেও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। ইন্দ্রনাথবাবু, উপরন্তু, এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। বস্তুতঃ, সংকলন-সম্পাদক ও প্রকাশক এই উভয় পক্ষের সঙ্গে এঁদের সানন্দ ইচ্ছার যোগ না হলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারতো কিনা সন্দেহ।

পরিশেষে, বইটির যে উদ্দেশ্যে প্রচার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো। সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমরা বইখানি বাংলাভাষাভাষী জনসাধারণের হাতে তুলে দিলাম।

ভূমিকা

১

সংস্কৃতি একটি সদর্থক, রচনাত্মক, সুস্থ শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী, যা জীবনকে সুন্দর করে, প্রাণবান করে, সার্থক করে। অপসংস্কৃতি ঠিক তার বিপরীত। কথাটার ব্যাকরণগত ঔচিত্য যাই হোক, এটা একটা প্রচলিত মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য শব্দ। ব্যাপক ব্যবহারে এর বৈয়াকরণিক দোষ অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে। এখন, অপসংস্কৃতি কথাটার মধ্যেই যে শুধু নঙর্থকতার ব্যঞ্জনা আছে তা-ই নয়, তার পরিণামও নঙর্থক। অপসংস্কৃতি জীবনকে অসুন্দর করে, কুরুচিময় করে, তার প্রবৃত্তিকে বিপথগামী ক'রে তাকে অস্থির ও অশান্ত করে তোলে। তামসিকতায় এর স্থিতি, বিকারে এর পুষ্টি।

এ থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে অপসংস্কৃতি বস্তুটি মানবতা-বিরোধী, জন-বিরোধী। যে-শিল্পের চর্চায় ও উপভোগে মানুষের প্রবৃত্তি নিম্নগামী হয় তা কখনই জনকল্যাণমূলক হতে পারে না। যদি বলেন শিল্পের সঙ্গে জনকল্যাণের কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, শিল্প ব্যক্তিমনের সৃষ্টি সুতরাং ব্যক্তিগত উপ-ভোগেই তার চূড়ান্ত সার্থকতা—তার উত্তরে বলবো যে, এই প্রমাদপূর্ণ মনোভাবই যত অনর্থের কারণ। শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সুকুমার কলা ইত্যাদিকে ঘিরে এতকাল যে মানবজীবনে বহুবিধ বিপত্তি দেখা গিয়েছে তার একটা প্রধান হেতুই হলো শিল্পের বিচারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং সেই পরিমাণেই জনগণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্নটিকে উপেক্ষা। অর্থাৎ নান্দনিক ক্ষেত্রে এতাবৎ সমষ্টির ধারণাকে শোচনীয়রূপে অবহেলা করা হয়েছে। তার থেকেই যত অনাচার আর অমিতাচারের উদ্ভব। অপসংস্কৃতি মানেই হলো সংস্কৃতির অনাচার; আর এই অনাচারের মূলে আছে জনস্বার্থবিরোধী একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

সংস্কৃতি সমাজমনের দর্পণ। সমাজের সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগ। আর যেহেতু সমাজের সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগ সেই কারণে বহু মানুষের ভাবনা-ধারণা-হিতা-হিতের প্রশ্নকে বাদ দিয়ে কোন সময়েই সংস্কৃতির তরু বিবর্ধিত হয়ে উঠতে পারে না। হলে তার ফল মারাত্মক হয়। এতাবৎ সংস্কৃতির নামে যত অমিতাচার হয়েছে তার সবই হয়েছে এই ভ্রমাত্মক চিন্তাকে কেন্দ্র করে যে, সংস্কৃতির ভাল-মন্দের সঙ্গে জনসাধারণের ভাল-মন্দের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু তা-ই নয়,

জনসাধারণের ভাল হলো কি মন্দ হলো তাতে নাকি বিশুদ্ধ সংস্কৃতির কিছু আসে-যায় না। সংস্কৃতি-কুসুমের জন্ম ব্যক্তি-মনের মৃত্তিকায়, তার' সৌন্দর্যের উপভোগও নাকি মূলতঃ ব্যক্তির স্তরেই সীমিত থাকা উচিত, জনসাধারণকে এই উপভোগের বলয়ের মধ্যে টেনে আনার কোন কথাই উঠতে পারে না।

পুনরপি বলি, এই সর্বনাশা মতবাদের রন্ধ্রপথেই সংস্কৃতির দেহে অপসংস্কৃতির কলির আবির্ভাব। সংস্কৃতির রাজ্যে ব্যক্তিবাদের যত বেশী প্রাধান্য, অপসংস্কৃতির তত বেশী রবরবা। অপসংস্কৃতির ধারাধরনের মধ্যে সমষ্টিজীবন কিংবা সমষ্টি-চেতনার কোন ছায়াপাত ঘটে না বলেই তা এত সহজে জনবিরোধী হয়ে উঠতে পারে। জনসাধারণের প্রতি শিল্প-সাহিত্যের যদি কোন দায় না থাকে তবে তার নিরঙ্কুশ হয়ে উঠবার পথে আর বাধা রইলো কোথায়। ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছে অপসংস্কৃতির বেলায়। অপসংস্কৃতির বেসাতিওয়ালারা বিশুদ্ধ নন্দনচর্চার অজুহাতে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃতিকে আজ বলতে গেলে চরম ধ্বংসের পারঘাটায় এনে ফেলেছে। এই অনিষ্টকর প্রক্রিয়া অবিলম্বে প্রতিরুদ্ধ হওয়া দরকার। নয়তো সংস্কৃতিরও বিনষ্টি, জন-সাধারণেরও বিনষ্টি। জনবিরোধী সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার আবহাওয়া অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, সে লক্ষণ অতি স্পষ্ট।

সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির প্রশ্নে শুধুমাত্র সংস্কৃতির নিজস্ব জগতের কথা চিন্তা করলেই চলে না, তার সঙ্গে অর্থনীতির প্রশ্নটিকেও জড়াতে হয়। বস্তুতঃ, এ দুইয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক। অর্থনীতি রয়েছে সমাজের ভিত্তিতে আর সংস্কৃতির বিকাশ সমাজের উপরিতলের সৌধে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সংঘর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে-আলোড়নের সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার প্রতিঘাত এসে পড়ে। ভিত্তিতলায় কাঁপন জাগলে উপরতলায়ও তার কাঁপন জাগবে এ অতি স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, উপরের সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকাণ্ড ভিত্তিতলের আলোড়ন-বিলোড়নেরই শৈল্পিক প্রতিফলন মাত্র—একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটু চোখ মেলে তাকালেই এ কথার সত্যতা যাচাই হতে পারে।

সংস্কৃতি চর্চার নামে ব্যক্তিবাদের আত্যন্তিক অনুশীলনের মূলে রয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিবিধ অশ্রদ্ধেয় মূল্যবোধের সংস্কার। পশ্চিমেই এই সংস্কার সমধিক বলবৎ দেখতে পাই। এই যে কথায় কথায় শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধুয়া তোলা হয় আর সমষ্টিকে তার বেদীমূলে বিসর্জন দেওয়ার একটা প্রকট চেষ্টা দেখা যায় তার চর্চা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতেই বিধিবদ্ধভাবে হয়ে এসেছে এযাবৎ। এসব দেশের শোষণমুখী অসাম্য-অবিচার-অত্যাচার ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির গর্ভ থেকে যে সংস্কৃতির জন্ম হওয়া সম্ভব, সেই ধরনের সংস্কৃতিই সে সব দেশে জাঁকিয়ে এসেছে এতাবৎ কাল। সাহিত্যে অশ্লীলতা, নাটকে নগ্ননৃত্য, চিত্রকলায় কিমিতিবাদ ও অন্যান্য উন্মার্গগামী স্বৈরাচার, ভাস্কর্যে নিরাবরণ নর ও নারী দেহের প্রদর্শনী, সিনেমায় যৌন মিলনের বেলেল্লাপনা, এককথায় সুকুমার কলার প্রতিটি বিভাগে বাস্তবতার অজুহাতে চূড়ান্ত রকমের ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারিতার হদ্দ করে ছাড়া হয়েছে। সবই ঘটানো হয়েছে শিল্পীর তথাকথিত ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাবার তাগিদে—দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের হিতাহিত মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা এঁদের এই সব শিল্প-পরিকল্পনার মধ্যে আদৌ কখনও স্থান পায়নি। তাই 'শিল্পের জন্যই শিল্প', 'আমার জন্যই শিল্প', 'বিশুদ্ধ আর্টই শিল্পীর একমাত্র উপাস্য হওয়া উচিত, আর সব প্রসঙ্গ অবান্তর'—এ জাতীয় উদ্ভট, অদ্ভুত, ক্ষতিকর সব মতবাদ পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন দেশের শিল্পী সমাজে দিনের পর দিন প্রায় অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে এসেছে দীর্ঘকাল। অপসংস্কৃতি আর কিছু নয়, ধনতন্ত্রের ঔরসে স্বৈরিণী বুর্জোয়া বিলাসিনীর গর্ভের এক অপজাত সন্তান। অবৈধ তার জন্মেতিহাস, অবৈধ তার ক্রিয়াকলাপ। অথচ এই অবৈধ সন্তানকে নিয়ে পশ্চিমী সমাজের দেখাদেখি সারা পৃথিবী জুড়ে কী বিকৃত উৎসবের মাতামাতি।

২

আমাদের দেশেও ওই ঘোলা জলের বন্যার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল পাশ্চাত্য প্রভাবের অনিবার্য পরিণামে। তার জের এখনও কাটেনি। নয়তো এমন বিসদৃশ অবস্থা আজও কেন আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয় যে, দেশ সমাজ-তন্ত্রের পথে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে অথচ সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখনও সেই উনিশ শতকের বস্তা-পচা ব্যবহারে-ব্যবহারে-ক্ষয়ে-যাওয়া বহু-বিমর্দিত তত্ত্ব 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক'-এরই আধিপত্য? সমাজ জনগণের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে উত্তরোত্তর ত্বরান্বিত বেগে অথচ সাহিত্য আজও পুরনো ধারণা আঁকড়ে থেকে পশ্চিমী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির অঞ্চল-সংলগ্ন হয়ে আছে—এটা কি একটা অস্বাভাবিক, বিসদৃশ অবস্থা নয়? এদেশের বাজারী সংস্কৃতির কারবারীরা কোন অবস্থাতেই দেওয়ালের লিখন পড়তে রাজী নয়। তা থেকে প্রয়োজনীয় সংকেত গ্রহণ করে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে চাওয়াটা তো অনেক পরের কথা।

এঁরা এখনও পশ্চিমের মোহঘোরে তথাকথিত শিল্পীর স্বাধীনতা আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছে আর সংস্কৃতির রাজ্যে যত সব অনাসৃষ্টির পোষকতা করে চলেছে।

অনাসৃষ্টির পোষকতার দুই-একটি নমুনা দিই। 'বারবধূ' বলে একটা নাটক কয়েক বছর হলো কলকাতার কোনও এক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে বহু পয়সা কামিয়েছে। অতিশয় কুরুচিপূর্ণ, ন্যক্কারজনক নাটক। ক্যাবারে নৃত্য, নৃত্যের নামে নিরাবরণতার প্রদর্শনী, বারবণিতা গৃহে 'রুদ্ধকক্ষে'র ক্রিয়াকাণ্ডের ইঙ্গিত-দান—কিছুরই এই নাটকে অভাব নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দর্শকের প্রবৃত্তিকে নিম্নগামী করে তাঁর চেতনাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলাই এই নাটকের পরিবেশকদের লক্ষ্য। সমাজভাবনার তথা সমষ্টিগত চেতনার রৌদ্রালোক থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাকে যতই আত্মকেন্দ্রিকতার ও রিরংসার অন্ধকার বিবরে সেঁধিয়ে দেওয়া যায় ততই জনবিরোধী শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপারীদের লাভ। এতে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একদিকে ব্যক্তিগত মুনাফামৃগয়া চরিতার্থ হওয়ার পথ ষোল-আনার উপর আঠারো-আনা সুগম হয়, অন্যদিকে শিল্পামোদীদের মনোযোগ পরিকল্পিতভাবে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী চেতনার খাত থেকে চালান করে অপসংস্কৃতির খাতে বইয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের চক্রীদের অর্থসংগ্রহই একমাত্র লক্ষ্য এরকম মনে করলে মহা ভুল করা হবে, তার সঙ্গে তাদের আরও একটি লক্ষ্য থাকে—নঙর্থক লক্ষ্য—সমাজের ভিতর অবক্ষয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করে জনগণকে সুস্থ সংস্কৃতির স্বাদ পেতে না দেওয়া। তাই জনসাধারণের সামনে শিল্প পরিবেশনের নামে বারে বারে নির্মল জলের পরিবর্তে কর্দমাক্ত জলের পাত্র এগিয়ে দেওয়া। তৃষ্ণা যখন প্রবল থাকে তখন ঘোলা জলেও তো এক ধরনের তৃষ্ণা মেটে। এও সেই রকমের এক ব্যাপার।

সুখের বিষয়, ইদানীং অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অপসংস্কৃতির অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। এমনকি এ ব্যাপারে সরকারী প্রশাসনেরও টনক নড়েছে। সরকার আর এ ঘটনার অসহায় দর্শক হয়ে থাকতে নারাজ। পশ্চিমবাংলার নতুন বামফ্রণ্ট সরকারের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অত্যল্পকাল মধ্যেই অপসংস্কৃতির নিরোধ আর সুস্থ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন রেখেছেন। আমরা তাঁর এই আবেদন অত্যন্ত সময়োচিত বলে মনে করি। এবং আমাদের আশা আছে প্রগতিশীল

ভাবনা-ধারণার আদর্শে বিশ্বাসী নতুন বামফ্রন্ট সরকার এবং তাঁদের পশ্চাদ্‌বর্তী এ রাজ্যের অগণিত জনমানুষের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি-দেহ থেকে অচিরেই অবক্ষয় ও বিকারের বিষাক্ত জড় নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে। চারদিকে তার শুভসূচনা দেখছি। সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে সুস্থ বুদ্ধির ঐতিহ্যে যাঁরা বিশ্বাস করেন, সাহিত্য ও জনসমাজের মধ্যে নিগূঢ় যোগ এই আদর্শে যাঁরা স্থিতপ্রত্যয়, আজকের দিনের বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁদের উপর এক গুরুদায়িত্ব বর্তিয়েছে। এ দায়িত্ব তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন বলেই আশা করি।

৩

সংকলনে যে ষোলজন লেখক প্রবন্ধ সংযোগ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তানুশীলনের ক্ষেত্রে কৃতী। এঁদের মধ্যে প্রবীণ ও নবীন এই দুই প্রজন্মেরই প্রতিনিধি আছেন। জনাব মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল একজন বর্ষীয়াণ সুবিজ্ঞ স্থিতধী ভাবুক। মার্কসবাদী প্রত্যয়ে বিশ্বাসী একাধিক গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত এই প্রাজ্ঞ লেখক তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি'তে প্রকৃতপক্ষে এই বইয়ের সুরটি বেঁধে দিয়েছেন। খুব স্থির ধীর শান্ত মেজাজে অথচ সুদৃঢ় ভঙ্গীতে তিনি তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই সূত্রে এদেশের জনসাধারণকে অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘোরতর ক্ষতিকর নয়া এক অবক্ষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে—মার্কিনী অপপ্রভাব। তিনি এই নতুন উপদ্রবটি সম্পর্কেও বিলক্ষণ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর লেখায়। বর্তমানে আমাদের দেশে সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের অবস্থা যে স্তরে আছে তার থেকে তাকে উন্নত করে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করতে হলে 'সমাজবাদী সংস্কৃতি'কেই আমাদের অবলম্বন করতে হবে, এ ভিন্ন পথান্তর নেই—এই তাঁর সুচিন্তিত মত। "সমাজবাদী সংস্কৃতি বুর্জোয়া সংস্কৃতির তুলনায় অনেক উন্নত। সেই সংস্কৃতিই হবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সমাজের সংস্কৃতি।"

প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুলেখক বামপন্থী নেতা অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য তাঁর 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বিষয়ে' প্রবন্ধে, নামেই প্রকাশ, সংস্কৃতির বৃহত্তর সংজ্ঞা ও তাৎপর্যের আলোচনা করেছেন। নিপুণ তাঁর বিশ্লেষণ, সুবিন্যস্ত তাঁর ভাবনা। প্রসঙ্গতঃ লেখক আত্মসমালোচনার ভঙ্গীতে অপসংস্কৃতিবিরোধী অভিযানের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের কিছু প্রণিধেয় পরামর্শও দিয়েছেন। আমরা যেন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে সংস্কৃতির সঙ্গে

অতিরিক্ত শুচিতার বাই-কে গুলিয়ে না ফেলি, এই তাঁর পরামর্শের মূলকথা। উদ্দিষ্ট মহলে পরামর্শটির গুরুত্ব হারিয়ে যাবে না বলেই আশা করি।

তৃতীয় প্রবন্ধে প্রখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক ও প্রাবন্ধিক শ্রীনেপাল মজুমদার বহু দলিল-মূল্যের ওজন যুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতামত আলোচনা করেছেন। এই সুদীর্ঘ তথ্যসমৃদ্ধ রচনাটির মাধ্যমে লেখক আমাদের আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলা সাহিত্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে হাজির করেছেন এবং সে সময় শ্লীলতা অশ্লীলতার মামলাকে উপলক্ষ্য করে কী প্রচণ্ড তর্কের তুফান ও বাক্যের ধূলিঝড় উঠেছিল পাঠকদের তার আন্দাজ দিয়েছেন। আজকের দিনেও এই বিতর্কের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা আছে, কেননা আজকেও একই রূপ সমস্যার দ্বারা বাংলা সাহিত্য প্রপীড়িত, বরং পূর্বের তুলনায় সমস্যার তীব্রতা বেড়েছে। তীব্রতা বেড়েছে এই কারণে যে, সংস্কৃতি সাহিত্যের সমস্যা আজ আর শুধু সংস্কৃতি সাহিত্যের সমস্যা হয়েই নেই, একই সঙ্গে তা রাজনীতিরও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'নন্দন' পত্রিকার সম্পাদক সুপণ্ডিত লেখক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ তাঁর 'প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন' নামক সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান প্রবন্ধে অপসংস্কৃতির বিপদ যে শুধুমাত্র যৌনতাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার যে আরও নানা মুখ আছে—আছে কুসংস্কার বিজ্ঞানবিমুখতা ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সেকুলারিজম বনাম ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদির সমস্যা—সে বিষয়েও তিনি পাঠকদের যথাবিধি অবহিত করেছেন। প্রতিক্রিয়া সমাজে কতভাবে আত্মপ্রকাশ করে রচনাটি তার দিক্‌নির্দেশক হয়ে রইলো।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস তাঁর 'সাহিত্যে অপসংস্কৃতি' প্রবন্ধে অতীত ও মধ্যযুগের সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের অনুষঙ্গে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অপসংস্কৃতির অমিতাচারের বিরুদ্ধে খুব জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর সমালোচনা দ্ব্যর্থহীন বলিষ্ঠ, কাজেই লক্ষ্যবেধী। ভরসা করি যাঁদের অভিমুখে এ সমালোচনার শর উদ্দিষ্ট তাঁদের উপর এর ক্রিয়া ব্যর্থ হবে না। প্রসঙ্গতঃ সুযোগ্য লেখক আর একটি সাহিত্যিক অনাচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শহরবাসী উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকেরা যখনই গ্রামীণ নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীদের জীবন চিত্রিত করেন তখনই তাদের মেয়েদের কামাতুর ও যৌনরোগগ্রস্ত রূপে বর্ণনা করেন। এঁর চেয়ে ভুল আর অন্যায় দেখা কিছু হতে পারে না। লোকজীবনের মধ্যেই এখনও যা কিছু

সদাচার সংযম টিকে আছে, বরং সেই তুলনায় নগরজীবনের আচার-আচরণ অনেক বেশী কলুষিত, বিপথগামী। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতিকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে যে সব লেখক আনন্দ পায় তাদের "বিকৃত চরিত্র ও পর্নোগ্রাফিক মনের পরিচয়"ই তাদের লেখার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, এর দ্বারা আর কিছুর প্রমাণ হয় না।

সাহিত্যে অপসংস্কৃতির মত অনুরূপভাবে যাত্রাপালায় অপসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সংস্কৃতিপ্রেমী লেখক কল্পতরু সেনগুপ্ত। নাটকে অপসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন সুপরিচিত নাট্যকার ও পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সঙ্ঘের মুখপত্র 'গণনাট্য' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহীরেন ভট্টাচার্য। সঙ্গীতে অপসংস্কৃতির বিষয়ে লিখেছেন বিশিষ্ট গণসঙ্গীত রচয়িতা ও সুখ্যাত সুরকার শ্রীপরেশ ধর। চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতির উপরে আলোচনা করেছেন দেশী বিদেশী চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ প্রগতিবাদী লেখক শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। এসব রচনার প্রত্যেকটিই সুলিখিত, তথ্যাশ্রয়ী ও বিশ্লেষণাত্মক। প্রতিটি লেখাতেই চিন্তা উদ্রেক করার মত যথেষ্ট উপাদান-উপকরণ রয়েছে। অপসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের বিভিন্ন প্রকরণের উপর লেখা কৃতী লেখকদের এই আলোচনাগুলি সেই সেই বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রতিবেদন হয়ে থাকলো।

'সংস্কৃতির স্বরূপ' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত গবেষক ও প্রাবন্ধিক ডক্টর সরোজমোহন মিত্র সংস্কৃতির স্বরূপ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, অবক্ষয় ও বিকৃতির প্রমাণ স্বরূপে যেসব অপলক্ষণের প্রকাশ ঘটেছে তার উপর তীক্ষ্ণ সমালোচনার সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সেগুলির বিষয়ে পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুতিবান প্রবন্ধকার শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অপসংস্কৃতি : অবক্ষয়ের বেনোজল' রচনায় মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সংস্কৃতি চর্চার নামে যেসব অবক্ষয়ী ক্রিয়াকলাপ চলেছে তার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য এদেশের দৃষ্টান্ত দিতেও তিনি ভোলেননি। দুনিয়া জুড়ে অপসংস্কৃতির নর্দমা বেয়ে এদেশে ওদেশে যে ঘোলা জলের বন্যাস্রোত ছুটে চলেছে তার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে এই তথ্যধর্মী রচনাটিতে। মার্কসীয় বিশ্লেষণের পটভূমিতে তথ্যের উপস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দর ফুটে উঠেছে।

প্রখ্যাত নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক ও অভিনেতা শ্রীউৎপল দত্ত তাঁর 'অপসংস্কৃতি বিরোধী সংগ্রামে চাই ব্যাপক ঐক্য' প্রবন্ধে ঐক্যের উপর বিশেষ

জোর দিয়ে সকল শ্রেণীর প্রগতিশীল শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের এক সাধারণ মঞ্চে একতাবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন অপসংস্কৃতির ফিরিওয়ালাদের যতপ্রকার জারিজুরি ও ফেরেপবাজীকে পর্যুদস্ত করবার জন্য। আশা করি তাঁর এই ঐক্যের আহ্বান বৃথা যাবে না। উৎপলবাবুর অননুকরণীয় শ্লেষাত্মক ভঙ্গী তাঁর অন্যান্য রচনা ও ভাষণের মত এই রচনাটিতেও উপভোগ্য রূপে বর্তমান। তাঁর বিদ্রূপের হুল মধুমাখানো হলেও দংশন-ক্ষমতায় কিছু কম অমোঘ নয়—যাঁদের গায়ে গিয়ে বিঁধবে তাঁদের ঠিকই বিঁধবে। অপসংস্কৃতির আরও একাধিক দিক আছে কিন্তু লেখক অগ্রপ্রাধান্যের বিচারে আপাততঃ যৌনতার উপরেই আক্রমণের তাবৎ লক্ষ্য নিবদ্ধ করবার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ লিখি, তাঁর এই আলোচনাটি 'সাপ্তাহিক বাঙলাদেশ' পত্রিকায় ইণ্টারভিউর আকারে ছাপা হয়েছিল, সেটিকে এখানে প্রবন্ধের আঙ্গিকে দাঁড় করিয়ে উপস্থিত করা হলো। রচনাটি প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য 'সাপ্তাহিক বাঙলাদেশ' সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'অন্ধকারের উৎস' প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লিখিত। এই সুন্দর রচনাটিতে সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সংস্কৃতির একটি মূলগত সমস্যার উপর তাঁর মনোযোগ ক্ষেপণ করেছেন—আলোর পিঠে অন্ধকারের সমস্যা। অন্ধকারের উৎস থেকেই যাবতীয় অপসংস্কৃতির জন্ম, এইটিই এই প্রবন্ধের আসল প্রতিবাদ্য। কাজেই, লেখকের মতে, পুঞ্জীভূত অন্ধকারের যবনিকা ছেদন করে সংস্কৃতিকে আলো, আরও আলোর পথে সঞ্চালন ও উত্তরণের মধ্যেই সংস্কৃতির মুক্তি। লেখাটিতে তারুণ্যের আবেগের সঙ্গে প্রবীণোচিত চিন্তাশীলতা মিলিত হয়ে আলোচনাটিকে যথার্থই আস্বাদ্য করে তুলেছে।

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য যদিও ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন সমাজের অনুষঙ্গে উপস্থাপিত, তবু শক্তিমান প্রবন্ধকার শ্রীঅনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের ওই নামীয় রচনাটি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করবার কারণ, আজ আমাদের দেশে আমরা ঠিক যে-ধরনের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সমস্যায় ভুগছি, রুশদেশের মহানায়ক লেনিন আজ থেকে বহুদিন আগেই সেই সমস্যার স্বরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং অভ্রান্ত দ্রষ্টার মত তার সমাধানের উপায়ও বাতলে গিয়েছিলেন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বুর্জোয়া ভোগবাদের ক্লেদ থেকে মুক্ত করে যত বেশী আমরা জনগণের মেহনতী জীবনের সুরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারব তত বেশী অবক্ষয়ের কবল থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়ে উঠবে। যৌনতার আতিশয্য অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সাহিত্যের শেষ আশ্রয়—মেহনতী মানুষেরা ওই উত্তেজক ওষুধের সাহায্যে

কৃত্রিমভাবে নিজেদের চাঙ্গা করে তোলার প্রয়োজন আদৌ অনুভব করেন না। তাঁদের শ্রমের জীবনে এমনতর অসার চটুল লীলাবিলাসের মোটেই কোন স্থান নেই।

অগ্রসর ভাবনায় উদ্বুদ্ধা মহিলাদের নিজস্ব পত্রিকা 'একসাথে'র সম্পাদিকা কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অপসংস্কৃতি রোধে নারী-সমাজের দায়িত্ব' প্রবন্ধে চমৎকারভাবে নারীসমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে অপসংস্কৃতির সমস্যাটির বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ঠিকই লিখেছেন যে, নারীত্বের অবমাননাতেই অপসংস্কৃতির সবচেয়ে স্ফূর্তি এবং নারীজাতিই অপসংস্কৃতির শিকার হয়ে থাকেন সর্বাধিক পরিমাণে। লেখিকা নারীসমাজকে আত্মমর্যাদাবোধে সচেতন হয়ে সমস্যাটির মোকাবিলার জন্য সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসবার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা আশা করি যাঁদের উদ্দেশে এ আহ্বান, তাঁরা যথোচিত-রূপেই এতে সাড়া দেবেন।

সবশেষের প্রবন্ধ গণতান্ত্রিক-মানবিক সংস্কৃতি আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক সুলেখক শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিবাদের ঝড় প্রতিরোধের ফসল'। শেষতম কিন্তু গুরুত্বে মোটেই ন্যূনতম নয়। এই প্রবন্ধে যে-বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে, এক হিসাবে দেখতে গেলে তাকে এই গ্রন্থের উপসংহার-ভাষণ মনে করা যেতে পারে। সমস্যার উপস্থাপন এবং সমস্যার নিরাকরণ এই দুটি প্রান্তকেই লেখক এই প্রবন্ধে এক গ্রন্থিতে বেঁধেছেন। Summing up-এর সকল লক্ষণই এই রচনাটিতে পরিস্ফুট।

৪

পরিশেষে ধন্যবাদের পালা। 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ লেখকদের এবং অন্যান্য যাঁরা এই গ্রন্থের সংকলন-চেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের একযোগে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। সেই ধন্যবাদের সঙ্গে সম্পাদকের ধন্যবাদকেও এখানে একত্র যুক্ত করে দিচ্ছি। কিন্তু একই কালে প্রকাশককেও ধন্যবাদ দিতে হয়। পরিকল্পনার স্তর থেকে তার রূপায়ণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে শ্রীবিপুল চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রকাশের সঙ্গে নিজেকে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আগ্রহের জন্যই এই গ্রন্থের প্রচারণা সম্ভব হলো। আগ্রহের মধ্যে ঝুঁকির

ভাগও বড় কম নয়, কারণ এজাতীয় গ্রন্থের সংকলন বোধ করি এই প্রথম। এছাড়া মুদ্রণকার্যের সুষ্ঠু অগ্রগতির জন্য তিনি এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীঅধীর মুখোপাধ্যায় এই দুজনেই বড় সামান্য পরিশ্রম করেননি। এই সুযোগে তাঁদের উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

নারায়ণ চৌধুরী

সূচী

সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি

মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল

আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে যে সামাজিক শোষণ ও সামাজিক সংগঠন ব্যবস্থা চলে এসেছে তা মূলত সামন্তবাদী শ্রেণী সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। বর্তমানেও তার জের সারা ভারতের ও বাংলার সমাজ জীবনের উপর ব্যাপক ও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, যদিও আজকের দুনিয়া সামগ্রিক বিচারে প্রধানত যে পুঁজিবাদী অবস্থায় এসে পৌছেছে, আমাদের দেশও আছে তার চৌহদ্দির মধ্যে।

সমাজ ব্যবস্থার উপর এই সামন্তবাদী প্রভাব কাটিয়ে না উঠলে সমাজের অর্থব্যবস্থা ব্যাহত হতে থাকবে, তার অগ্রগতি বাধা পেতে থাকবে। সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক, প্রধানত ভূমি ব্যবস্থায় শ্রেণী সম্পর্ক এখনো যে ভাবে ও যে অবস্থায় চলছে, তার ফলে তা কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের মধ্যে দারুণ অসঙ্গতি এনে দিয়েছে, উন্নত উৎপাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, সমাজের অগ্রগতির পথ রোধ করে রেখেছে। বেশি জমির মালিক যারা তারা নিজ হাতে চাষ করে না কিন্তু তাদের জমিতে উৎপন্ন ফসলের মালিক হয় ও তা ভোগ করে। অথচ যারা নিজ হাতে চাষ করে, তাদের হাতে যথেষ্ট জমি ও ফসলের মালিকানা না থাকায় সকলে প্রয়োজনীয় খাদ্যও পায় না। তাতে সামাজিক অসাম্য বাড়ে, উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাঘাত হয়—শুধু জমির বা কৃষির ক্ষেত্রে নয়, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

এই উৎপাদন ব্যবস্থা বাধা পাবার সঙ্গে সঙ্গে, অধিকাংশ মানুষ জমিহীন ও খাদ্যহীন থাকার ফলে, সামাজিক সংগঠনে গণতান্ত্রিক অধিকারও প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হতে পারে না। উৎপাদন সম্পর্কের বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে জমির মালিকানার এবং কাজের ও খাদ্যের অভাবের দরুন তাদের জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক অধিকারের যে অভাব সূচিত হয়, তা প্রতিফলিত হয় সামাজিক সংগঠনে গণতান্ত্রিক অধিকারের অভাবের মধ্যেও।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সুযোগ

ব্যাপক জনগণের এই গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের সুযোগ আনতে পারে সমাজে এই ধরনের সামন্তবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করে বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী উৎপাদন

সম্পর্ক ও সমাজ ব্যবস্থা গঠন করার মধ্য দিয়ে, বিশেষত বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা গঠিত ও কায়েম হবার প্রথম পর্যায়ে। তার মধ্যে নতুন সামাজিক-গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনেক পরিমাণে স্বীকৃত হয় সাবেক সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তন করে বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্ক কায়েম করার ভিতর দিয়ে। ব্যাপক জনগণের জন্য কর্ম সংস্থান ও জীবিকা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান ও ক্রমশক্তিমান শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনও বুর্জোয়া প্রভাবিত সামাজিক সংগঠনের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে।

এরই আনুষঙ্গিক হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে সামন্তবাদী সংস্কৃতির পরিবর্তে বুর্জোয়া সমাজের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে নতুন সমাজ জীবনে যেসব গণতান্ত্রিক অধিকার পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তার সুযোগ গ্রহণ করে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ নিজেদের সংগঠনকে ক্রমশ শক্তিশালী করে তুলতে পারে, সেই সংগঠনের সাহায্যে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারিত করবার সুযোগ পেতে পারে, নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নততর করতে পারে।

এই সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়া চলতে পারে ততদিনই যতদিন বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার সামন্তবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল চরিত্র ও তার নিজস্ব শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, যে-কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। ততদিন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বাভাবিক শ্রেণীগত বিরোধের তীব্রতাও অপেক্ষাকৃত কম থাকে। সে তীব্রতা বৃদ্ধি পায় শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অধিকার সংকোচন ও বঞ্চনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

এই বঞ্চনা বৃদ্ধিই হল বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রভাবের, এবং শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও শিক্ষা-সংস্কৃতিগত জীবনের উপর আক্রমণের পরিচয় ও প্রমাণ। অন্যদিকে তার প্রতিফলন দেখা দেয় এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারবোধ, সংগঠন-চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাবের তীব্রতার মধ্যে। এ বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সাংগঠনিক ও সংগ্রামী দুর্বলতা থাকলে তা তার বঞ্চনাকে গভীরতর ও ব্যাপকতর করে তুলতেই সাহায্য করে।

এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যর্থতা

আমাদের দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী গত ত্রিশ বছরের শাসনকালে সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস তো করেইনি, তাকে বজায় রাখবারই ব্যবস্থা করেছে। ফলে তার প্রগতিশীল চরিত্র যথেষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারেনি ; বুর্জোয়া গণতন্ত্র সামন্তবাদ-বিরোধী স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি, শ্রমিক শ্রেণী ও সমগ্র শ্রমজীবী জনগণকে তাদের অর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনে বঞ্চনা থেকে যতখানি রেহাই দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল তা দিতে পারেনি বা দেয়নি। এ হল আমাদের দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ব্যর্থতা, দেশের শাসক শ্রেণী হিসাবে যতদূর বিকাশের সুযোগ বুর্জোয়া শ্রেণী পেয়েছিল তাকে কাজে লাগাতে তার শোচনীয় অক্ষমতা।

তার পরিণতি হল শুধু দেশের প্রাচীন ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী জের ও প্রভাবকে জিইয়ে রাখাই নয়, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু অর্থব্যবস্থার উপর এদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর নির্ভরশীল হয়ে পড়া এবং সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ী জনবিরোধী ও মানবতাবিরোধী সংস্কৃতিকে আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করবার সুযোগ দেওয়া।

তার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর ও জনগণের জীবনে অর্থনীতিক ও সামাজিক বঞ্চনা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। এই বঞ্চনারই অংশ শিক্ষা ও সামাজিক সুবিচার থেকে তাদের বঞ্চনা। বঞ্চনা বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের অধিকারবোধকে নষ্ট করারও চেষ্টা হচ্ছে। এ সবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বঞ্চিত জনগণের শ্রেণীসংগ্রামও তাই তীব্রতর হচ্ছে।

অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রভাব

কোন দেশে সামন্তবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার পরাজয়ের ও অবসানের পর বিজয়ী বুর্জোয়া শ্রেণী যদি নিজ দেশের সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার শ্রেণীগত অর্থব্যবস্থার বুনিয়াদের উপর তার নিজস্ব শ্রেণী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তাহলে তার সঙ্গে সেই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থের ও অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল বুর্জোয়া শ্রেণীর সংস্কৃতিও গড়ে উঠতে থাকে। সেই রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা যতদিন প্রগতিশীল থাকে, ততদিন তার শ্রেণীগত শিক্ষা-সংস্কৃতির চরিত্রও থাকে প্রগতিশীল।

এ যুগের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র মূলত বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্র হলেও সে রাষ্ট্রের

এবং তার অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার চরিত্র আর প্রগতিশীল থাকে না, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থের অনুকূল সংস্কৃতিও তখন তার মতো জনগণের স্বার্থের বিরোধী অবক্ষয়ী সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদী অর্থব্যবস্থা যেমন মুষ্টিমেয় বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর শোষণের স্বার্থে কাজ করে, তেমনি তার অনুগত সংস্কৃতিও কাজ করে সেই অর্থব্যবস্থাকে রক্ষা ও পুষ্ট করবার জন্য। সেই অর্থব্যবস্থার দ্বারা পুষ্ট ও প্রভাবিত অবক্ষয়ী সংস্কৃতি দেশবিদেশের জনগণের স্বার্থের অনুকূল অর্থব্যবস্থাকে যেমন, তেমনি তাদের সংস্কৃতিকেও দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার বিকাশের ও পুষ্টির পথ রোধ করে।

আজকের দিনে এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় ও প্রধান দৃষ্টান্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা পুষ্ট ও প্রভাবিত সংস্কৃতি।

এই সংস্কৃতি কেবল রাষ্ট্রবিশেষের জনগণের সংস্কৃতির বা কোন বিশেষ দেশের প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই বিরোধী নয়, সমগ্র মানবসমাজেরও সংস্কৃতির (যদি এ রকম আখ্যা দেবার মতো কোন বস্তু থাকে) অগ্রগতির পরিপন্থী। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিক শোষণের স্বার্থ বিভিন্ন দেশে জনগণের অর্থনীতিক জীবনকে যেভাবে খর্ব ও ধ্বংস করতে চায়, সেইভাবে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত সংস্কৃতিও জনগণের সংস্কৃতিকে বিভিন্ন উপায়ে ও কৌশলে দমন করতে সচেষ্ট হয়।

মার্কিন অবক্ষয়ী সংস্কৃতি বর্তমানে আমাদের দেশের জনগণের প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে নানাভাবে আঘাত করছে তাকে বিকৃত সংস্কৃতিতে পরিণত করবার জন্য। এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ছে এদেশের নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মের উপর। বোধ হয় সবচেয়ে বেশি এক শ্রেণীর সিনেমা ছবির উপর। মার্কিন কায়দায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, খুনোখুনি, সমাজবিরোধী কাজকর্মে অস্ত্র ব্যবহার, নারীর মর্যাদাহানি, ইত্যাদি দৃশ্য সহযোগে ফিল্ম প্রযোজনা, মঞ্চে ও অন্যত্র আদিরসাত্মক নাচগান ও অন্যান্য উপায়ে দর্শকদের চিত্তে উন্মাদনা সৃষ্টি—এমনি সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও সমাজচেতনাকে বরবাদ করে সমাজবিরোধী চিন্তা ও মনোবিকারের প্রবণতা সৃষ্টি এই ধরনের সংস্কৃতির উপজীব্য। তার একটা লক্ষ্য মানুষের সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতিক চিন্তা ও চেতনাকে বিলুপ্ত বা বিপথগামী করে দেওয়া।

সুস্থ সংস্কৃতির বিপদ

সুস্থ বুর্জোয়া সংস্কৃতি এই অবক্ষয়ী সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। কিন্তু বর্তমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমাদের দেশের মতো যেসব অনগ্রসর দেশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অর্থব্যবস্থার সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ও যুক্ত এবং তার উপর নির্ভরশীল, সেইসব দেশের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা প্রায় অসম্ভব। তার পরিচয় ও প্রমাণ আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের বুর্জোয়া শিল্পসৃষ্টির নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। অর্থের লোভে শিল্পকর্মের বিকৃতিসাধন এখন নিতান্ত বিরল ঘটনা নয়।

আমাদের দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্কিন অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রভাব যে অপেক্ষাকৃত সহজে পড়তে পেরেছে, তার একটা কারণ দেশে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রাচীন সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পকর্মের জেরগুলিকে দেশপ্রেমের আদর্শ বলে গ্রহণ ও প্রচার করার প্রবণতা। প্রাচীন সামাজিক ঐতিহ্যের নামে এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের আবরণে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার এবং সামাজিক নিপীড়ন ও নরহত্যা পর্যন্ত সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা বহিরাগত অবক্ষয়ী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ও প্রভাব বিস্তারের পক্ষে চমৎকার সুযোগ।

আমাদের দেশে বর্তমানে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংস্কৃতি এইভাবে তার প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে ফেলতে থাকায়, অথবা সে চরিত্রকে এগিয়ে নিতে অক্ষম হওয়ায় সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির পক্ষে তা অনিষ্টকর হয়ে পড়ছে। কাজেই সমাজের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা বিবেচনা করলে এই সংস্কৃতি এখন অচল হয়ে আসছে।

আমাদের সমাজে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী অর্থে পুষ্ট হয়ে তার প্রভাব বিস্তার করবার যে সুযোগ পাচ্ছে, দেশের প্রচলিত শিক্ষা সংস্কৃতিকে এবং তার অগ্রগতিকে যে বিকৃত পথে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালাতে পারছে, তার মূলে প্রগতিবিরোধী সামাজিক কারণের মধ্যে বিশেষভাবে আছে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীস্বার্থের চিন্তা।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে, আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণকে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে শোষণ করা, সেজন্য তাদের বঞ্চনাকে, তাদের দারিদ্র্য ও বেকারিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা, প্রাচীন সামন্তবাদী প্রভাবকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সেই সঙ্গে এদেশে ব্যাপক

শিল্পায়নের বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর ও সহযোগী হিসাবে দেশের মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে আরো ধনী ও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলা—স্বাধীন ভারতে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের নীতি এ পর্যন্ত এই খাতেই বয়ে এসেছে।

এই অর্থনীতিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষে সামাজিক সমর্থনের সুযোগ গ্রহণের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা, এদেশের বঞ্চিত জনগণের এক অংশকে প্রলোভনের দ্বারা "কিনে" নিয়ে আমাদের সংস্কৃতিকে বিকৃত করে তাকে "অপসংস্কৃতিতে" পরিণত করতে চেষ্টা করেছে। এই উপায়ে এদেশের জনগণের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করছে নিজেদের সম্পদ আরো বাড়িয়ে তুলতে।

গণতান্ত্রিক অধিকারে আঘাত

আমাদের দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হবার পরেও বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও দেখা গেছে বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেও উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি, সাম্রাজ্যবাদী আমলের অনেক প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্র-বিরোধী আইন কানুন ও ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল অথবা নতুন করে চালুও করেছিল। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও একশো বছরের পুরনো গণতন্ত্রবিরোধী ১৮৭৬ সনের নাটকাভিনয় আইন চাপিয়ে দিয়েছিল, সেজন্য তার বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনও করা হয়েছিল—প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। প্রগতিশীল সাহিত্যের বইপত্রও সে সরকার বেআইনী করে দিয়েছিল।

সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরে কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার কায়েম হবার ফলে কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অবসান ঘটলে অনেকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল আইন ও আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে, জনগণের কতকগুলি গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও এখনো করণীয় অনেক বিষয় বাকি রয়ে গেছে। সে সকল অধিকারও অবিলম্বে ফিরে আসা উচিত।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বাম ফ্রন্ট গভর্নমেণ্ট জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ইতিমধ্যে করেছেও অনেক। এ সকল বিষয়ে জনগণের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য।

প্রলোভনের ফাঁদ

বঞ্চিত মানুষের জীবনে ক্ষুধা থাকে। ক্ষুধা থাকে পেটের জন্য; বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্যের। এ ক্ষুধা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই খাদ্যহীন বঞ্চিত জীবনের ক্ষুধিতকে অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে কিনে নেওয়া যায়। জীবন ও জীবিকার সুযোগ থেকে যারা বঞ্চিত তাদের পক্ষে এ প্রলোভনের প্রতিরোধ কঠিন কাজ। তারা অনেক সহজে প্রলোভনের শিকার হতে পারে।

খাদ্যের প্রয়োজনের মতো মানুষের যৌন প্রয়োজনও তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার দুর্নিবার জৈব প্রবৃত্তি। তার অস্তিত্ব ও প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

এই দুই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য মানুষের জীবনে যে নিম্নতম অর্থনীতিক সুযোগের প্রয়োজন, বঞ্চিত মানুষ তা সহজ সামাজিক পরিবেশে না পেলে সমাজবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী প্রলোভনের ফাঁদে পড়তে পারে। আমাদের দেশে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সে ফাঁদে পা দিয়ে প্রলোভনের শিকার হয়েছে, আরো হচ্ছে, সমাজ বিকাশের বিরোধী পথকে প্রশস্ত করতে চেষ্টা করছে। প্রধানত তারাই হচ্ছে তথাকথিত অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিকৃত যৌন জীবনের আবেদন। লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের মধ্যে অনেকে সেই আবেদনকে তত্ত্বের পর্যায়ে তুলতেও চেষ্টা করে।

তাদের কথা বাদ দিলেও এটা বলা যায় যে, সামাজিক উৎপাদন কর্মের ও সুস্থভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত সামাজিক নিরাপত্তাহীন মানুষের অসুস্থ জীবন-চিন্তার নিকট এ আবেদন মোটেই তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নয়।

অপসংস্কৃতি

প্রগতিশীল সমাজ-চিন্তা সমাজ-সচেতন মানুষকে সাহায্য করে প্রগতিশীল অর্থব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা গঠন করতে, মানবিক অধিকার ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে, এবং সমাজে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে। এই প্রগতিশীল সংস্কৃতিই আবার গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পক্ষে, মানবতা-বোধকে পুষ্ট করার পক্ষে অনুকূল সংস্কৃতি।

যে সংস্কৃতি তার বিরোধী, যা গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পথে বাধা হয়ে

বঞ্চিত শ্রেণীদের অধিকারবোধকে এবং সামগ্রিকভাবে মানবতাবোধকে ক্ষুণ্ন করে, এবং ব্যাপক জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের স্বার্থকে পুষ্ট করে, তাকেই বলা চলে অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি মানুষকে সমাজ-সচেতন হতে বাধা দেয়, তার সুস্থ সামাজিক ও রাজনীতিক চিন্তার পথে অন্তরায় হয়, মানবতাবোধকে খর্ব করে, এবং তাকে স্বার্থপর ও আত্মসর্বস্ব করে তুলতে চায়। অপসংস্কৃতি শুধু যৌন উন্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

সামগ্রিকভাবে সমাজের এক ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থপর সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূল এবং সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের পরিপন্থী যে সংস্কৃতি, তারই নাম অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সংগ্রামেরই অংশ।

বিকৃত সাংস্কৃতিক কর্মের বা অপসংস্কৃতির প্রচার ও প্রভাব থেকে সুস্থ সমাজ জীবনকে মুক্ত রাখবার বা তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার উপায় কী?

অপসংস্কৃতি প্রচারের মূলে যে সামাজিক কারণ উপরে দেখানো হল সেই কারণ দূর করা না হলে সমাজকে অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে স্থায়ীভাবে ও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব নয়। মূল অর্থনীতিক ও সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে, দেশের সমস্ত শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করা ও সংগ্রামের মধ্যে আনা সেই মুক্তির পথের নিশানা দিতে পারে।

এই সংগ্রাম শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এবং এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদ-সহযোগী বৃহৎ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। তার ফলে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, সমাজবাদী গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি কায়েম করবার পথে সাহায্য হবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে একাধিক শ্রেণীর—শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শ্রেণীরও—যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হবে, তারই সাথে সাথে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার কাজকেও এগিয়ে নেওয়া হবে। সেই পথেই সমাজবাদী সংস্কৃতিও শেষ পর্যন্ত কায়েম হবে।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে বলা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে

কোন শিল্পকর্মের মধ্যে যৌন প্রসঙ্গের পরিবেশনের উপর এমনভাবে জোর দেওয়া হয়েছে যাতে দর্শক, শ্রোতা বা পাঠকদের মনে অসুস্থ সমাজচিন্তা ও বিকৃত রুচিবোধ জাগানো যায়। অনেকে শুধু এই একটা বিষয়কেই অপসংস্কৃতি বলে ধরে নেয় এবং অপসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয়কে বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কেবল সেই বিষয়ের বিরুদ্ধেই প্রচার করতে চায়। সেই প্রচার জোরদার হলে সেই বিষয়ের প্রভাবকে যে তা ক্ষুণ্ণ করবে না. বা তাকে আঘাত করবে না, তা বলা যায় না। তবে সামগ্রিকভাবে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, তার সামাজিক-অর্থনীতিক বুনিয়াদের ও চরিত্রের বিরুদ্ধে মূল সংগ্রামকে বাদ দিয়ে সেভাবে প্রচার চালালে তার সাফল্য হবে সীমাবদ্ধ ও অল্পস্থায়ী।

সমাজবাদী সংস্কৃতি

সমাজবাদী সংস্কৃতি বুর্জোয়া সংস্কৃতির তুলনায় অনেক উন্নত। সেই সংস্কৃতিই হবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সমাজের সংস্কৃতি। সমাজবাদী গণতন্ত্র অতীতের ও বর্তমানের যে কোন শ্রেণীর গণতন্ত্রের তুলনায় হবে অনেক বেশি মুক্ত, উদার ও উন্নত এবং ব্যাপক শ্রমজীবী সমাজের জনগণের স্বার্থের অনুকূল। কাজেই সমাজবাদী সংস্কৃতিও হবে অনেক বেশি সমাজসচেতন ও মানবতাবোধসম্পন্ন মুক্ত ও উদার সংস্কৃতি।

কিন্তু এই সংস্কৃতি আমাদের বর্তমান সমাজের আশু ভবিষ্যতের সংস্কৃতি নয়। বর্তমান বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্রের আমূল ও সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটবার পূর্বে, সমাজবাদী বা প্রলেতারীয় বিপ্লব ঘটবার পূর্বে, এবং শ্রমিক শ্রেণীর শোষণহীন অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা গঠন করার উপযুক্ত রাজনীতিক-সামাজিক প্রক্রিয়া শুরু হবার পূর্বে এই সমাজবাদী সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তবে তার প্রস্তুতিপর্বের কাজকর্ম ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তার স্পষ্ট পরিচয়ও দেখা যাচ্ছে।

আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে পর্যায়ের গণতন্ত্র প্রয়োজন তা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধী ও তার প্রভাবমুক্ত। সেইভাবে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিরও তা বিরোধী। শ্রেণী চরিত্রের দিক থেকে তা পুরোপুরি বুর্জোয়া নয়; এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণী এখনো সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই এদেশের সমাজ বিকাশের পক্ষে তা মোটেই অনুকূল নয়। বর্তমান সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশও সেই কারণে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংস্কৃতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব

আবার, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের প্রভাব থেকে এবং দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির প্রভাব থেকেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর গণতন্ত্র বা সমাজবাদী গণতন্ত্রও অবাধ বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ লাভ করতে পারে না। তাই সেই পরিবেশ সৃষ্টি করবার আগে এবং সেই উদ্দেশ্যে সমাজের প্রয়োজন হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাজগুলি সমাধা করা। কিন্তু সে কাজ এখন বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে করা সম্ভব নয়; বুর্জোয়া শ্রেণী তা করছে না এবং করতে চায়ও না। সে কাজ হতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় অংশের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে চালিত বিভিন্ন সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির ও শ্রেণী স্তরগুলির স্বার্থে এই ধরনের যে গণতন্ত্র গড়ে ওঠে, তাকে বলা হয় জনগণের গণতন্ত্র বা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই গণতন্ত্র কোন বিশেষ একটা শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল গণতন্ত্র নয়, একাধিক শ্রেণীর সম্মিলিত গণতন্ত্র।

পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের, বিশেষত শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সংমিশ্রণে ও সহযোগিতায় এই যে "খিচুড়ি" গণতন্ত্র গড়ে উঠবে, তা কি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের সমাজ বিকাশে বাধা সৃষ্টি করবে না? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তার জবাব হচ্ছে: না, বাধা সৃষ্টি করবে না, বরং সমাজ বিকাশে সাহায্যই করবে। বস্তুত, এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজ বিকাশের পক্ষে জনগণের গণতন্ত্রই প্রকৃত সাহায্য দিতে পারে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণের স্বার্থ ও শ্রমিক শ্রেণীর শোষণমুক্তির স্বার্থ যে স্বভাবতই পরস্পরের বিরোধী স্বার্থ তাতে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণভাবে সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও তার সহযোগী দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির শোষণ থেকে, দেশকে মুক্ত করতে না পারলে যেভাবে এদেশের অর্থনীতিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে, জনগণের দারিদ্র্য বাড়ছে, ক্রয়ক্ষমতা কমছে, এবং বাজার সংকুচিত হচ্ছে, তাতে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে তার নিজস্ব মালিকানায় শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ সাধন করার কাজ ক্রমাগত প্রতিহত হচ্ছে। ফলে তার শোষণের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ ও খর্ব হচ্ছে। অথচ আজকের দিনে দেশের এই বুর্জোয়া শ্রেণী একমাত্র নিজস্ব শক্তিতে সামন্ত-বাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করবার পক্ষে যে অর্থনীতিক

ক্ষমতা ও রাজনীতিক ইচ্ছা দরকার তার অধিকারী নয়। সেজন্য শ্রমিক শ্রেণীর ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর সাহায্য তার একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং তাদের সাহায্য পেতে হলে অবৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে তাদের সঙ্গে আপসে আসতেই হবে। এই শ্রেণী তার বাস্তব ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই এই আপসে রাজি হতে পারে এবং হবেও।

তেমনি শ্রমিক শ্রেণীর দিক থেকেও প্রয়োজন আছে বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপসের। আপসের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ শোষণমুক্তি সম্ভব নয় বটে, কিন্তু তার শোষণের তীব্রতা অনেক পরিমাণে কমে যাবে। শ্রমিক শ্রেণী সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং তা সম্ভব হবে অন্যান্য শোষিত শ্রেণী সহ জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সাময়িক ও সীমাবদ্ধ মিতালির সাহায্যে মিলিত সংগ্রামের পথে; শ্রমিক শ্রেণী কেবল নিজ শক্তিতে একসঙ্গে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হতে এবং এতখানি সুবিধা লাভ করতে পারে না। এই সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলেও তা সফল হবার আশঙ্কা খুব কম, কেননা এ সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ স্বার্থেই যোগ দেবে, এবং সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিক শ্রেণী।

গণরাষ্ট্রে শ্রেণী শক্তির বিন্যাস

তাহলে দেখা গেল যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণী সমেত একাধিক শ্রেণী ও শ্রেণীস্তরের সম্মিলিত মোর্চা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং সে সংগ্রাম পরিচালিত হবে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শক্তির এবং দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে।

এইভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ হবে সামন্তবাদ এবং দেশীয় ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির শোষণ ও প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত করে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাধা করা এবং সমাজবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবার জন্য পথ প্রস্তুত করা। তেমনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার কাজ হবে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির পরিবর্তে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি কর্মকে উৎসাহিত করা এবং সমাজবাদী সংস্কৃতি কায়েম করবার জন্য পথ প্রস্তুত করা।

জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় এই কাজ করবার পথে বাধাগুলি দূর করা সহজ হবে।

জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংস্কৃতিগত বিষয়ে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব অবশ্য থাকবে। তেমনি সমাজবাদী সংস্কৃতিরও প্রভাব থাকবে। বস্তুত জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব থাকায় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে এবং প্রলেতারীয় সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তেমনি সেই সমাজের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে এবং সমাজবাদী সাংস্কৃতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এইভাবে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেণীশক্তির বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকবে।

মোট কথা, জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেণীগত প্রভাবের এই হ্রাস ও বৃদ্ধি থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, সমাজ ব্যবস্থার গতি পুঁজি-বাদী বিকাশের দিকে নয়, সমাজবাদের দিকে, সমাজবাদী গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার দিকে। সমাজবাদী সংস্কৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বপ্রকার অপসংস্কৃতিকে এবং তার সামাজিক উৎসমুখকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে দেওয়া হবে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বিষয়ে

জ্যোতি ভট্টাচার্য

সংস্কৃতি কাকে বলে ?—এ প্রশ্ন নিয়ে বহু মানুষ তর্কবিতর্ক করে তখনই যখন সমাজজীবনে দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনতিক্রম্য পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। 'সংস্কৃতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ণয় করতে পারলেই এ দ্বন্দ্ব নিরসন হয় না। 'সংস্কৃতি'র একটি যুক্তিসম্মত ও পরিপাটি সংজ্ঞা নিরূপণ করে দিতে পারলেও দ্বন্দ্ব নিরসন হয় না। শব্দার্থ বা ন্যায়যুক্তি এ তর্কে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিতর্কটা শব্দার্থ বা ন্যায়যুক্তি নিয়ে নয়, বিতর্কটা আসলে সমাজজীবন নিয়ে, জীবনাদর্শ নিয়ে।

আমরা বললাম—'দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনতিক্রম্য পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব।' দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য ঠিক দুটো মাত্র চেহারায় প্রকাশিত হয় না—অসংখ্য রকম ধারণা, বক্তব্য ও ঝোঁক প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি শিবিরে এই মতামতগুলো শ্রেণীবদ্ধ হয় বা বিন্যস্ত হয়। একটি শিবিরের মধ্যে যারা যূথবদ্ধ, তাদের মধ্যে নানা সূক্ষ্ম ও গৌণ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকে, থাকতে পারে; কালক্রমে এই সূক্ষ্ম ও গৌণ পার্থক্যগুলো বেশ বড় হয়ে উঠতে পারে এবং মুখ্য আকার ধারণ করতে পারে। কিন্তু কোন একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে বিভিন্ন মতামতগুলো দুটি বিবদমান শিবিরেই বিন্যস্ত হয়। যিনি ভাবেন তাঁর মতামত এই বিবাদের উর্ধ্বে, নিরপেক্ষ, 'স্বতন্ত্র'—তাঁর মতামত হয় নিরর্থক, নতুবা তাঁর অজ্ঞাতেই কোন একটি শিবিরের পক্ষসমর্থক; নতুবা তাঁর পৃথক মতামত পুরাতন বিবাদকে ছাপিয়ে গিয়ে নূতন এক বিবাদ সৃষ্টি করে, নূতন শিবিরবিন্যাস ঘটায়।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক জুড়ে এই রকম ধারণা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, 'সংস্কৃতি' মানুষের অন্তরলোকের ব্যাপার এবং সাহিত্যে ললিতকলায় ও পরিশীলিত শিষ্টাচারেই তার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যখন 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র মধ্যে পার্থক্য খাড়া করে 'কৃষ্টি' সম্বন্ধে খানিকটা অবজ্ঞা প্রকাশ করেই লিখেছিলেন—

> (মানুষের) কৃষ্টির ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায়। তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি… ['সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৪৪]

তখন তিনি একটা প্রতিষ্ঠিত ধারণাই ব্যক্ত করছিলেন। এক হিসেবে আধুনিক ধনিক সমাজের কুশ্রী ও নির্মম যান্ত্রিক অমানবিকতার বিরুদ্ধে সুকুমার মনের একটা অসহায় প্রতিবাদও এতে ব্যক্ত হচ্ছিল। আরো উল্লেখ করা অবশ্যই উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ বরাবর এই ধারণা আঁকড়ে বসে থাকেননি, পরবর্তীকালে 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র মধ্যে এই বিভেদ অতিক্রম করার দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন।

আজকের বিশ্বে 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে যে-কোন জ্ঞানসম্পন্ন আলোচনায় এ কথাটা স্বীকৃত যে, 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বেশ ব্যাপক, এবং 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র মধ্যে ও রকম বিভেদ ভ্রান্ত, ভ্রান্তিকর ও বিপজ্জনক। আজকের বিচারে এ কথা প্রায় সর্বজনগৃহীত যে, শুধু ললিতকলাই মাত্র নয়, মানুষের সমস্ত জীবনকর্মই সংস্কৃতির ক্ষেত্র। শূকর পালন বা পাট চাষ থেকে শুরু করে তাজমহল নির্মাণ বা দরবারী কানাড়ার আলাপ, সবই সংস্কৃতির বিষয়। সর্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞান প্রয়োগবিদ্যা ও অনুশীলন; চারুশিল্প ও কারুশিল্প, উৎপাদন নির্মাণ সৃজন ও উদ্ভাবন,—স্টীল ফার্নেস টেলিভিশন কমপিউটার এবং একতারা পট বা মৃৎপাত্র—সবই সংস্কৃতির বিষয় ও বাহন। সর্ববিধ বুদ্ধিদীপ্ত কর্মের কুশলতা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এইসঙ্গে এ কথাও আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, কায়িক শ্রম বা কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন মনন খণ্ডিত সংস্কৃতির একরকম ব্যাধি; এবং অপরদিকে, মনন থেকে বিচ্ছিন্ন বা ললিতকলাবোধবর্জিত কায়িক শ্রমও খণ্ডিত সংস্কৃতির আরেক রকম ব্যাধি। এই দুরকম ব্যাধি আবার পরস্পরসম্পর্কিত হয়ে বিকৃতির জটিলতা বাড়ায়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন খণ্ডিত চেতনার বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য। এ সংগ্রাম দ্বিমুখী। খুব মোটা কথায় বলা চলে, মননবিলাসী অকেজো লোক যাতে দক্ষ কাজের মানুষ হয়ে ওঠে, এবং স্থূলরুচি কেজো লোক যাতে শীলবন্ত, বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে ওঠে, সংস্কৃতির সংগ্রাম সেইজন্য। জীবনকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কলাকৈবল্যের অপ্রকৃতিস্থ চর্চা, চেতনা-চিন্তা-বিচার-বর্জিত যান্ত্রিক কর্মের অমানবিক চর্চা, জ্ঞানবুদ্ধিরুচি-লেশহীন স্নায়বিক উত্তেজনার কণ্ডুয়ন,—এগুলো মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে চিনিয়ে দেওয়া সংস্কৃতি-আন্দোলনের কাজ।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন। কিন্তু বিতর্কিত বিষয়ে সংজ্ঞা বেশি ব্যাপক হলে বিতর্কের মঞ্চ অবিন্যস্ত হয়ে যায়,

লক্ষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আলোচনা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃতির সংজ্ঞা অতিব্যাপক করে রাখলে সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আকার-অবয়বহীন বাষ্পীয় ধরনের হয়ে যায়।*

তাছাড়া সংস্কৃতির ব্যাপক সংজ্ঞা ও তাৎপর্য উল্লেখ করার পরেও নির্দিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রে সমস্যা ও কর্তব্য নিরূপণের দায়িত্ব থেকে যায়। সাধারণ সংজ্ঞা উল্লেখ করেই এই দায়িত্ব সম্পন্ন করা যায় না।

বর্তমান কালে সংস্কৃতি নিয়ে নানারকম উৎকণ্ঠা, বিক্ষোভ, ক্রোধ ও বাদ-প্রতিবাদ উচ্চগ্রামে সরব হয়ে উঠেছে সংস্কৃতির একটি বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে—যেটিকে বলা চলে জনবিনোদন কর্মের ক্ষেত্র। সঙ্গীত নৃত্য অভিনয়, সিনেমা টেলিভিশন, তথাকথিত বিচিত্রানুষ্ঠান এবং বহুল-বিক্রীত পত্র-পত্রিকায় বা গ্রন্থে লঘুপাচ্য গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। এক হিসেবে সংস্কৃতির একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রই এখানে দেখা যায়, এবং অনেক গম্ভীর বিচারক হয়তো এগুলোকে সংস্কৃতির আসন দিতে অস্বীকার করবেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে অকিঞ্চিৎকর, কালহরণের ক্ষণিক উপায় মাত্র বলে মনে হলেও এগুলোর প্রভাব দূরপ্রসারী। বিশেষত আজকের বিশ্বে প্রয়োগবিজ্ঞানের সাহায্যে এসব জনবিনোদনকর্ম এত বেশি সংখ্যক মানুষকে স্পর্শ করে যে এই ক্ষেত্রে বিকৃতি গোটা সমাজকে দ্রুত বিপন্ন করে। সংস্কৃতির যে বিকৃতিকে 'অপসংস্কৃতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে তার প্রধান বিচরণক্ষেত্র এখানে।

জনবিনোদন এখন একটা বৃহৎ ব্যবসায়। জনবিনোদনের বস্তু ও অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ ব্যবসায়ের পণ্য। সঙ্গীত, কাব্য, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদির বেচাকেনা চলছে বহুকাল ধরে, প্রাচীন সমাজেও এ ব্যবসায় ছিল। কিন্তু আধুনিক কালের প্রয়োগবিজ্ঞান এবং বৃহৎ যান্ত্রিক উপকরণ এ কর্মগুলিকে যেরকম ধনতান্ত্রিক বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে এরকমটা আগে ছিল না। এখন এই পণ্যের বাজারে খরিদ্দার একটা বহমান জনস্রোত, যার নিজস্ব কোন চরিত্র নেই। এই ব্যবসায়ের মালিকদের হিসেবে এই খরিদ্দার ঠিক মানুষ নয়, কতকগুলো জান্তব প্রবৃত্তির ও যান্ত্রিক স্নায়বিক ক্রিয়ার এলোমেলো বাণ্ডিল। এই খরিদ্দারের রুচি এবং বিশেষ পণ্যের জন্য তার লোলুপ চাহিদা, বা গড্ডলিকা-বৃত্তির তাড়নায় অবসন্ন সম্মতি, বানানো যায়। সেরকম রুচি বা চাহিদা

* সংস্কৃতি সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা বর্তমান লেখকের 'পরিপ্রশ্ন' গ্রন্থে করা হয়েছে—'কালচার ও সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে।

বানানো এই ব্যবসায়ের প্রধান কর্মের অন্তর্গত। বিজ্ঞাপন, বারবার বিজ্ঞাপন, এবং ব্যাপক প্রদর্শন ও পরিবেশন এরকম চাহিদা বানানোর উপায়। এখন এ ব্যবসায়ে পণ্য প্রস্তুত করার কাজ যতটা, চাহিদা বানানোর কাজ তার চেয়ে বেশি বললে খুব অত্যুক্তি হয় না।

অপসংস্কৃতির একটা সাফাই শোনা যায়—এইসব নিম্নরুচি বা বিকৃতরুচি বিনোদন লোকেরা চায় বলেই এগুলো সরবরাহ করতে হয়। এগুলো জনপ্রিয়, এবং গণতন্ত্রে জনসাধারণ যখন সার্বভৌম তখন জনসাধারণের আদেশ নির্দেশেই যেন সংস্কৃতি-উপকরণের মালিকরা এগুলো পরিবেশন করে থাকেন বাধ্য হয়ে। এ সাফাইটা সত্য নয়। বিনোদনকর্মের উপকরণ ও উপায়গুলি—সিনেমা হল, থিয়েটার হল, স্টুডিও, কাঁচা ফিল্ম, ছাপাখানা, কাগজ, টেলিভিশন স্টেশন ইত্যাদি এবং বহু উপাদান যা বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ—এসব যাঁদের করায়ত্ত তাঁরা দ্রুত মুনাফাসংগ্রহের তাগিদে এইসব সাংস্কৃতিক পণ্য প্রস্তুত করান। এই পণ্যের পক্ষে অনুকূল জনরুচিও তাঁরা চালিত করেন বিজ্ঞাপনের দ্বারা। তাছাড়া অন্য রুচি অন্য সুর যাতে তাঁদের এই ব্যবসায়কে খর্ব করতে না পারে সেজন্য বিকল্প অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত করে রাখা এই ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক পদ্ধতি। অন্য মত বা অন্য কথাকে রুদ্ধ বা সঙ্কুচিত করে রাখা যেমন রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের রীতি, সংস্কৃতির সুরকে চাপা দেওয়া তেমনি অপসংস্কৃতির নিয়ম।

এই অবস্থায় অপসংস্কৃতির বাজারে অন্য দু একজন যাঁরা অন্য রুচির অন্য সুরের অনুষ্ঠান করতে প্রচেষ্টা করেন তাঁদের পক্ষে বেশিদিন টিকে থাকা খুব দুষ্কর। কিছুকাল পরে এঁরা অপসংস্কৃতির স্রোতের সামিল হয়ে বা নানারকম আপস করে অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় মগ্ন হয়ে যান। তখন এঁদেরই মুখে শোনা যায় জনসাধারণের রুচিই খারাপ, অগত্যা এঁরা বাঁচার জন্য অপসংস্কৃতির বাজারেই পসরা সাজিয়ে বসছেন। সাংস্কৃতিক যন্ত্রটি,—রাইট মিলস যাকে 'কালচার-অ্যাপারেটাস' বলেছেন, সেটি যে জনসাধারণের আয়ত্তাধীন নয় সেকথা এঁরাও যেন ভুলে যান।

আধুনিককালে "অগ্রসর" ধনিক দেশে এই বাজারী 'সংস্কৃতি'র বিকট আকৃতি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ও এ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ অনেকদিন ধরেই চলছে। ত্রিশের দশকেই ইংলণ্ডে এফ আর লীভিস প্রমুখ চিন্তাশীলরা ম্যাস্-মিডিয়া'র উৎপাতে সংস্কৃতির ভগ্নদশা, ভাষার দুর্গতি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা করেছিলেন। এঁদের অনেকের বিবেচনায় মনে

হয়েছিল বহুজনীন সংস্কৃতি (ম্যাস্-কালচার) এইরকমই হতে বাধ্য। এঁদের বক্তব্যে ছিল একটা গভীর হতাশার স্বর, যদিও দৃঢ়সঙ্কল্প আদর্শানুরাগীর একনিষ্ঠ একাকিত্বের সাহসী মেজাজে এরাঁ কথা বলছিলেন। ব্যাপক অপসংস্কৃতির আবহাওয়ায় জ্ঞানবান সংস্কৃতিবান মানুষ বা সংস্কৃতি-অনুরাগী মানুষ পাওয়া যাবে খুব কমই ; সেই কজন অন্য আর কী বা করতে পারেন,—ভবিষ্যতের ভরসায় তাঁরা প্রায়-নিভৃতে সযত্ন সাধনায় সংস্কৃতির হোমাগ্নি রক্ষা করুন, ঐতিহ্য রক্ষা করুন, জনতার কোলাহল থেকে দূরে অবিচলভাবে সুস্থ উদার মানবিক বৃত্তির চর্চা করুন—এঁদের বক্তব্য অনেকটা এইরকম ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড তাণ্ডবনিনাদে এসব কথা প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কথাটা আবার উঠল একটা বিক্ষুব্ধ আলোড়নের আকারে। ইংল্যাণ্ডে একদিকে রেমণ্ড উইলিয়মস্, রিচার্ড হগার্ট-এর মতো লেখকরা লীভিসের বিশ্লেষণকে আরো প্রসারিত করলেন। আরেকদিকে কিছু তরুণ লেখকের রচনায়—গল্পে উপন্যাসে নাটকে—ধ্বনিত হল ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ, ইংলণ্ডের তদানীন্তন সমাজের মূল্যবোধের অসারত্বের বিরুদ্ধে। যুদ্ধোত্তরকালে বৃটেনে, মার্কিন দেশে, পশ্চিম ইউরোপে ধনতান্ত্রিক সমাজের এক মন-ভোলানো পোশাক দেখানো হয়েছিল—'সমৃদ্ধ সমাজ', 'অ্যাফ্‌লুয়েণ্ট সোসাইটি'। এই তরুণ লেখকরা সেই পণ্যসর্বস্ব সমাজজীবনের অতৃপ্তির যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করছিলেন পরোক্ষভাবে। প্রায় একই সময়ে মার্কিন দেশেও দেখা দিয়েছিল বিক্ষুব্ধ অতৃপ্ত তরুণদের প্রায়-নৈরাজ্যবাদী প্রতি-সংস্কৃতি, 'কাউণ্টার-কালচার'।

ষাটের দশকে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি-যন্ত্রের প্রভুত্ব অমান্য করে অন্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডল রচনার প্রয়াস জড়িয়ে গেল আধুনিক বিশ্বের কয়েকটি প্রধান রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে। ষাটের দশকের গোড়াতেই কিউবার বিপ্লব উত্তর ও দক্ষিণ উভয় আমেরিকাতে নূতন সংস্কৃতির আন্দোলনে প্রবল বেগ সঞ্চার করেছিল। প্রায় একই সময়ে আলজেরিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম ফ্রান্সের যুবমানসকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ১৯৬৪ থেকে সব ছাপিয়ে উঠল ভিয়েৎনাম। ভিয়েৎনামের মুক্তিসংগ্রাম এবং সেখানে সাম্রাজ্যবাদের নারকীয় ধ্বংসকাণ্ড মার্কিন দেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে সংস্কৃতি সম্বন্ধে নতুন ভাবনার চাঞ্চল্য জড়িয়ে গিয়েছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে নতুন-করে-ভাবার আলোড়নের আরেকটি ক্ষেত্র আফ্রিকা মহাদেশ। ষাটের দশকে আফ্রিকার নবজাগৃতির আলোড়নে সংস্কৃতি সম্বন্ধে

গভীর পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন জেগে ওঠে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও স্বাধীনতা-উত্তর জীবনধারা পুরনো আফ্রিকান জীবনপ্রণালীকেই পুনরুজ্জীবিত করবে, অথবা আধুনিকতার তাগিদে পাশ্চাত্ত্য শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রহণ করবে, নাকি একেবারে নতুন এক পৃথক সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে—এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে গিয়ে সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য কি, জাতীয় সংস্কৃতি কাকে বলে, মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কিরকম ইত্যাদি সব কথাই ভাবতে হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ তীক্ষ্ণভাবে উঠেছে কৃষ্ণকায় মানুষদের পৃথক সংস্কৃতির কথা। মার্কিন দেশের কৃষ্ণকায় মানুষদের সঙ্গে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষদের সাংস্কৃতিক ঐক্য বাস্তব না কল্পিত সে প্রশ্ন যেমন উঠেছে, তেমনি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বা সাদৃশ্য কতটুকু সে প্রশ্নও উঠেছে।

আফ্রিকার এসব আলোচনা আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স বৃটেন প্রভৃতি দেশের আলোড়নের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আইমে চেজেয়ার, ফ্রান্ৎস্ ফানঁ, লেওপল্ড সেন্‌গর প্রভৃতি লেখকদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বারট্রাণ্ড রাসেল, জ্যঁ পল সার্ত, হার্বার্ট মার্কিউস, নোম চম্‌স্কি প্রভৃতির নাম।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রায়-বিশ্বব্যাপী নতুন চিন্তাভাবনার এসব আলোড়নের মাঝে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে বিশেষ কোন সাড়া এসে পৌছয়নি। কিউবায়, ভিয়েৎনামে এবং আফ্রিকায় মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার বস্তুগত ও রাজনৈতিক সাহায্যদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাংস্কৃতিক আলোড়নের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া প্রায় অনুপস্থিত।

এই অদ্ভুত অবস্থা যে ঘটনাপরম্পরায় সৃষ্টি হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সংক্ষেপে হলেও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের পর থেকে ক্রমে ক্রমে সোভিয়েট নায়করা "অগ্রসর" পশ্চিমী ধনিক দেশগুলির উপকরণবহুল বস্তুলোলুপ 'ম্যাস্-কালচার' বা 'কনজিউমার-কালচার'-এর প্রচ্ছন্ন গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন। 'মেটিরিয়াল ইনসেন্টিভ্'-এর তাগাদা শুধু অর্থনীতিক্ষেত্রেই নয়, জীবনাদর্শের মধ্যেও প্রবেশ করানো হয়েছে। বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ও অপপ্রভাবের বিরুদ্ধে চিন্তাদর্শগত সংগ্রামের কথা বারবার উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হল বটে, কিন্তু মস্কো-লেনিনগ্রাদের নাগরজীবনে পাশ্চাত্ত্যের উচ্ছিষ্ট চটুল প্রমোদ-প্রকরণ ও স্থূল ভোগবিলাসের চর্চাই বাস্তবে

সমাদৃত হল। সল্‌ঝেনিৎসিনের অপ্রকৃতিস্থ আধ্যাত্মিকতার বিকার শুধু একজন ব্যক্তির বিকার নয়; জীবনাদর্শহীন স্থূল খরিদ্দার-সমাজের প্রতিক্রিয়া এরকম বিকারের জন্ম দিতে পারে ক্রমাগত।

ফলত, ষাটের দশকের বিশ্বব্যাপী নতুন সাংস্কৃতিক আলোড়নে সোভিয়েট রাশিয়ার দেবার মতো, দেখাবার মতো, শেখাবার মতো, বিশেষ কিছু ছিল না। অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্ফুটনোন্মুখ এই নতুন আলোড়নে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রদর্শিত নিশানা সকলকে আশা-উদ্দীপনা জোগাবে, নতুন চিন্তাকে পুষ্ট করবে, ভ্রান্তির অপনোদন ঘটাবে, এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হল না, বরঞ্চ এই নতুন আলোড়ন সোভিয়েট শিবির থেকে সন্দিগ্ধ নিন্দাবাদই বেশি শুনল।

স্বতঃস্ফূর্ত কোন আলোড়নের প্রাথমিক স্তরে কিছু বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্টতা, অসঙ্গতি এবং ভারসাম্যহীন উত্তেজনা থাকা স্বাভাবিক। সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়নে এসব বিশৃঙ্খলা অসঙ্গতি অনেক বেশি দেখা যাবে, সেটাও স্বাভাবিক। ষাটের দশকের আলোড়নে এসব আপত্তিকর ব্যাপার ছিল। নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও যুক্তিবিরোধী আবেগবাদী ঝোঁকগুলো বেশ প্রবল ছিল। তাছাড়াও সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিক্ষাসংস্কৃতির ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনাও তীক্ষ্ণভাবে ছিল। কোন কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি সোভিয়েট আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শেরও বিরোধিতা করছিলেন এবং মার্কসবাদের মূল তত্ত্বেরও বিরোধিতা করছিলেন।

সোভিয়েট নায়করা এবং তাঁদের ভক্তরা এ আলোড়নের ওই আপত্তিকর লক্ষণগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আলোড়নটার সুস্থ সঠিক অগ্রগতির দিকে তাঁদের কোন ইতিবাচক বক্তব্যও ছিল না। বিপরীত দিকে, চীনের সঙ্গে মতাদর্শগত বিসংবাদে তাঁরা যেসব কথাবার্তা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলছিলেন, তাতে সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে তাঁরা পশ্চিমী ধনিক শিবিরেরই সামিল বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

ষাটের দশকের শেষার্ধ এবং সত্তরের দশকের প্রথমটা চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাল। সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী নতুন চিন্তার আলোড়নের মাঝে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বার্তা অসাধারণ উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। অবশ্যই এ কথা ঠিক নয় যে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সব কথাই সম্পূর্ণ অভিনব আবিষ্কার। মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোর অনেকগুলোই ইতিপূর্বে সমাজতান্ত্রিক

চিন্তাদর্শের প্রতিষ্ঠাতাদের রচনায় ছিল। কিন্তু একথা অবশ্যই ঠিক যে এইসব কথা মাঝখানে অনেকদিন চাপা পড়ে গিয়ে প্রায়-বিস্মৃত হয়েছিল। এই মৌলিক কথাগুলোতে নূতন তেজ সঞ্চার করা চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম কৃতিত্ব।

সোভিয়েট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিবাদ-বিসংবাদের সংঘাতে এবং চীনে নূতন সমাজনির্মাণের প্রেরণায় চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব যে জীবনাদর্শকে উচ্চে তুলে ধরেছিল তার মহত্ত্ব স্বয়ম্প্রকাশ। কায়িক শ্রম ও মননের বিভেদ অতিক্রম করার আহ্বান, 'মেটিরিয়াল ইনসেন্টিভ' তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমবেত কর্মের আনন্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, বহু মানুষকে বিচারে সমালোচনায় সচল সবাক ও নির্ভীক হবার আহ্বান, আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে সমবেত জীবনাদর্শের আহ্বান —চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এগুলো মহৎ সত্য। আজকের চীনে যদি কোন ঘটনাচক্রে এই আদর্শ মেঘাবৃত হয়ে যায়, তাহলেও এ অপরাজেয় আদর্শ বিশ্ব-জনের সম্মুখে আদর্শ হয়েই থাকবে।

এমন কথা বলি না যে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মপ্রবাহ সর্বদা অভ্রান্ত ছিল, বা তার কোথাও কোন ঘাটতি ছিল না। মাও সে তুঙের ওপর প্রায়-অলৌকিক অবতারত্ব আরোপ, মাও-ভক্তির আতিশয্য, পীড়াদায়ক ব্যাপারই ছিল। তাছাড়া শেষের দিকটায় অন্তর্দ্বন্দ্ব এমন জটিল হয়ে উঠেছিল যে এখনো তার সমস্ত ছবিটা পরিষ্কার নয়। অতিবামপন্থী ঝোঁক যে মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে কথা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দই স্বীকার করেছিলেন। গণ-সমালোচনার অস্ত্রের অপব্যবহারও হয়েছিল। সৃজনশীল কর্মের উদ্যোগ কোন কোন ক্ষেত্রে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, এ কথাও সত্য। তাচাই-এর গণউদ্যোগ চমকপ্রদ নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ; কিন্তু সাহিত্যে-শিল্পে-ললিতকলায় এরকম চমকপ্রদ কোন নতুন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল বলে শুনি না। এইসব ঘাটতি সত্ত্বেও আজকের বিশ্বে সাংস্কৃতিক আলোড়নে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক উজ্জ্বল আলোকরেখা।

ভারতে সাংস্কৃতিক আলোড়নের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা আপাতত পশ্চিমবাঙলার সীমানাতেই সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। ষাটের দশকের সংস্কৃতি-আলোড়নের ঢেউ পশ্চিমবাঙলায় এসে পৌঁছেছে অনেক পরে, নানা বাঁকাচোরা পথে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ অবশ্য প্রগতিশীল শিবির থেকে ধ্বনিত হচ্ছে অনেকদিন ধরে। পঞ্চাশের

দশকের গোড়া থেকেই আমরা 'কোকা-কোলা কালচার'-এর বিরুদ্ধে বলেছি। গল্প-উপন্যাস-নাটকে পশ্চিমী বাজারী মডেল-এর অনুসরণে 'সেক্স' ও 'ভায়োলেন্স' পরিবেশনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ আমরা করছি অনেকদিন ধরে।

তৎসত্ত্বেও অপসংস্কৃতির বাজার প্রসারিত হচ্ছে, ধৃষ্ট আস্ফালন বাড়ছে। এই কথাটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, পণ্য-অর্থনীতি বজায় রেখে, সংস্কৃতির উপকরণ ও যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ রেখে, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন না ঘটিয়ে, শুধু নীতিকথা প্রচার করে ও ক্রোধ প্রকাশ করেই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করা যায় না। আজকের প্রতিষ্ঠিত সমাজ প্রতিনিয়ত দারিদ্র্য দুর্দশা সৃষ্টি করে, প্রতিনিয়ত দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার সৃষ্টি করে, বেশ্যা-মস্তান-দালাল-বিকৃতবুদ্ধির জন্ম দেয় প্রতিনিয়ত, অশান্তি সংঘর্ষ ও বলাৎকারের বীজ বপন করে প্রতিনিয়ত। তেমনিই এই সমাজ প্রতিনিয়ত অপসংস্কৃতির ব্যাধির জন্ম দেয়।

এ কথার তাৎপর্য এই নয় যে, সুতরাং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন নিরর্থক বা নিষ্ফল। এ কথার তাৎপর্য এই যে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনের সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিণতি বর্তমান সমাজব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রাম।

এ কথাটা বলার পরেও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংস্কৃতির সংজ্ঞা তাৎপর্য লক্ষ্য ও কর্মসূচী প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত করার দায়িত্ব থেকে যায়। এই দায়িত্বের সম্মুখীন হয়ে অকপটে স্বীকার করা ভাল যে প্রগতিশীল শিবিরের কর্মপ্রচেষ্টাতে অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

সংস্কৃতির সামগ্রিক আদর্শ সম্বন্ধে আমরা সবাই সমানভাবে সচেতন নই। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারীরা বা কিসান-আন্দোলনকারীরা এবং রাজনৈতিক নেতারাও কেউ কেউ সংস্কৃতি বিষয়ে কথাবার্তা উঠলে লঘু ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে নিজেদের গাম্ভীর্য বা গুরুত্ব প্রমাণ করেন। আমাদের সংস্কৃতিকর্মীরা রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুধাবনে বা তথ্যবিচারে সবাই যত্নশীল নন। 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' নামক ব্যাপারের মধ্য দিয়ে আমরাই লোককে যেন বোঝাই, সংস্কৃতি মানে গান-বাজনা, লোকচিত্তানুরঞ্জন, এবং গান-বাজনা যে জানে না সে সংস্কৃতির মঞ্চে অপাংক্তেয়, এবং বিপরীতপক্ষে গান-বাজনা যে করে, যে শিল্পী, রাজনৈতিক দর্শন বা বিজ্ঞান তার পক্ষে অনধিগম্য। খণ্ডিত চেতনার সংক্রামক ব্যাধিতে আমরাও অনেকে আক্রান্ত। দুটো আওয়াজ প্রায়ই শোনা যায়—"ওসব কালচারের ব্যাপার, ও নিয়ে মাথা ঘামানো আমার

কাজ নয়” এবং “ওসব গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জ্ঞানের ব্যাপার, ও আমি বুঝি না।” এ আওয়াজ দুটো ভাল আওয়াজ নয়।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে সামগ্রিক ও গভীর ধারণার প্রতিষ্ঠা-আয়োজনে আমাদের আলস্য বা অনাগ্রহ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকেও দুর্বল এবং খণ্ড করে রাখে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের নিন্দাবাদ অনেক সময়েই শ্লীলতা-অশ্লীলতার বাঁধা বুলির গণ্ডী ছেড়ে ওঠে না।

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমাদের কারু কারু বক্তব্য অনেক সময় রক্ষণশীল শুচিবায়ুগ্রস্ত ভণ্ডদের বক্তব্যের সঙ্গে যেন এক হয়ে মিশে যায়। প্রশ্নটা যে আসলে শ্লীলতা অশ্লীলতা নিয়েই শুধু নয়, উদ্দেশ্য ও প্রকরণ নিয়েই যে প্রধান প্রশ্ন, সেকথা আমরা কখনো কখনো ভুলে যাই। ভণ্ড অসাধু সমাজ বা অসুস্থ বিকারগ্রস্ত সমাজ যখন শ্লীলতার ধ্বজা আঁকড়ে প্রতিষ্ঠিত নীতিজ্ঞানকেই রক্ষা করতে চেষ্টা করে, তখন তার বিরুদ্ধে কখনো কখনো একরকম অশ্লীলতার প্রবল অট্টহাসিও যে স্বাস্থ্যকর, সেকথা আমরা ভুলে যাই। অপরদিকে শ্লীলতার সমস্ত বাঁধা নিয়ম রক্ষা করেও যে কদর্য অপসংস্কৃতি চালানো যায় তা আমরা খেয়াল রাখি না। রঙ্গমঞ্চে নগ্ন নৃত্য প্রদর্শনে আমরা আপত্তি করি সঙ্গত ভাবেই ; কিন্তু সেইসঙ্গে “দীঘল ঘোমটা”র অপসংস্কৃতিকেও আঘাত করতে ভুলে যাই। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে ঠেকো দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখাটা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ নূতন সজীব মূল্যবোধ ও নীতিবোধ সৃষ্টি করা, নূতন সংস্কৃতি নির্মাণ করা—এ কথা আমরা সব সময় খেয়াল রাখি না।

অস্পৃশ্যতা-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, গোষ্ঠীপ্রথার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাক্ষরতার জন্য সংগ্রাম, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য সংগ্রাম, নানাবিধ কুসংস্কার আচার ও কুঅভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এগুলো যে সংস্কৃতির সংগ্রাম, সে কথা আমাদের বক্তৃতায়-প্রবন্ধে-প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় কম। বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেও কার্যক্ষেত্রে আমাদের অনেকেই সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে বা তথাকথিত কৌশলগত কারণে সুবিধাবাদীর আচরণ করি, অসত্যের ব্যবহার করি, ভক্তিবাদকে প্রশ্রয় দিই, অপ্রাকৃত শক্তির আভাস দিই, বাঁধা গতের আশ্রয় নিই।

আরো গভীরে যে ফাঁক আছে এসব হয়তো তারই অনুষঙ্গ। পশ্চাৎপদ দেশ, দেশের বিপুল অধিকাংশ মানুষ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাথমিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত, প্রাথমিক দক্ষতা থেকেও বঞ্চিত। লেখাপড়া-জানা লোক প্রায় সবই উচ্চ বা মধ্য শ্রেণীর। সংস্কৃতির মঞ্চে যথার্থ প্রবেশাধিকার খুবই স্বল্পসংখ্যক

কিছু লোকের। এঁরা কেউ কেউ কখনো সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রেরণায় কখনো উদারনীতিক বিবেকদংশনের তাড়নায় মাঝে মাঝে জনসংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতির দিকে ঝোঁকেন, জনসাধারণ ও সংস্কৃতিমঞ্চের মধ্যেকার ব্যবধানের ওপর সেতুবন্ধনের প্রয়াস করেন। এসব প্রয়াসে কিছুটা সুফল নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু যথার্থ সেতুবন্ধন যে হয় না তা স্পষ্ট।

এই ব্যবধান যতদিন রয়েছে ততদিন এদেশে সংস্কৃতির প্রাণকোষেই এক দুঃসহ দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলবে। একদিকে জনসাধারণের সঙ্গে সজীব সংস্পর্শের অন্বেষণে সর্বজনবোধ্য ভাষা আঙ্গিক ও বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা, আরেকদিকে উন্নত সূক্ষ্ম চেতনার এবং সুদক্ষ শিল্পশৈলীর প্রয়োজনীয়তা—এই উভয়ের ভারসাম্য ও পরস্পর সঙ্গতি উদ্ভাবন সহজ কাজ নয়। আমরা কখনো ভেসে যাই সহজবোধ্য মোটা কথার ঝোঁকে, একছাঁদে-বানানো মেনে-নেওয়া ব্যাপারের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির ঝোঁকে, দলীয় সঙ্কীর্ণতার ঝোঁকে ; আবার কখনো ধাক্কা খেয়ে ভেসে চলি উলটোমুখে, মানুষের অবোধ্য ভাষা আঙ্গিক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভাবের চর্চায় মগ্ন হই, কায়দাকৌশলসর্বস্ব চতুর-কিন্তু-অকিঞ্চিৎকর দক্ষতার প্রদর্শনে মেতে উঠি।

এসব নানারকম ফাঁক আমাদের আছে। কিন্তু এসবের চেয়ে বড় হয়ে আছে বহু মানুষের সৎ আকাঙ্ক্ষা, শুভ উদ্যম এবং ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। অতএব আশা আছে, ভরসা আছে।

ভারতে এখন একটা পুরনো ব্যবস্থার অন্তিমদশা চলছে। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটিকে নানা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় জীইয়ে রাখার প্রচেষ্টা চলছে বটে, এবং জরাজীর্ণ মরণব্যাধিগ্রস্ত এই ব্যবস্থা কখনো কখনো নবযুবকের ভঙ্গীতে তড়্‌বড়্‌ করে উঠে বিভ্রমও জাগাচ্ছে বটে, কিন্তু সেই ক্ষণিক আস্ফালনও অতিদ্রুত অবসন্ন হয়ে পড়ছে। নতুন ব্যবস্থা গড়তে হবে—এ কথা এখন বহু মানুষেরই কথা।

এই পরিস্থিতিতে সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য নিয়ে চিন্তাভাবনা শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, অবশ্যপ্রয়োজনীয়। নতুন ব্যবস্থাটা কিরকম হওয়া চাই সেই প্রশ্নে এই আলোচনা যেমন প্রয়োজন, নতুন ব্যবস্থা যারা গড়বে বা গড়ার কাজে যারা অগ্রণী হবে সেই মানুষগুলো কেমন হওয়া চাই সে প্রশ্নেও এই আলোচনা প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্য কোথাও নতুন ব্যবস্থাটার একটা মডেল তৈরি করে রাখা আছে সেটাকে অনুকরণ করতে পারলেই আমাদের সমস্যা মিটে যাবে—এমন ভাবনা যে ভ্রান্ত তা বারবার প্রমাণ হয়েছে। আমাদের প্রশ্নগুলোরও কোন তৈরি-করে-রাখা উত্তর কোথাও নেই, উত্তরগুলো অর্জন করতে হবে নিজেদের জীবনপ্রয়াসের দ্বারা।

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

নেপাল মজুমদার

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা, যৌন-সমস্যার স্থান ইত্যাদি নিয়ে কিছুকাল আগে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী বিতর্ক উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন। লক্ষণীয় ব্যাপার এই, এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীই বিগত বেশ কয়েক বৎসর ধরে অশ্লীল ও যৌনপ্রধান সাহিত্যের বেসাতি খুলে বসেছেন। এঁদের কয়েকজন অশ্লীলতার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত এবং কয়েকজন দণ্ডিতও হয়েছিলেন। তাই এই বির্তকের ছলে তাঁরা অশ্লীল ও যৌন সাহিত্যের সপক্ষেই যে সাফাই গাইবার চেষ্টা করবেন, তা বলাই বাহুল্য। তাঁরা অবশ্য নতুন কথা কিছুই বলতে পারেননি।

স্মরণ রাখা দরকার, প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল আগে এই সব প্রশ্ন নিয়েই বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে তুমুল তর্কবিতর্ক ও বাদবিতণ্ডা হয়েছিল। এই বির্তকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বাগচী, মোহিতলাল, অচিন্ত্যকুমার, অমল হোম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত, সুনীতিকুমার, অপূর্ব চন্দ প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, এই বিতর্ক প্রথম শুরু হয়েছিল 'কল্লোল', 'কালি-কলম' এবং 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠীর মধ্যে। অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে এবং পরে সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে এই বিরোধ-বিতণ্ডার বিস্তারিত ইতিহাস বা বিবরণ দিয়েছেন। এই বিতণ্ডায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কিভাবে জড়িয়ে পড়লেন, কী তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-বক্তব্য ছিল, সংক্ষেপে এখানে আমরা তারই বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব।

শুরুতেই 'কল্লোল-যুগ' প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। অচিন্ত্যকুমার তাঁর ঐ গ্রন্থে 'কল্লোল গোষ্ঠী' বলে যেসব সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা কি একান্তভাবে 'কল্লোল' পত্রিকারই সৃষ্টি এবং এই যুগকে 'কল্লোল যুগ' বলে অভিহিত করা সঙ্গত কিনা ?

বলা বাহুল্য, অচিন্ত্যকুমারের এই দাবী যে বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাস-সম্মত

নয়, তা সজনীকান্ত এবং আরো অনেকে তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। ১৩৩০ সালের বৈশাখে 'কল্লোল' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অচিন্ত্যবাবুরা যাঁদের নিয়ে বিশেষ করে গর্ববোধ করেন, সেই নরেশ সেনগুপ্ত, নজরুল, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র এর আগেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। এমন কি অপেক্ষাকৃত বয়োকনিষ্ঠ বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে রা 'কল্লোলে'র সৃষ্টি নন। বস্তুত তাঁরা হলেন একান্তভাবে 'প্রগতি' পত্রিকারই সৃষ্টি। আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যের পুরোধা হিসেবে এঁদের নামই অগ্রগণ্য। এমন কি যে অশ্লীল ও যৌনপ্রধান সাহিত্যের জন্য 'কল্লোল' কয়েক বৎসর পরে বাংলা সাহিত্যে এত হট্টগোল তুলতে সক্ষম হয়েছিল, তারও সূচনা হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে এবং অন্য পত্রিকায়। এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সজনীকান্ত লিখেছেন :

…"যে অশ্লীলতার দাপাদাপি করিয়া 'কল্লোল' তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে অন্য ধরনের নূতনত্ব সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিল, তাহারও আরম্ভ হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রবর্তিত 'নারায়ণে' (১ম বর্ষ ১৩২১-২২)। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন জগদীশ গুপ্ত যুবনাশ্ব অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব বসুর পূর্বগামী।"

[আত্মস্মৃতি-১ম খণ্ড ॥ পৃঃ ১৮০]

আরও একটা কথা, 'কল্লোল' তার চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে যখন অশ্লীল যৌন সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি শুরু করলো তখনও কিন্তু 'শনিবারের চিঠি' 'কল্লোলে'র লেখকদের তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করেননি। সেই সময় 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন, নরেশ সেনগুপ্ত এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুজনকেই তাঁদের গুরুস্থানীয় বলে আক্রমণ করেছেন।

বস্তুতপক্ষে নরেশ সেনগুপ্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'কল্লোল' 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'র নবীন সাহিত্যিকদের উদগ্র যৌনলালসা ও যৌন-বিকৃতিমূলক সাহিত্য রচনাগুলিই ছিল 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু অশ্লীলতা কিংবা যৌন জীবনের নগ্ন চিত্রাঙ্কনটাই এঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল না। আসল অভিযোগ ছিল, এঁদের অক্ষমতা, দৌর্বল্য, চতুর বৈষয়িক বুদ্ধির এবং অসুস্থ জীবনবোধের বিরুদ্ধে। সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন :

"তরুণেরা সেদিন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রৌঢ় বয়স উত্তীর্ণ হইয়া আজিও ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন যে, 'শনিবারের চিঠি'র অভিযান ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। কথাটা ঠিক

নয়। আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভানের বিরুদ্ধে, ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত স্বক্কণীলেহনের বিরুদ্ধে।”……

[আত্মস্মৃতি-১ম খণ্ড ॥ পৃঃ ২৬৮]

কিন্তু আসল ঘটনা হলো, এই সব উদ্‌ভ্রান্ত ও উৎকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের সামনে কোন মহৎ ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শনই ছিল না। বস্তুত কোন আদর্শেই তাঁদের, বিশেষত বয়োকনিষ্ঠদের কোন আন্তরিক আস্থা ছিল না। দেশ ও সমাজের এমন কি মানুষের প্রতিও তাঁদের যথার্থ বা আন্তরিক ভালবাসা ছিল না। তাই আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের অনুকরণ করে সমাজের শোষিত ও অবহেলিত মানুষকে নিয়ে কেউ কেউ লিখলেও তার যথার্থ চিত্রায়ণ হয়নি। নিজেদের অসুস্থ জীবনবোধ ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তাঁরা নিষিদ্ধ পল্লীতে কিংবা বস্তিতে গেছেন। তাই পঙ্কজের চেয়ে পাঁককেই তাঁরা বেশী করে দেখতে পেলেন, তারই দুর্গন্ধ এবং ক্ষতচিহ্নকে দগদগে করে চিত্রিত করে তুলতে লাগলেন তাঁদের সাহিত্য-কর্মে। বস্তুতপক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় অবক্ষয়ী শিল্পসাহিত্যই তাঁদের বেশি করে আকৃষ্ট করেছিল। গোর্কি তাঁদের ঠিক আদর্শ ছিল না।

‘শনিবারের চিঠি’ এই সব লেখকদের বিরুদ্ধেই তাঁদের শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে উপর্যুপরি আঘাত হেনে চলে ; সেই সঙ্গে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালদের এই সব রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করবার অনুরোধ জানালেন। ২৪শে মাঘ (১৩৩৩) সজনীকান্ত ও মোহিতলাল সামতেবেড়ে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে সাক্ষাতে সবই বলেন। শরৎচন্দ্র তাঁদের সমর্থন জানিয়ে যে-সব কথা বলেন সজনীকান্ত তার সারমর্ম করে ‘শনিবারের চিঠি’ মাসিকের প্রথম সংখ্যাতেই (ভাদ্র, ১৩৩৪) তা প্রকাশ করে দিলেন। তার অংশ বিশেষ ছিল এই :

……“নানা কথাবার্তার পর মোহিতবাবু বাংলাসাহিত্যে বর্তমান দুর্নীতি-বিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। শরৎবাবু প্রবন্ধটি অবিলম্বে কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলিয়া বলেন যে, বাংলা সাহিত্যে যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন আবশ্যক। ‘কল্লোল’, ‘কালি-কলম’, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কথা হয়। শরৎবাবু এই সকল পত্রিকার ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি এ বিষয়ে নিজেই লিখিতেন। তিনি বলিলেন, শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের

আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিতপটুত্ব তাঁহাকে কোন বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারে না। কিন্তু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মত পণ্ডিত জন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে।......অন্যান্য আরো অনেক কথাবার্তা শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হয় যে, আগাছাক্লিষ্ট বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুর্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন। সাহিত্য সাধনার সামগ্রী ; সেই সাহিত্যকে লইয়া এভাবে নাস্তানাবুদ করাকে তিনি দেশের পক্ষে অত্যন্ত কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার মতে, কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।"

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রায় মাস খানেক পরে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকেও একখানি দীর্ঘ পত্র লিখে এই সব সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত দাবি করলেন (২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩৩)। পত্রটি অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে ইতিমধ্যেই সংকলিত হয়েছে। তার প্রথমাংশটি ছিল এই :

"শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম নিবেদনমিদং,

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলা দেশে এক ধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরনের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গল্পের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা, stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোন বাঁধন মানে না ; গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভারও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature-এর দোহাই পাড়েন। যাঁর এগুলি পড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণত প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদে সাহিত্য বলে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে-সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্ক-বিরু সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার-শ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করবা একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদে অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বে

চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি, 'কালি-কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এসব লেখার দু'একটা পড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠি'তে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবলপক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।'' **

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সজনীকান্তকে লিখলেন (২৫শে ফাল্গুন '৩৩) যে, সম্প্রতি তাঁর আঙুলে আঘাত পাওয়ার জন্য তাঁকে লেখাপত্র বন্ধ রাখতে হয়েছে। তিনি লিখলেন:

"আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। আলোচনা করতে হলে সাহিত্য ও আর্টের মূল তত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ্‌বাত্যার ধূলো দিগ্‌দিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলবার বলব।"

অল্প কয়েক মাস পরেই সেই 'সুসময়' এসে গেল। এই সময় কবির জাভা যাত্রার কথা চলছিল। যাত্রার আগেই তিনি 'সাহিত্যধর্ম' শীর্ষক তাঁর বিতর্ক-মূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি রচনা করে যান। এটি শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৪) প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, সুসাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রশ্নে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তর্ক ও আলোচনা তোলার উদ্দেশ্যেই 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি রচনা করেন। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে 'যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে যে একটি উপদ্রব' আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল,

নৈতিক কিংবা সমাজহিতের দিক থেকে নয়, সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে তার প্রয়োজন ও সার্থকতা কতখানি, কবি এখানে সেই বিচারেই প্রবৃত্ত হন। তিনি বলেন :

......"আজকাল য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশনযুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু, সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মতো পায়নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিকতে পারে না।

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য ; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার, অলজ্জতাটাই আর্টের পৌরুষ।

"এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলো-মাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলি-খেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চিৎকারশব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্যকারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু, মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত বলেই আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী-২৩শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৪০৬-৭]

সাহিত্যে যৌন মিলনের স্থান সম্পর্কে কবি বিশেষভাবে বললেন :

"সাহিত্যে যৌন মিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ যৌন মিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলংকৃত করে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায়, সেইটিই হলো বিচার্য।" [ঐ ॥ পৃঃ ৪০৫]

পূর্বেই বলেছি, কবির 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৩৩৪) প্রকাশিত হয়। আর ঠিক তার পরের মাসেই (ভাদ্র, ১৩৩৪) 'শনিবারের চিঠি'র মাসিক সংস্করণের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সজনীকান্তের পূর্বোক্ত পত্র এবং কবির জবাবী-পত্র আর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 'ইণ্টারভিউ' প্রসঙ্গ নিয়ে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শিরোনামে সজনীকান্তের রচনাটিও প্রকাশিত হয়।

বলা বাহুল্য, 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' এবং 'শনিবারের চিঠি'র ঐসব রচনা প্রকাশ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশের সাহিত্যিক মহলে তুমুল তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠল। সজনীকান্তের কবিকে লেখা পত্র এবং তার কিছুকাল পরেই কবির 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ রচনা—উভয়ের কার্যকারণ সম্পর্কটা কারও কাছে তেমন অস্পষ্ট রইল না। সবচেয়ে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মশায়। কেননা সজনীবাবুর পত্রে এবং ইণ্টারভিউ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের জবানীতে তাঁকেই বেশি করে আক্রমণ করা হয়েছিল। তিনি 'বিচিত্রা'য় সঙ্গে সঙ্গে তার তীব্র প্রতিবাদ করে 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামক ('বিচিত্রা', ভাদ্র ১৩৩৪ ॥ পৃঃ ৩৮৩-৯০) প্রবন্ধ লিখলেন। মাস তিনেক পর, অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'কৈফিয়ৎ' শীর্ষক আরেকটি রচনায় তিনি তাঁর বক্তব্য-বিষয়কে আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করেন। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী লিখলেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা-বিচার' ('বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৪ ॥ পৃঃ ৫৮৭-৬০৬)। শরৎচন্দ্রও কম বিব্রত ও বিপর্যস্ত বোধ করছিলেন না। আগেই বলেছি, 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর জবানীতে আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধেই বেশি করে ক্ষোভপ্রকাশ ও বক্রোক্তি করা হয়েছিল। স্বভাবতই তিনি এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যকে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' এই শিরোনামে 'বঙ্গবাণী'তে (আশ্বিন, ১৩৩৪) এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি বলেন :

"ইতিমধ্যে বিনা দোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধ দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোক গিলিয়া মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

"এদিকে বিপদ এই যে, কালক্রমে আমারও দুই-চারিজন ভক্ত জুটিয়াছেন;

তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম ? দাও না তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।”……

[স্বদেশ ও সাহিত্য ॥ পৃঃ ১৮৮]

রহস্য করে শরৎচন্দ্র এমনি কথা আরও কিছু বলেছেন। কিন্তু কথাটা যে অংশত সত্য, একথা সেকালের সাহিত্যসেবী মাত্রেই স্বীকার করবেন। শরৎচন্দ্রেরও কিছু ‘ভক্তবৃন্দ’ ছিলেন, যাঁরা এই সমালোচনা-প্রবন্ধটির জন্য তাঁকে কম প্ররোচিত করেননি।

শরৎচন্দ্র এই নিবন্ধে কবির মূল বক্তব্যকে স্বীকার ও সমর্থন করে নিলেও আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কবির অনুযোগ ও মন্তব্যকে সমর্থন করতে পারেননি। অকারণে তিনি কবির সম্পর্কে কয়েকটি অসতর্ক মন্তব্য ও বক্রোক্তি করে বসেন। তার মূল কথাটা হলো : কবি ‘পরের মুখে ঝাল খেয়ে’—অর্থাৎ এঁদের লেখা না-পড়েই তার কিছু অন্ধ ভক্ত ও স্তাবকদের কথায় বা ‘কান-ভাঙানিতে’ প্ররোচিত হয়ে অন্যায়ভাবে এঁদের সম্পর্কে কটু কথা বলেছেন। তিনি লিখলেন :

“প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই, আমরা ত আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না, ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি আধুনিক সাহিত্যিক-পল্লীর দিকে। লক্ষ্য ? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

“কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ইপ্সিত লাভ না হোক শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন। কেন করিয়াছেন বলুন। হাঁ কি না বলুন।

“কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচি-ধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালি-কলমের দল ? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক সাহিত্যিক-দলন করিতে ভবিষ্যৎ মেয়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তান বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিকহীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে ? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক আধটা

টুকরা টাকরা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। সুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্র নয়, আমার বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

"ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নরনারীর যৌন মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহার লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস।"··· [ঐ ॥ পৃঃ ১৮৯-৯০]

তাছাড়া, 'আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁকতে পারে না'—'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে কবির এই কথাটা নিয়েও তিনি প্রায় অকারণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেন। অথচ এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা বললেন তাতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই জোরাল সমর্থন পেয়ে যায়। শরৎচন্দ্র লিখলেন:

······"বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে যে কি বুঝায়, আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে যদি শুধু Sex-Psychology, Anatomy অথবা Gynaecology বুঝাইত তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম।·· বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্য-কারণের সত্যকার সম্বন্ধ বিচার। চার এবং চারে আট হয়, এবং আট হইতে চার বাদ দিলে চার থাকে, ইহাই বিজ্ঞান। এ মনোভাবকে ভয় কিসের? কিন্তু তাই বলিয়া নোংরামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয়, একথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়, সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রীবিদ্যা শিখানোকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধহয় বাঙলাদেশের একজনও অতি-আধুনিক সাহিত্যসেবী এ কথা বলে না।" [ঐ ॥ পৃঃ ১৯৪-৯৫]

রবীন্দ্রনাথ যে বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটনে আদৌ ভয় পান না, পরন্তু বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রসারের জন্য তিনিই যে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে আসছিলেন, এ কথা শরৎচন্দ্র খুব ভালো করেই জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কবিকে 'বিজ্ঞান বিমুখ'

বলে কটাক্ষ করলেন। তাছাড়া কবি সাহিত্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের নিছক বৈজ্ঞানিক সত্য-প্রদর্শনের প্রচেষ্টাকেও কিংবা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার যৌক্তিকতাকেও অস্বীকার করেন নাই, কেননা সে-সব দেশে প্রায় সর্বস্তরেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা চর্চা অবাধ আর জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষার মানও আপেক্ষিক ভাবে অনেক উন্নত (অন্তত এ-সব দেশের তুলনায়)। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের উপসংহারে কবি পরিষ্কার বললেন :

"উপসংহারে এ কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহল-বৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে, সে-দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্মের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি সে-দেশের সাহিত্যে ধারকরা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে।" ...

[রবীন্দ্ররচনাবলী-১৩শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৪০৮]

কবি দেশের সে-যুগের তথাকথিত 'রিয়ালিস্ট' সাহিত্যিকদের সম্পর্কে প্রধানত 'নকলনবীশীয়ানা'র অনুযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু এদেরকে এতখানি অক্ষম নির্বোধ ও দুর্বল মনে করার কোনো হেতু ছিল না, কেননা এঁদের মধ্যে কয়েকজন বেশ শক্তিশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। কবি যেটা তাঁর পরিশীলিত রুচি ও ভদ্রতাবোধ থেকে সুস্পষ্ট করে বলেননি, তা হচ্ছে এঁদের অসুস্থ জীবনবোধ এবং আদর্শ ও নীতিহীনতা। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না, সেই সঙ্গে ছিল একটা চতুর ব্যবহারিক বা স্থূল বৈষয়িক বুদ্ধি। মানুষ যেখানে সবচেয়ে দুর্বল—সুড়সুড়ি দিয়ে সেই সব Baser Passions বা আদিম রিপু ও প্রবৃত্তিগুলিকে পাঠকের মনে উন্মোথিত করে তাদের মনোরাজ্য অধিকার এবং সেই সঙ্গে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠালাভ করাটাই ছিল এঁদের বেশীর ভাগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সাধারণ পাঠকের মনে ভুল ধারণা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্ম 'পিউরিটানিজম্' (!) বা 'নৈতিক শুচিবায়গ্রস্ততা'র জন্যই এ-সব সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে কবি এসবের বিচার করেননি,—সৌন্দর্য রসবোধ এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের দিক থেকেই ঐসব শিল্প-সাহিত্যের বিচার রাখতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কবির এই মূল বক্তব্যটাকে সমর্থন করে তাঁর 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে লিখলেন,

..."কিন্তু কবি তাঁহার 'সাহিত্য ধর্মে' নর-নারীর যৌন মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস সাহিত্যেও তাহা খাটি।... ...সমস্তই

নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর অপরের হাতে তাহাই কদর্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্যসেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত। নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি, এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটা বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। ততই শিল্পী ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য রচনা করে চলে।"... [ঐ ॥ পৃঃ ১৯৫-৯৭]

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে কবি ইউরোপায় আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের জন্য এদেশের সাহিত্যিকদের সমালোচনা করেছিলেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তার সমালোচনা করে লিখলেন :

..."আজ বিশ্বব্যাপী ভাব বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি ? যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমাদের সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচীবাসীর চেয়ে কম নয়।"

শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্রের এই বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করে লিখলেন,

..."Idea পশ্চিমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কি না।......অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানী প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, এমন কেহই নাই যে তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে।"...... [ঐ ॥ পৃঃ ১৯৯-২০০]

যিনি এদেশে এর প্রায় দুই দশক আগে থেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক মিলন-ঐক্যের কথা বলে আসছেন, তাঁকেই আজ এই সব কথা শুনতে হলো অন্যের কাছ থেকে,—এই হলো রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। আধুনিক ইউরোপের (শুধু ইউরোপের নয়—পৃথিবীর সব দেশেরই) শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সব কিছুকেই আহরণ করার জন্য দীর্ঘকাল ধরে কবি বলে আসছিলেন। তিনি সত্যিকারের আত্মস্থ ও 'স্বাঙ্গীকরণের' কথা বলেছিলেন—অন্ধ অনুকরণ বা নকলনবিশীয়ানার কথা বলেননি। তাছাড়া যা-কিছু আধুনিক তাই-ই প্রগতিশীল কিংবা গ্রহণীয় নয়। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের কোন্‌টা সুধা কোন্‌টা গরল সে-বিচার না করেই গোগ্রাসে সব কিছুকেই গলাধঃকরণ করাটাতেই কবি আপত্তি জানিয়েছিলেন। আধুনিক

বাঙালী সাহিত্যিকদের ইউরোপের আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের ভাব-ভঙ্গিমা গ্রহণ করায় কবির কোন আপত্তি ছিল না,—তাঁর প্রধান আপাত্ত ছিল, মোহমুগ্ধের মত নকলের চেষ্টা করায়। অনুকরণ ও স্বাঙ্গীকরণের বা স্বীকরণের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কবি তাঁর প্রবন্ধে কি বলতে চেয়েছেন, শরৎচন্দ্র তা ভালো করেই জানতেন। তা সত্ত্বেও তিনি কবিকে অহেতুক সমালোচনা করে বসলেন। তাই ঐ কথা বলার পরক্ষণেই তিনি বললেন—"কিন্তু এই সকল অত্যন্ত মামুলি কথা কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে আমার নিজেরই লজ্জা করিতেছে।"

কবির কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র আরও লিখলেন :

…"বাঙ্গলা সাহিত্যের অবিসম্বাদী বিচারক হিসাবে কবির কর্তব্য ইঁহার (নরেশচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যিকদের) সমগ্র পুস্তক পাঠ করা, কোথায় বা শ্লীলতার অভাব, কোথায় বা কাব্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে ইনি নিযুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। তবে এমনও হইতে পারে কবির লক্ষ্য নরেশচন্দ্র নহেন, আর কেহ। কিন্তু সেই 'আর কেহ'রও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি।" [ঐ ॥ পৃঃ ২০১]

অবশ্য কবিকে এই উপদেশ বা পরামর্শ দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র পরিষ্কার কবুল করেন যে, তিনি নিজেও নরেশচন্দ্রের সব বই পড়েননি,—অন্যদেরও না।

এই প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের একটা কথা অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। নানা ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি নবীন সাহিত্যিকদের উদ্দেশে আশীর্বাদ জানালেন এবং সেই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে ঐ সব নিষ্করুণ ও নির্দয় সমালোচনারও প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু এই সব ভালো কথা বলেও, উপসংহারে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অহেতুক তার ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখলেন :

"বিশ্বকবির এই 'সাহিত্য-ধর্ম'এর শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্যসেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে 'গুরুদেব' বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।" [ঐ ॥ পৃঃ ২০২]

কিন্তু প্রশ্ন হল, তখন শরৎচন্দ্র কেন কবির প্রতি এমন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন? শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ার প্রতিবাদ জানাতে

কবি অসম্মত হয়েছিলেন বলেই এই রকম ব্যক্তিগত ক্ষোভ। তবু সজনীকান্ত কিংবা তথাকথিত 'রবীন্দ্র-ভক্ত'রাই নন, এমনকি শরৎ-ভক্ত রাধারাণী দেবীও কবির প্রতি এই রকম ব্যক্তিগত ঝাল ঝাড়ার ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হয়ে চিঠি দিয়েছিলেন এবং তার উত্তরে শরৎচন্দ্র রাধারাণীকে যে চিঠি দেন, তাতে তিনি এ ব্যাপারটা প্রায় কবুলই করে ফেলেন। অবশ্য 'পথের দাবী' প্রসঙ্গ বিতর্কমূলক ও তার আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়; মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

পূর্বেই বলেছি, 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ নিয়ে বাংলাদেশে সাহিত্যিক মহলে যখন প্রবল তর্কবিতর্ক চলছে, কবি তখন জাভা-বালিদ্বীপে। এই জাভা ভ্রমণকালেই কবি 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি রচনা (২৩শে আগস্ট ১৯২৭ 'প্লানসিউস' জাহাজ) করেন। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের ঐ সমালোচনা প্রবন্ধটি প্রকাশের (বঙ্গবাণী আশ্বিন ১৩৩৪) প্রায় মাসখানেক আগে। অবশ্য 'সাহিত্যে নবত্ব' 'প্রবাসী'তে মাস দুয়েক পরে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ॥ 'যাত্রীর ডায়ারি' শিরোনামে কবির ধারাবাহিক রচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েই) প্রকাশিত হয়। বস্তুত 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি কবি তাঁর 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক হিসেবেই রচনা করেছিলেন। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে কবি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখলেন:

··"বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে।··· জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারায় এই নৌকো-চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে-যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজম্। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজশক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে।···

"য়ুরোপের সাহিত্যে চিত্রকলায় এই-যে বিহ্বলতা ক্ষণে ক্ষণে ও স্থানে স্থানে বীভৎস হয়ে উঠছে এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে, যেমন করে বলিষ্ঠ লোক মারাত্মক ব্যামোকেও কাটিয়ে ওঠে। আমার ভয়, দুর্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগবে তখন তার অন্যান্য নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠবে।" [রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৪১০]

বলা বাহুল্য, কবি এখানে আমাদের দেশের রুগ্ন ও 'দুর্বল'-প্রাণ আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্পর্কেই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ; ইউরোপের 'বলিষ্ঠ'প্রাণ শিল্পী সাহিত্যিকদের জন্য তাঁর কোন দুর্ভাবনা নেই। আজকের নানা চিত্তবিকৃতির পর্যায়কে তারা তাদের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির জোরেই অতিক্রম করে যাবে, যেমন নাকি অতীতে এসেছে।

কবি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই স্বীকার করেন, দেশের হাল-আমলের সব লেখকদের লেখা খুব একটা পড়বার সময় তিনি পান না। তবুও তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে শক্তি ও প্রতিভার স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছেন। তিনি তাঁদের প্রতিভার তারিফ করে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সতর্কও করে দিলেন :

"আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। .....অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ; বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।

"কিন্তু শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল করে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গিতে কেবল জলের নিচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতার দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে ; সে রূঢ়তাকেই বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকেই বলে পৌরুষ। বাঁধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলি বাঁধি বুলি সংগ্রহ করে রাখে ; বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে ; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে ; লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধাবুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন আর একটা লালসার অসংযম।" [ঐ ॥ পৃঃ ৪১১]

বলা বাহুল্য, কবি সাহিত্যে মানুষের সমাজ-আর্থনীতিক দুর্গতি—অর্থাৎ

দারিদ্র্য পীড়ন নির্যাতন এবং যৌন-সমস্যার স্থানকে অস্বীকার কিংবা লঘু করতে চাননি। তিনি পরিষ্কার বললেন :

"অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে ; যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়।......অথচ এঁদের মধ্যে অনেককেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্র-নারায়ণে'র ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি ; ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন ; দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডরের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।"

সাহিত্যে যৌন-সমস্যার স্থান সম্পর্কে বললেন :

"সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায় নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু, ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্‌জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণটা হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য।......পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এই জন্যেই, পাঠকসমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যে লালসাকে একান্ত উন্মথিত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদি, তা হলে এজন্যে বিশেষ শক্তিমান লেখকের দরকার হবে না—সাহস দেখিয়ে বাহাদুরি করবার নেশা যাদের লাগবে তারা এতে অতি সহজেই মেতে উঠতে পারবে।"...

[ঐ ॥ পৃঃ ৪১১-১২]

আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা perversion বা চিত্তবিকৃতি ঘটেছে বলেই তারা এমন নির্লজ্জ ও বেপরোয়াভাবে যৌনলালসার চিত্রাঙ্কনে রত হয়েছেন,—এই অভিযোগ তুলে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা (বিশেষত, 'শনিবারের চিঠি'র দল) নির্মম সমালোচনা করে চলেছিলেন। কবি এতখানি রূঢ় ভাষা ব্যবহার কিংবা নির্দয় হতে পারেননি পরন্তু তাঁদের প্রতি যথেষ্ট দরদ ও সহানুভূতিশীল হয়ে বললেন :

"আমি দেখেছি, কেউ কেউ বলছেন, এই সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক

চিত্তবিকার ঘটেছে বলেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক বলে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় 'আমরা কিছু মানিনে'—এটা তরুণের ধর্ম।...এই অহঙ্কারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে; সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু যেখানে না-মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সব-চেয়ে অযোগ্য।"......

[ঐ ॥ পৃঃ ৪১৩]

পূর্বেই বলেছি, শুধু অশ্লীল এবং যৌনজটিলতার নগ্ন চিত্রাঙ্কনই নয়, এঁদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যিক দেশের দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনকথা লিখতে প্রয়াসী হন। আদর্শ ও নীতিগতভাবেও কবির তাতে আপত্তি ছিল না, পরন্তু শৈলজানন্দ প্রমুখ কয়েকজনের শক্তির তারিফ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের সাহিত্যপ্রয়াসের মূল প্রেরণা সম্পর্কেই কবির সন্দেহ ছিল। তাঁর সন্দেহ, দেশের মাটি থেকে স্বাভাবিকভাবে এঁদের জন্ম হয়নি, আর দেশের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের দুঃখকষ্টও তাঁদের তেমনটি উদ্বুদ্ধ করেনি, যতখানি করেছে ইউরোপের 'বাস্তববাদী' সাহিত্য। এই নকলনবিশীয়ানার ও উৎকেন্দ্রিকতার সম্পর্কে কবি বার বার সতর্ক-সচেতন করে তাঁদের আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। এই প্রবন্ধেও তিনি যথার্থ হিতৈষী বন্ধুর মতই সেই পরামর্শ দিলেন এবং সেই সঙ্গে এঁদের মধ্যে যাঁরা ব্যতিক্রম—কবি একেবারে নাম ধরেই শৈলজানন্দের রচনা-শক্তির প্রশংসা করে বললেন:

"শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য-ঘোষণাব কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করেছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি—দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।" [ঐ ॥ পৃঃ ৫৫৩]

যাই হোক, 'প্রবাসী'তে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) কবির এই প্রবন্ধ প্রকাশিত

হওয়ার পর বিতর্ক আরও প্রবল হয়। কবি তাতে ক্ষুণ্ণ হননি পরন্তু খুশীই হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, সেই কথাই দিলীপ রায়কে জানিয়ে এক পত্রে (১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) তিনি লিখলেন :

…"এতে করে যে একটা আলোড়ন জাগিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌছনোটা খুব বেশি দরকারি নয়—দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর-এক যুগে উলট্-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়তচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে।…আমরা সত্যকে পেতে চাই শুধু কেবল পাওয়ার জন্যে নয়, চাওয়ার জন্যেও। এই কারণে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ঝগড়ার স্থানটা খুব বড়ো ; হারানোটা পাওয়ার প্রধান বন্ধ—কেননা, ফিরে ফিরে না পেতে থাকলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না।"… [অনামী ॥ পৃঃ ৩৪৩]

'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে কবি আধুনিক সাহিত্যিকদের 'নৈতিক চিত্তবিকার' ঘটেছে,—এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন, সম্ভবত এই ভেবে যে, এতে করে তরুণ সাহিত্যিকেরা তাঁদের আত্মসম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ ফিরে পাবেন। কিন্তু এই অভিযোগ কি সত্যিই অস্বীকার করা যায় ?

এই সম্পর্কে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন :

…"সে-যুগের তরুণ লেখকদের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেনি—একথা কিছুতেই বলা যাবে না।……'কল্লোল যুগে'র তরুণ সাহিত্যিকদের জীবনচর্যায় যে অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল সে কথা স্বীকার না করলে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। কিছুই-না-মানা এক বেপরোয়া বোহেমিয়ান ভাব ছিল সে যুগের নবীন সাহিত্যের যুগলক্ষণ। নিশামুখে মদ্যপান এবং বারবণিতাবিলাস ছিল তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেরই প্রায় নিত্যকৃত্য।……তখন পরাধীন ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে।……কিন্তু সাহিত্য তখন উন্মার্গগামী, উৎকেন্দ্রিক। যখন বাংলার হাজার হাজার যুবক হয় স্বগৃহে অন্তরীণ, নয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ, তখন বাংলার তরুণ সাহিত্যিকগণ ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় উচ্ছৃঙ্খল, এবং সাহিত্যে সেই বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকেই চরম সত্য বলে প্রচার করছেন। এ কাহিনী যেদিন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সত্য গ্রন্থিতে বাঁধা পড়বে সেদিন বাংলার ইতিহাস সে-যুগের তথাকথিত প্রগতিবাদী তারুণ্যকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।"

[রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত ॥ পৃঃ ৫৩-৫৪]

কলকাতায় তখন 'কল্লোল', 'কালি-কলম' এবং 'শনিবারের চিঠি'—এই দুই

গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ-বিতণ্ডা চরম আকার ধারণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে এই গোষ্ঠীগত সঙ্কীর্ণতার বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা ও দুর্নীতি দমনের অজুহাতে 'শনিবারের চিঠি' 'মুণিমুক্তা' শিরোনামে বিভিন্ন পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকার অংশবিশেষ চয়ন করে প্রকাশ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, কবি তা আদৌ সমর্থন করতে পারেননি। এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র অন্যতম সাহিত্যিক অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সতর্ক করে দিয়ে কবি যে ঐতিহাসিক পত্রখানি লেখেন (২০শে পৌষ, ১৩৩৪) তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তেই এই দীর্ঘ পত্রখানি প্রকাশিত হয়। কবি লিখলেন :

"প্রজারা খাজনা বন্ধ করাতে সামরিক গোমস্তা ব্যোমযান থেকে বোমাবর্ষণ করে খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছিল এমন একটা সংবাদ কিছুকাল পূর্বে শোনা গিয়েছে। আমার মনে হয় শনিবারের চিঠির সঙ্গে সেই শাসনপ্রণালীর কিছু একটু সাদৃশ্য আছে।

"শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়।...

"তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এটা অমরাবতীবাসীর ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো-আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো আধো কথা নিয়েই গর্ব করে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় 'আমি কচি খোকা', তখন বুঝতে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেছে।"...

কবি আরও বললেন :

"আমার নিজের বিশ্বাস, 'শনিবারের চিঠি'র শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্চে। যে-সব লেখা উৎকট ভঙ্গীর দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীর আয়ু এতে বেড়েই যায়। তাও যদি না হয়, তবু সম্ভবত এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনে প্রাণদণ্ডেরও বিধান আছে, প্রাণহত্যাও থামচে না।

"ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম; অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান—নব-নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগজী লেখক বলা যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফ-বিহারী।"

পরিশেষে কবি 'শনিবারের চিঠি'কে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের সত্যিকারের সাহিত্যপ্রতিভা আছে তাকে স্বীকার করার দ্বারাই সত্যিকারের মহত্ত্বের পরিচয় হয়। তিনি বললেন:

"আর একটা কথা যোগ করে দিই। যে-সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেছে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য সেখানে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।"

রবীন্দ্রনাথ যে কোনো পক্ষেই নেই এই চিঠি প্রকাশের পর অনেকের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু বিরোধ বিতর্ক কিংবা উত্তেজনার তেমন কিছু প্রশমন ঘটলো না। মাস দেড়েক পর এর একটা মধ্যস্থতা করবার উদ্দেশে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা ভবনে' পরের পর দু'দিন (৪ঠা এবং ৭ই চৈত্র, ১৩৩৪) আলোচনা সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ হলেন তার সভাপতি। এই আলোচনা-সভায় অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত মহলানবিশ, অপূর্বকুমার চন্দ, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল, রবীন মৈত্র, গোপাল হালদার, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, সজনীকান্ত প্রমুখ প্রবীণ ও নবীনদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা-সভার বিবরণ এবং কবি যে দুটি ভাষণ দেন তিনি স্বয়ং তার সংক্ষিপ্তসার করে লিখিত আকারে 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য দেন। প্রবন্ধ দুটি ১৩৩৫ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যথাক্রমে 'সাহিত্য রূপ' ও 'সাহিত্য-সমালোচনা' শিরোনামে প্রকাশিত (দ্রঃ রবীন্দ্ররচনাবলী ২৩শ খণ্ড) হয়। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।*

আলোচনা-সভার দ্বিতীয় দিনে কবি আধুনিক সাহিত্যিকদের অসংযত ও বেপরোয়া জীবনযাপন এবং তাদের সাহিত্যপ্রয়াস সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন:

..."আমি জানি, আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে লিখিনি।

* দ্রঃ লেখকের 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' ২য় খণ্ড।

কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম-বিগর্হিত মনে হয়েছিল। তাতে সমাজধর্মের যদি কোনো ক্ষতি করে থাকে, সমাজ-রক্ষার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সে-বিষয়ে চিন্তা করবেন ; আমি সে-দিক থেকে কখনো আলোচনা করিনি। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চির-কালের চিত্রে চিত্রিত করে।"……

তিনি আরও বলেন :

"আমরা একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে।…সে লড়াই করতে না পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। যুদ্ধের পথেই আমরা বীর্য পাব। যে-আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড়ো শক্তি পেয়েছে তাকে অবিশ্বাস করে যদি বলি, সেটা পুরোনো ফ্যাশন, এখন তার দিন গেছে, তা হলে আমাদের মৃত্যু। যে-ফল এখনও পাকবার সময় হয়নি তার ভেতর পোকা ঢুকেছে, এই আক্ষেপ মনের ভিতর যখন জাগে তখন সেটাকে কেউ যেন ব্যক্তিগত কলহের কথা বলে না মনে করেন।"

কবি পরিষ্কার করেই বললেন :

"যে-সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হতে পারত যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, বাতাসে ঘোরতর বিষসঞ্চার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয়তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন, এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই, অসংযতভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা এখনকার ডেমোক্র্যাটিক সাহিত্যে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। যদি কেউ বলেন, আমরা সে দলের নই, আমি খুশি হব। মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য যাঁরা কাজ করেন, ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সংযমের ভিতর দিয়েই করেন। কেউ যেন কখনও না বলেন, মত্ততার দ্বারা পৃথিবীর উপকার করব।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী-২৩শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৫০৪-৬]

আলোচনা-সভায় তিনি 'শনিবারের চিঠি'রও সমালোচনা করলেন। এই পত্রিকায় 'মণিমুক্তা' বিভাগে যে-সব অশ্লীল রচনার অংশবিশেষ সংকলন করা হচ্ছিল, কবি তার সমালোচনা করে বললেন, 'যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে

সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।'

তিনি আরও বললেন :

"'শনিবারের চিঠি' যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশুদ্ধভাবে সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, তা হলে বেশি ফললাভ করবেন এই আমার বিশ্বাস। ...'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে।"...

[ঐ॥ পৃঃ ৫১০-১১]

কিন্তু কবির এইসব উপদেশ বা পরামর্শ 'কল্লোল' 'কালি-কলম' কিংবা 'শনিবারের চিঠি'—কোনো পক্ষই গ্রহণ করেনি। অবশ্য নরেশ সেনগুপ্ত, নজরুল, শৈলজানন্দ, প্রমুখ* অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান লেখকেরা এই ঘটনার পর অনেকখানি সংযত হয়ে যান কিন্তু নবীন লেখকদের এই বেপরোয়া ভাবটা যেন আরও বেড়ে যায়। যেন জিদের বশে গোঁয়ার্তুমি করে তাঁরা এই পঙ্কিল সাহিত্য রচনায় বেশি করে মেতে ওঠেন।

'বিচিত্রা ভবনে'র আলোচনা-সভায় শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন কিনা তা জানা যায় না; অন্তত এখনও পর্যন্ত কারুর লেখায় তাঁর নামের উল্লেখ দেখা যায় না। তবে এই ঘটনার পর তিনি সমস্ত ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা বা পর্যালোচনার কাজে প্রবৃত্ত হন। বিশেষ করে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর নবীনদের এই গোঁয়ার্তুমিতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হলেন। একটা বছর ধরে এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রতিনিধিস্থানীয়,—তাঁদের লেখাগুলি ধৈর্য ধরে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন।

বলা বাহুল্য, এই রচনাগুলি পড়ার পর এঁদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ইতিমধ্যে দেশের আর্থনীতিক দুর্গতি বা দুরবস্থা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, অপরদিকে রাজনৈতিক সংকটও ক্রমেই ঘনীভূত হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবীতে দেশের চতুর্দিক থেকে যেমন আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে তেমনি শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। ফলে ইংরেজের দমননীতিও হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দেশের এত বড়ো লাঞ্ছনার বেদনা যে এইসব তথাকথিত 'রিয়ালিস্ট' সাহিত্যিকদের মনে

* এঁরা অবশ্য কোনো কালেই 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না।

কোনো সাড়াই জাগাতে পারল না, এতে করেই এঁদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনের কোণে ক্ষোভ ও হতাশা জমা হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়েই এঁদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যে-সব পরামর্শ দিয়েছিলেন তার সত্যতা এখন তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন। আর সেদিন এই সব তরুণ লেখকদের পক্ষ নিয়ে কবির সম্পর্কে তিনি যে-সব বক্রোক্তি করেছিলেন, তার জন্যও অনুশোচনায় তিনি যেন মরে যাচ্ছিলেন। কোন একটা উপলক্ষ করে তিনি সেদিনকার ভুলের জন্য প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি করতে চাইছিলেন। সেই উপলক্ষও এসে গেল।

ইতিমধ্যে অবশ্য কবির সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভও অনেকখানি কমে এসেছিল। কিছুকাল পরে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৩৩৫ সালে ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে' যে অনুষ্ঠান হয় কবি সশরীরে সেখানে উপস্থিত হতে না পারলেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি ও প্রতিভার প্রশংসা করে একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। পর বৎসর ৩১শে ভাদ্র তাঁর ৫৪তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'প্রেসিডেন্স কলেজ বঙ্কিম শরৎ সমিতি'র উদ্যোগে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই অভিনন্দন সভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যের প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্র যা বললেন নানাদিক দিয়েই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও সেদিনকার বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার বিশেষ সঙ্গতি ছিল না এবং পরে তা কারও কারও কাছে খুব প্রীতিপ্রদ ঠেকেনি। এদিন শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষণের শুরুতে অভিনন্দনসভার উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরই বললেন :

"...অনেক দিন পূর্বে বোধ হয় আপনাদের মনে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। একটু কঠোরভাবে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে 'বঙ্গ-বাণী'তে তাঁকে জানিয়েছি, যতটা রাগ করে তিনি বলেছেন, ততটাই সত্য কি না? তারপর থেকে দু'-একজনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা ঠিক হয় নাই, তখন নবীন সাহিত্য,—যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে ও নানা-ভাবে অনবরত বেরুচ্ছে গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি।"......

বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র এখানে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম'র প্রতিবাদে তাঁর 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। এর পর নবীন

সাহিত্যিকদের রচনাগুলি পাঠ করার পর তাঁর যে ধারণা হয় তা তিনি পরিষ্কার বা খোলাখুলি বলেন :

"আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—জিনিসটা সত্যিই বিশ্রী হয়ে উঠেছে।·· কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি দেখছি, আমি যাকে রস বলে বুঝি, তাঁদের ভিতর তার বড্ড অভাব।···একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না।"

[স্বদেশ ও সাহিত্য ॥ পৃঃ ২০৮-৯]

নবীন সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের এই ক্ষোভ প্রকাশের পশ্চাতে একটা ঘটনাও আছে। শরৎচন্দ্র স্বয়ং সেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বলেন যে, কিছুকাল আগে নবীন সাহিত্যিকদের কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁদের সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'তোমরা এটা করছ কেন?' জবাবে তাঁরা বলেন, 'এই জন্য করছি, আমাদের আর scope নেই। আমরা যখন যা ভাবি বা করি, যৌবনে যা প্রার্থনা করি, সেদিক থেকে রস রচনা বা সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাই না।' তার জবাবে শরৎচন্দ্র তাঁদের যে-সব কথা বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার করে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন :

..."বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না? মানবজীবন সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এ সব ত রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে, এ সব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনাটি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি? তোমাদের সাহস আছে, কিন্তু সাহস কেবল একদিকে হলে চলবে না। যেটাকে তোমরা সাহস মনে করছ, আমি মনে করি সেটা সাহসের অভাব। এদিকে ত শাস্তির ভয় নাই, কেউ তোমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না। যে দিকে শাস্তির ভয় আছে, সে দিকে সত্য সত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নীরব। লেখার শক্তি তোমাদের আছে স্বীকার করি; কিন্তু অন্য জিনিস তোমরা ধরলে না। পরাধীন দেশের কত রকম অভাব আছে—নানা দিকে আছে—এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার করে চলেছ।"

[ঐ ॥ পৃঃ ২০৯-১০]

সাহিত্য রচনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্যকে তাঁরা অবশ্য সঠিক বলে মেনে নেননি। তাঁরা উল্টো শরৎচন্দ্রের কাছে অনুযোগ করেছিলেন,

তিনি যে সাহিত্যসাধনা ছেড়ে দিয়ে রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, এতে করে নাকি বাংলা সাহিত্যের খুব ক্ষতি হচ্ছে।

এই জবাবে শরৎচন্দ্র যার-পর-নাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশের শিক্ষিত, বিশেষ করে নবীন সাহিত্যিকরা যে এমন কথা বা অনুযোগ তুলতে পারেন, এটা তিনি ভাবতেও পারেননি। মুহূর্তের মধ্যে এঁদের প্রকৃত অন্তঃস্বরূপটা শরৎচন্দ্রের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। মনে মনে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হলেও তিনি এঁদের সম্পর্কে হাল ছাড়েননি, শেষ পর্যন্ত তিনি ইউরোপের কয়েকটি দেশের নজির দিয়ে এবং নানা সৎ পরামর্শ দিয়ে এই সব নবীন সাহিত্যিকদের আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা গ্রাহ্যই করেনি। তার বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ পায় তাঁর এদিনকার সম্বর্ধনাসভার প্রত্যভিভাষণে। তিনি ঐ ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁর জবাবী বক্তব্যকে পুনরায় সংক্ষেপে এবং প্রকাশ্যেই জ্ঞাপন করতে চাইলেন। তিনি বললেন

…"তাঁরা অনুযোগ করলেন, সাহিত্য ছেড়ে আমি যে ওদিকে যাচ্ছি, সেটা ভাল হচ্ছে না। আমি তাঁদের বলেছিলাম, হয়ত সেটা সাহিত্যের ক্ষেত্র নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং ওদিকে যাওয়া আমি ক্ষতি মনে করি না। আমি যদি একেবারে ওদিকে না যেতুম তা হলে যত ক্ষতি হত, গিয়ে যে ক্ষতি হয়েছে, তার তুলনায় তাকে ক্ষতি বলে মনে করি না। লাভ হোক. ক্ষতি হোক, আমার জীবন ত শেষ হয়ে এল। ছাই ভস্ম যা হোক, কিছু লেখা রেখে গেছি। তোমরা সবেমাত্র আরম্ভ করেছ। এদিকটাকে অস্বীকার করো না। অন্যান্য দেশের যে দু'চারখানা বই পড়েছি, তাতে দেখেছি, এ জিনিসে তারা কখনও চোখ বুজে থাকেনি। এর জন্য তারা অনেক সহ্য করেছে, অনেক শাস্তি ভোগ করেছে। তোমরা তাই কর না কেন? তারা তা করবে কিনা আমি জানি না।"

শরৎচন্দ্র একান্তে ঠিক কি কথা তাঁদের বলেছিলেন তা বলা শক্ত। সম্ভবত আরও কঠিন কথাই বলেছিলেন। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ্য সভায়—বিশেষ করে তাঁরই জন্মদিনের সম্বর্ধনাসভায় বলা যায় না। তাছাড়া ইংরেজের তখনকার কড়া 'সেন্সর আইন'কে বাঁচিয়েই অনেক কথাই আভাসে-ইঙ্গিতে বলতে হয়েছে। কিন্তু এই আভাসে-ইঙ্গিতেও তিনি যে-সব কথা বলেছিলেন তাতে তো অস্পষ্ট বা হেঁয়ালি কিছু নেই। আধুনিক কালের যৌনজটিলতা কিংবা যৌনবিকৃতি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে কিনা কিংবা ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের অভ্রান্ততা ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। সেদিনকার

তথাকথিত 'রিয়ালিস্ট' সাহিত্যিকদের কাছে তাঁর বিনীত প্রশ্ন ছিল: যৌন সমস্যাটাই কি জীবনের একমাত্র সমস্যা, এইটাই কি একমাত্র রিয়ালিটি? পরাধীন দেশের মানুষের দিকে দিকে এত সমস্যা এত দুঃখ, শোষণ পীড়ন প্রবঞ্চনা লাঞ্ছনা—তার কোন কিছুই কি রিয়ালিটি নয়, এ সবই কি 'মায়া' ও অবাস্তব ঘটনা? এগুলিকে বিষয়বস্তু করে তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির সাহস দেখাতে পারেন না কেন? সে কি পীড়ন ও লাঞ্ছনার ভয়ে? সাহিত্যের বিষয়বস্তু (Content) ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নেই শুধু নয়, ব্যক্তিজীবনে সাহিত্যিকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের সংগ্রাম-সাধনার নজির দিয়ে বলেছেন কী ভাবে তাঁরা তাঁদের দেশের মানুষের সংগ্রামে শরিকান হয়েছেন। আর তিনি নিজে শেষ জীবনে যে দেশের রাজনীতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন তার জন্য জীবনটা সার্থক হয়েছে বলে মনে করেছেন।

এসব কথা বলতে বলতে আবেগে ও উত্তেজনার মুখে তাঁর সহজ সংযমের বাঁধটুকু ভেঙে যায়। তিনি অত্যন্ত কঠিন সুরেই নবীনদের তিরস্কার করে বললেন:

"···রবীন্দ্রনাথ যত চড়া করে বলেছেন তেমন করে বলবার শক্তি আমার নাই, থাকলে হয়ত তেমন করে বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার; আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হলে মানুষ আনন্দ বোধ করে, মানুষ বড় হয়, তাদের হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এ সব চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার।"···

তিনি আরও বলেছেন:

"তোমরা জান, তরুণদের আমি সত্যি ভালবাসি। তাঁদের সমস্ত চেষ্টায় আমি থাকি। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করিনি। কোনোদিন করবো বলে মনে করি না। সেদিন তাঁর কথা আমার এতটা হয়তো না বললেও হতো। কারণ; অতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনে।"

"আজ মনে হয়, যতই এদের বিরুদ্ধে কথা উঠেছে, ততই যেন এদের আক্রোশ বেড়ে চলেছে। অন্ততঃ আক্রোশের থেকে করছেন বলেই সন্দেহ হয়। মনে হয় যেন তাঁরা বলছেন,—বেশ করেছি, আরও করব। তোমরা বলছ, সে জন্য আরোও বেশী করব। একে কিন্তু সাহস বলে না। যে দিকে শাস্তির ভয় আছে

সে দিকে যদি এই পরিমাণ সাহস তাঁরা দেখাতে পারতেন, তাহলে মনে করতাম, আর কিছু না থাক, অন্ততঃ সত্যকার সাহস এঁদের আছে!……কিন্তু তা ত নয়, এ যেন 'বেপরোয়া হয়ে কতটা যেতে পারি দেখিয়ে দিচ্ছি' জানানো।"

[ঐ ॥ পৃষ্ঠা ২০-২২]

এক কথায় 'আধুনিক সাহিত্য' সম্পর্কে কবির পূর্বোক্ত অনুযোগগুলির সত্যতা ও যাথার্থ্য প্রায় পুরোপুরিই এখন তিনি মেনে নিলেন। কিন্তু তবুও বলতে হয়, আবেগ-উত্তেজনার মুখে তিনি তাঁর সাহিত্যবিচারের সহজ ভারসাম্যটি বজায় রাখতে পারেননি। 'নবীন সাহিত্য—যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরুচ্ছে'—এই বলে তিনি সমস্ত আধুনিক সাহিত্যিককে একই পর্যায় বা পঙক্তিতে ফেলে বিচার করেছেন। এঁদের মধ্যেও যে ব্যতিক্রম আছেন (স্বল্পসংখ্যক এবং নানা স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও) অন্তত তাঁদের কথা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হয়েছেন। তাছাড়া নজরুল, নরেশ সেনগুপ্ত, অতুল গুপ্ত প্রমুখের নামের উল্লেখ থাকাটা বাঞ্ছনীয় ছিল। নানা স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও এঁরা বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতি এবং শিল্প সাহিত্যের আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘকাল শুধু যুক্তই ছিলেন না, তাঁরা পুরোভাগেই এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের এই ভূমিকার উল্লেখ না-থাকাতে তাঁর ভাষণটি কিছুটা একপেশে হয়ে গেছে। অথচ 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে তিনিই এই অবিচার না-করার জন্য কবিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যাই হোক, এটা বোঝা যায়, শরৎচন্দ্র এদিন বিশেষ ঐ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই এই সব ক্ষোভোক্তি ও তিরস্কার করেছিলেন।

প্রসঙ্গত আরও একটি তথ্যের উল্লেখ থাকা এখানে বাঞ্ছনীয়। এর প্রায় এক বৎসর পরে 'প্রবর্তক সঙ্ঘের' উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনা উপলক্ষে এক আলোচনা-সভা হয়। এই আলোচনাসভায় শরৎচন্দ্র সাহিত্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব দেন। এই আলোচনাসভার বিবরণটি ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এদিনের আলোচনাসভায় সাহিত্যের রীতিনীতি এবং শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নও এসে পড়ে। এই প্রশ্নে শরৎচন্দ্র পুনরায় নবীন সাহিত্যিকদের উদ্দেশে পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন:

"আর একটা জিনিস বার বার দেখছি—সাহিত্য রচনার গোটাকতক নিয়মকানুনও আছে। দেখতে হয় রসবস্তু অশ্লীলতা-পর্যায়ে না-এসে পড়ে। শ্লীলতা-অশ্লীলতার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্মরেখা আছে, যার এক ইঞ্চি ওদিক

পা বাড়ালেই সব Vulgar—নষ্ট হয়ে যায়। একটু পা টলেছে ত আর রক্ষা নাই। অবশ্য আমি রসিক লোকের কথাই বলছি। Vulgar সাহিত্য সর্বদাই বর্জ্জনীয়।" [শরৎচন্দ্রের রচনাবলী—ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পৃঃ ২৫১-৫২]

তিনি আরও বলেন :

"আজকাল অনেকেই লিখছে ; কিন্তু তাদের অনেককেই ঠিক লেখক বলা চলে না। তাদের লেখায় সংযম দেখা যায় না। যৌন সম্বন্ধ নিয়ে তারা এমন একটা গোলমাল করছে যে, তাদের লেখা সাহিত্যপদবাচ্য কি না সন্দেহ। এ সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাহির থেকে আমদানি করা। নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই—তাই পরের ধার-করা জিনিস চালাতে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুলছে। কেহ কিছু বললে তারা জিদের বশে বলে—"খুব করব, লিখব, বলব।' কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এ রকম সভা-সমিতি করে যদি তাদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে তা থেকে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।"

[ঐ ॥ পৃঃ ২৫৪-৫৫]

'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে কবি তথাকথিত 'আধুনিক লেখক'দের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের নকলনবিশীয়ানার অভিযোগ করেছিলেন। লক্ষ করবার বিষয় শরৎচন্দ্রও এদিনের আলোচনাসভায় 'আধুনিক সাহিত্যিক'দের বিরুদ্ধে প্রায় সেই একই অভিযোগ করেছেন। বরঞ্চ আরও কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন ঐ সব 'যৌনপ্রধান' বা 'যৌন-সর্বস্ব' সাহিত্য রচনার জন্য।

'কল্লোল' 'কালি-কলম'-এর যুগ প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার কারণ এই, তাঁদের 'উত্তরসাধকরা আজ বাংলা সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে গুরু-গোঁসাই' সেজে বসে আছেন। 'Sex and Crime'ই হলো তাঁদের একমাত্র অবলম্বন, উপজীব্য। অশ্লীল এবং উদগ্র যৌন-লালসা ও বিকৃতিমূলক সাহিত্য রচনায় এঁদের মধ্যে কে কাকে কতখানি ছাড়িয়ে যেতে পারেন, তারই তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যের আজ চরম দুর্ভাগ্য যে, এঁদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মত কোনো সাহিত্যমহারথী ও দিকৃপাল জীবিত নেই। 'শনিবারের চিঠি'র মতো কোন সমালোচনাপত্রও নেই। কিন্তু আফ্‌শোষ করব না। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সেই সব তিরস্কার ও সতর্কবাণী তো আছে।

প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

চব্বিশটা ঘোড়া মরলো। ভেড়া, ছাগলও মরলো। শির টেনে টেনে পড়ে যায়, চিঁ, চিঁ, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে আর মরে যায়। বোঝাই গেল ডাইনির চোখ লেগেছে। এসব জিনিস জানেন বোঝেন গাঁয়ের এমন একজন লোক বললেন, একটা জীবন্ত ঘোড়া পুড়িয়ে দাও, ডাইনির কু-দৃষ্টির কাটান হবে। তাই করলাম। সব রোগ ভাল হয়ে গেল।

ইংলণ্ডের একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী একজন ধনী কৃষকের মুখে এই সংবাদ শুনেছিলেন। পরে তিনি তাঁর সংগৃহীত মূল্যবান তথ্য হিসাবে লিখে রেখে গেছেন তাঁর ১৬০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দের ডাইরীতে। নিউটনের প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশের মাত্র দুই পুরুষ আগে ইংলণ্ডের উপর থাকের মানুষের মধ্যে কিরূপ কুসংস্কার ছিল ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তারই নিদর্শন হিসাবে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

আশ্চর্যের কথা কিছু নয়। এই বিংশ শতাব্দীতে (যখন মানুষ বিজ্ঞানের জ্ঞান ও কারিগরি কৌশলে মহাকাশে উঠেছে) কলকাতা শহরের বুকেও এমন শিক্ষিত মানুষ পাওয়া যাচ্ছে যাঁরা অধ্যাত্ম শক্তির এমন বিকাশে বিশ্বাস করেন যে তার দ্বারা ইচ্ছামতো শূন্য হাতে ফাউণ্টেন পেন বা ঘড়ি এসে পৌঁছে যায়। এইরূপ তত্ত্ব যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় উপরে উল্লিখিত ঘোড়ার রোগের অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্বাসযোগ্য হবে না কেন? যে-মানসিক প্রক্রিয়ায় একটি গ্রহণযোগ্য হয়, সেই মানসিক প্রক্রিয়াতেই অপরটিও গ্রহণযোগ্য হতে হয়।

এক্ষেত্রেও হচ্ছে। হচ্ছে প্রধানতঃ সেই উপর থাকের মধ্যেই। অবশ্য ধনতন্ত্রের আশীর্বাদে সব রকম বিশাল জিনিসের ক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনই—প্রত্যয়ের জোরে আর ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রের সঙ্কটের আবর্তে অনবহিত বিহ্বল মানুষের বিহ্বলতার সুযোগে অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও ছড়াচ্ছে। মানুষের শৈশব কালে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্লাবন, সর্পাঘাতে বা অপঘাতে মৃত্যু—এই সব অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ এবং কখনও কখনও প্রকৃতির উদার স্নেহ বর্ষণে অপ্রত্যাশিত আনন্দ এ সবই কুসংস্কারের জন্ম দিত। প্রকৃতির শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানান প্রক্রিয়া এবং উপাস্যের উদ্ভাবন হতো। আজ ধনতন্ত্রের

ওলটপালট কি কম? হঠাৎ বেকারীর নোটিস পেয়ে পথে বসতে হচ্ছে, আচম্বিতে দাম বেড়ে মুখের খাবারও যেন কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অবহিত মানুষ সংগ্রামের পথে ধরছে, কিন্তু অনবহিত বিহ্বল মানুষও আছে যারা দুর্ভাগ্যের দাওয়াই ও সৌভাগ্যের পরশমণির জন্য, দৈবশক্তির বাহক বলে যারা দাবী করছে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের পিছনেও ছুটছে। ধনতন্ত্রের যুগে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, উৎপাদনের কৌশলের উন্নয়ন, ঘন ঘন পরিবর্তন যেমন মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি ও কুসংস্কারের দূরীকরণের সহায় হয়, আবার উপরে উল্লিখিত কারণে কুসংস্কার সংক্রমণেরও সুযোগ হয়।

বৌদ্ধযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কত মহৎ মানুষই তো ছোঁয়াছুঁয়ি ভেদবিভেদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চেষ্টা করেছেন। মেহনতি মানুষের কান সহজে এসবে আকৃষ্ট হতো। যারা এক মাঠে হাল বয়, এক নদীতে দাঁড়ি টানে, তাদের ব্যবহারিক জীবনই তাদের মনকে এসবের অনুকূল করে। বিভেদ জর্জরিত ভারতের বুকেও যে ঐক্যের আবেদন মাঝে মাঝে ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরেছে তার কারণও এই। কিন্তু ঐটুকু পর্যন্ত। বাইরের ব্যবহারিক জীবনকে অনুকূলে মোচড় দিতে পারেনি।

কিন্তু ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের সূচনা শুরু হতে লাগলো। কলকারখানা, শক্তিচালিত সাধারণের যানবাহন ইত্যাদির ফলে পরিবর্তন ত্বরান্বিত হলো। যা এতদিনের এত মানুষের চেষ্টায় সম্ভব হয়নি তাই সম্ভব হতে দেখা গেল। বেড়ার কাঠিগুলো খসে খসে পড়তে লাগলো। অবশ্য প্রথমে গতি থেকেছে মন্থর। অচলায়তনে ফাট ধরা সহজ নয়। ফলে কারখানাতে শ্রমিকের মধ্যেই বেশী সুস্পষ্ট হলো। কখন যে একজনের গ্রাস আর একজনের মুখে উঠেছে, কেউ ভেবে দেখেনি, কেউ তার তারিখ খুঁজে পাবে না। অবশ্য জাতীয় আন্দোলনে যেটুকু গণতান্ত্রিক ভাবধারা বিকশিত হয়েছিল, আর শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যা বলিষ্ঠ হয়ে দেখা দিয়েছিল তা যেমন একদিকে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন তেমনই সমাজের অনুকূল রূপায়নে থেকেছে তার শক্তিশালী প্রভাব। মেহনতি মানুষের মধ্যে এই মানসিক এবং ব্যবহারিক আদানপ্রদান এবং ঘাতপ্রতিঘাতে অচলায়তনের ফাটল বাড়তে বাড়তে ধূলিসাৎ হতে চলেছে এবং মানুষে মানুষে মানুষ হিসেবে ব্যবধান ধ্বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীসংঘাতের রূপরেখা সুস্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে। মার্কস এই ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন।

অবশ্য সম্পত্তিশালী শ্রেণীর মধ্যে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর এই দিকে

অগ্রগতি হয়নি তা নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে তা কত কঠিন ছিল অতীতের কিছু দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যাবে। সহজভাবে মেলামেশার জন্য তাঁদের অনেক সময় আশ্রয় করতে হতো কুপল্লী ও সুরাপান। জলের চেয়ে সুরা বেশী সচল। অন্ততঃ তাঁদের একজন এই মর্মে কৈফিয়ৎ দিয়ে গেছেন। (দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য।) রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময় এক সভায় একদল বক্তার জলপানের প্রয়োজন হওয়ায় মঞ্চস্থ নেতাদের এক মঞ্চে উপবেশন সঙ্কটাপন্ন হয়েছিল। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনেও এসব অসুবিধা থেকেছে। কিন্তু মেহনতি মানুষের জড় জমায়েত ও সমর্থন অগ্রণী মানুষকে সহজেই এসব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে।

শহরে এসব অগ্রগতি যত সহজে হয়েছে গ্রামে তা হয়নি। গ্রামে বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোর প্রসার হয়েছে আরও বেশী মন্থর। ধনতন্ত্রের আঘাতে নানান রূপে বিধ্বস্ত হলেও, উৎপাদনের পদ্ধতি পূর্বে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। প্রতি ঋতু, প্রতি মাসের করণীয় ছিল সুনির্ধারিত। ফলনও ছিল একই। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্ভিক্ষ বা বান-বন্যার ক্ষতি, তাও অজানা ছিল না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস একই রূপ ঘটনাবলীর পুনরাবর্তন। সংস্কার ও ভবিতব্যের শাসনও মানুষের মনে অপরিবর্তনীয় ভাবে থেকে যেত। ধনতন্ত্রের বেড়াজালে পড়ে বাজারদরই একমাত্র ঘটনা যা মাঝে মাঝে সচকিত করতো। ফসলের দরের মার বা কেনা জিনিসের দামে আঘাতও শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বিক্ষোভ জমা হতো। মাঝে মাঝে ফেটেও পড়তো—যেমন ১৯২০-২১ কিংবা ১৯৩০-৩২-এর অসহযোগ আন্দোলনে ঘটেছে। চেতনারও প্রসার হয়েছে। কিন্তু তবু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ছিল অপেক্ষাকৃত মন্থরগতি। উৎপাদন পদ্ধতির অপরিবর্তন মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের তাগিদকে ঝিমিয়ে রাখতো। যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী কালে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর কৃষিতে ধনতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত বিকাশ ঘটতে থাকলো এবং উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর হতে লাগলো। মার্কস বলেছিলেন ধনতন্ত্র পশ্চাৎপদ জাতিকেও উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তন করে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। শহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে বহুপূর্বেই এইরূপ পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়েছিল। কিন্তু গ্রামে কৃষিতে এখন সেই পরিবর্তন যেমন সুস্পষ্ট হয়েছে অতীতে তেমন ছিল না। সুখ যার হচ্ছে তার হচ্ছে। গরীবের দুঃখ অভাব অভিযোগ বেড়েই যাচ্ছে। এসব বিষয় জানা। এখানে ও বিষয় আলোচনা করছি না।

জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনায় যে রূপান্তর ঘটেছে তার কথাই আলোচনা করছি। পরিকল্পিতভাবে কেমিকেল সার ইত্যাদির প্রয়োগ হচ্ছে এবং প্রত্যাশিত ফসল উঠছে। আশা সফল না হলে তার হেতুও জানা যাচ্ছে। নানান রকম উপায়, পদ্ধতির রূপান্তর ও নতুন নতুন বীজের ফলে ঋতুর সীমা অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে। ফসল এখন সচরাচর সুনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মানুষের মনেও ভবিতব্যের শাসন অনেক বেশী শিথিল হয়ে গেছে। মানুষ পরিকল্পিতভাবে কৃষি ও ফলনে রূপান্তর ঘটাতে পারে এ-চেতনা প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্যের স্বাদ এনেছে এবং ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় গ্রামের মানুষের উপলব্ধিতে অলৌকিকের প্রত্যাশা ও আতঙ্কের পরিবর্তে লৌকিক শক্তির সম্ভাবনা স্বতঃই স্থান লাভ করেছে। পাম্প, শ্যালো, ট্র্যাক্টর, হাসকিং মেশিন প্রভৃতির ব্যবহার উল্লিখিত চেতনার প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। অনেক নতুন শব্দ গ্রামের কথোপকথনে প্রবেশ করেছে এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে।

এইভাবে শহরে ও গ্রামে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে মেহনতি মানুষের সংস্কৃতির বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, সভা সমিতি ও সংগঠনের কাজ, ফলে রাজনীতিক শিক্ষা, সুস্থ ও জীবনধর্মী সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করছে। বৃহত্তম অংশের এইরূপ অগ্রগতি সমগ্র সমাজকে অবক্ষয়ের সংস্কৃতি থেকে রক্ষা করছে।

অন্যদিকে সমাজের উপর তলার মানুষই এখন সেই অবক্ষয়ের সংস্কৃতির উৎস, ধারক, বাহক ও পোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তির স্থান দখল করেছে কুসংস্কার এবং সেই কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভেদবিভেদের কলুষের উদ্গার। ধর্মান্ধতা, জাতিবৈরিতা, জাতিদম্ভ, ভাষাদম্ভ, সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রভৃতি হয়েছে এদের অস্ত্র। একচেটিয়া ধনতন্ত্র এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের সেবকরা জানে আজকের গণতন্ত্রের অভিযানের সামনে এ ছাড়া আর কোনও অস্ত্র তাদের নেই। ইহা সত্য যে এ অস্ত্র বার বার ব্যর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা এটা ব্যবহার করে।

দুঃখের বিষয় এখনও দেশে এর নিকৃষ্টতম ফল দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি রাজ্যে তপশীলী সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উপর নৃশংসতম অত্যাচারের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ ঘটনা অবশ্য সাধারণ নয়। কিন্তু একথা বুঝতে হবে যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নয়। ডিগ্রিতে বা ন্যূনতম মাত্রায় যা বর্তমান (কোথাও কিছু কম কোথাও বেশী) এ তারই চূড়ান্ত নিদর্শন। কারণ মূল চরিত্রটা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা, ব্যবধান এবং পার্থক্যবোধ। এর সঙ্গে আছে একটা ঘৃণ্য ছোট-বড়র

কুসংস্কার। অর্থনীতিক প্রগতির বিকাশেরও বড় অন্তরায় থাক-ভাগ। সব কিছুর আড়ষ্টতা এর লঘুতম পরিচয়। শ্রমিকের এক পেশা থেকে আর এক পেশায় যাওয়া সহজ ও সরল নয়। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে-সব ধ্যানধারণা জেগে ওঠে, হাতের বা বুদ্ধিকৌশলের প্রাত্যহিক উৎকর্ষ, নতুন নতুন তথ্য, যার খবর বাইরে থেকে এসে পৌছয়—এ-সব যেখানে উৎস বা যেখানে পৌছয় সেইখানেই আটকে থাকে। অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে ধনবিজ্ঞানের ভাষায় "ফ্রি ফ্লো অব লেবার অ্যাণ্ড আইডিয়াজ" বলে, তা নেই। প্রবাহ মুক্ত নয়। আলে আলে জল আটকে আটকে যাওয়ার মতো বিঘ্নিত হয়। দ্রুত অবাধভাবে ছড়িয়ে পড়ে ত্বরিত সমগ্র সমাজের প্রবাহে রূপান্তরিত হবে এমন উপায় নেই। অথচ এইরূপ অবাধ প্রবাহের সুযোগ না থাকলে সমাজতন্ত্র কেন, ধনতন্ত্রের রূপান্তরও ব্যাহত। অগ্রসরতম দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এই পশ্চাৎপদতা কিরূপ বাধা তা সহজে অনুভূত হয়।

ধর্মের বন্ধনও চিন্তার প্রবাহের প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মুসলমানের যেখানে দরজা খোলা হিন্দুর সেখানে দরজা বন্ধ, হিন্দুর যেখানে দরজা খোলা মুসলমানের সেখানে দরজা বন্ধ। এই বুদ্ধির ঘরে তালা দেওয়া দরজা নাড়ার উপায় নেই। এই আবদ্ধতা শুধু ধর্মশাস্ত্রে লিখিত নয়। অ্যারিস্টটলের লজিক যা হাজার বছর আগে বাগদাদের মাদ্রাসায় পাঠ্যসূচী, এখনও কলকাতা মাদ্রাসায় তারই অনুকরণে পাঠ্যসূচী। ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে এই আবদ্ধতাকে আরও বৃদ্ধি করা হয়। যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতিরোধ এরূপ ক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক। চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যাদের দরজা খোলা বলেছিলেন, নিরন্তর চেষ্টার ফলে তাদের দরজাও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তা ছাড়া যুক্তির বিরুদ্ধে ধর্মীয় সংস্কারের প্রাকার এখানেও কম নয়।

সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য সাম্প্রদায়িক দল এবং তাদের সহায়ক মুষ্টিমেয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ইতিহাসকেও বিকৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আর-এস-এস এ ব্যাপারে দু-পা এগিয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের জন্য ভারত সরকারকে স্মারকলিপি দিয়েছে। সুখের বিষয় প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এসেছে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং মেহনতি মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় এই বিদ্বেষের সংস্কৃতির প্রতিরোধ পশ্চিম বাংলায় জোরদার থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। সারা ভারতে এর সবলতর প্রতিরোধের কার্যক্রম যাঁরা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাঁদের মনোযোগ দাবী করে।

ধর্মধ্বজাধারী এখন সুচতুর ভাবে একটি রব তুলেছেন। ব্যক্তিগত ধর্মমত পোষণ করা এবং পালন করার অধিকার মানতে হবে এই যথার্থ দাবীর বদলে তাঁরা দাবী তুলেছেন প্রত্যেক নাগরিককে অন্য নাগরিকের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে হবে। এই অদ্ভুত "সেকুলারিজ্‌ম্‌" বিরোধী তত্ত্বকেই তাঁরা সেকুলারিজ্‌ম্‌ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। গণতন্ত্র ও সেকুলারিজমের অঙ্গ একটি সুপরিচিত উক্তিতে পরিষ্কার। "আমি তোমার একটি কথার সঙ্গেও একমত নই কিন্তু সে-কথা বলার অধিকারের জন্য সংগ্রামে আত্মদান করতে প্রস্তুত। —আই ডু নট এগ্রি উইথ এ সিঙ্গ্‌ল্‌ ওয়ার্ড ইউ সে বাট্‌ আই শ্যাল ডাই ফর ইওর রাইট টু সে ইট।" কোনও ধর্ম পালনের অধিকারও যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার, সে-ধর্ম বা যে কোনও ধর্মকে অস্বীকার করা (যেমন নাস্তিকরা বা সংশয়বাদীরা করেন) তেমনই গণতান্ত্রিক অধিকার। সুতরাং ধর্ম পালনের অধিকারের বদলে ধর্মকেই শ্রদ্ধা করার দাবী গণতন্ত্র বিরোধী। এইরূপ গণতন্ত্র বিরোধী চিন্তাধারার কারণেই ইতিহাসে ধর্ম নিয়ে হানাহানি হয়েছে, স্পেনে ইনকুইজিশান বসেছে, ফ্রান্সে প্রোটেস্টান্টদের গণহত্যা হয়েছে, আর আমাদের দেশে যা হয়েছে তার কথা তুলেই কাজ নেই। সুতরাং এই গণতন্ত্র বিরোধী রবের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করাও কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরের সমগ্র বক্তব্যকে তীক্ষ্ণতর করার জন্য লেনিনের একটি বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করবো: "রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ও আশু কর্তব্য ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ মধ্যযুগীয়তার অবশেষগুলির উচ্ছেদ, সেগুলিকে পুরোপুরি চূর্ণ করা, রাশিয়া থেকে এই বর্বরতাকে, এই লজ্জা বিদায় দেওয়া, আমাদের দেশের সব সংস্কৃতি ও সব প্রগতির এই বিরাট বাধা অপসারণ করা।·· আমাদের বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আধেয় সম্পর্কে বক্তব্য আগে শেষ করি।·· বিপ্লবের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আধেয়র অর্থ—, মধ্যযুগীয়তা, ভূমিদাস প্রথা, সামন্ততন্ত্রকে দেশের সামাজিক সম্পর্ক (ব্যবস্থাধারা, প্রতিষ্ঠান) থেকে বিদায় দিয়ে একে পরিশুদ্ধ করা হচ্ছে।···ধর্ম অথবা নারীদের অধিকারহীনতা, অথবা অরুশ অধিজাতিগুলির উপর পীড়ন ও অসাম্যের কথা ধরুন। এ সবই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমস্যা।· এ সবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আধেয়। দেড়শ ও আড়াইশ বছর আগে সেই বিপ্লবের (একই সাধারণ টাইপের প্রতিটি জাতীয় প্রকারভেদ ধরলে এইসব বিপ্লবের) প্রগতিশীল নেতারা মধ্যযুগীয় বিশেষাধিকার থেকে, কোনও এক বা অপর ধর্মের (অথবা "অধর্মের আইডিয়া", সাধারণভাবে "চার্চ") রাষ্ট্রীয় বিশেষ

অধিকার থেকে, জাতিগত অসাম্য থেকে মানবজাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু পূরণ করেননি।"

পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রে যা সমাধা করতে বাকী ছিল রুশবিপ্লব রাশিয়ার ক্ষেত্রে তা সমাধা করলো। লেনিনের ভাষায়: "এই যে স্তূপীকৃত জঞ্জালপূর্ণ আস্তাবল, প্রসঙ্গত, ১২৫, ২৫০ বা আরও বেশী বছর আগে (ইংলণ্ডে ১৬৪৯ সালে) সমস্ত অধিকতর অগ্রণী রাষ্ট্রই তাদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের সময় বহুলাংশে পরিষ্কৃত না করেই রেখে দিয়েছিল; সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালপূর্ণ আস্তাবলের যে কোনো একটা ধরুন, দেখবেন আমরা তা পুরো সাফ করে ছেড়েছি।....."

যে সব পশ্চাৎপদতার কথা লেনিন উল্লেখ করেছেন (নিজ দেশের ক্ষেত্রে তাকে 'বর্বরতা' বলতেও তিনি দ্বিধা করেননি) সে সব পশ্চাৎপদতা আমাদের দেশে এখনও এবং বহুগুণ বেশী পরিমাণে বর্তমান। এই সব পশ্চাৎপদতাকেই প্রতিক্রিয়াশীলরা অবলম্বন করে। এর ফাঁক ধরেই একদিন ইংরেজ এখানে প্রবেশ করেছিল এবং সুচতুরভাবে একে ব্যবহার করে টিকে ছিল। আজও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ নানান ছাঁদে নানান রূপে আগ্রাসন ও অনুপ্রবেশের চেষ্টায় এই ধরনের পশ্চাৎপদতা ও তার পরিপোষক সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে। দেশের সমগ্র স্বার্থে এখানেও এই আস্তাবলের জঞ্জালকে পুরো সাফ করা আশু প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কাজ ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তির আশু করণীয়, আশু কর্তব্যের অন্যতম।

সাহিত্যে অপসংস্কৃতি

ক্ষুদিরাম দাস

সংস্কৃতি শব্দের মৌল অর্থ পরিশীলিত কর্ম। বৈদিক সাহিত্য যেখানে বলছে 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' সেখানে সংস্কৃতিকে যাবতীয় অধ্যবসায়মূলক মানবিক কর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কায়িক শ্রমের দ্বারা সাধিত উদ্‌যোগও এতে বর্জিত হয়নি। নিসর্গের মৌল উপাদান ব্যবহার করেও যেসব ক্ষেত্রে মানুষ স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে সেসব বিষয়ে মানুষের প্রয়াস, যেমন, হস্তশিল্প, যন্ত্র, কারুশিল্প, অন্ন উৎপাদন, গৃহনির্মাণ, সমাজগঠন, জ্ঞানময় যাবতীয় বিদ্যা, কাব্য সংগীত নাটকাদির গ্রন্থন সবই ব্যাপকভাবে উক্ত সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। পরবর্তী কালে মনন, জ্ঞান, কল্পনার ঐশ্বর্যদৃষ্টে মানসকৃতিকেই বিশেষভাবে সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা হয়, এসবের মধ্যেই মানুষের আত্মার উন্নয়ন লক্ষ্য করা হয়। আজকের দিনেও আমরা সংস্কৃতি বলতে ঐগুলিই বুঝে থাকি। দেহ ও প্রাণের ধারণ পোষণের মূলীভূত প্রয়োজনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রাদির নির্মাণ ও অন্যান্য কর্মকে স্থূল বলে সংস্কৃতির বাইরে রাখতেই যেন আমরা আগ্রহী, যদিও হাতের সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের প্রয়োজন হয় এমন শ্রমবস্তুকেও আমরা স্বচ্ছন্দে সংস্কৃতির মধ্যে স্থান দিয়ে থাকি। যেমন, মন্দির-প্রাসাদের শিল্প ও অলংকরণ, বস্ত্রশিল্প, নৌশিল্প, শাঁখাশিল্প, বাসনশিল্প, প্রভৃতি। এরই সঙ্গে মোগল আমলে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার এবং ইংরেজ আমলে নারীর মর্যাদারক্ষা, সুরুচি—refinement এসে যোগ দিয়েছে। আসলে সংস্কৃতি শব্দের যেমন ব্যাপক অর্থ রয়েছে, তেমনি রয়েছে সংকীর্ণ অর্থ। কথাবার্তায় স্থূলতার প্রকাশ ঘটলেও আমরা বলি কাল্‌চারের অভাব। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ যে-যে ক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজনের সীমাকে লঙ্ঘন করতে পেরেছে, সেই সেই ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে তার কাল্‌চারের প্রকাশ ঘটেছে। এই অর্থে যাবতীয় স্বার্থত্যাগময় কর্ম (অবদান), সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি যাবতীয় শুদ্ধ মানস-উৎকর্ষের প্রকাশ কাল্‌চারের অঙ্গ। এই অর্থে অসৌজন্য, অশিষ্ট আচার-আচরণ, নারীজাতির প্রতি কটাক্ষ, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মানহানি, উৎসবের নামে চরম হুল্লোড় এবং সাহিত্যে সংগীতে চিত্রে ছায়াছবিতে স্থূল যৌন বাসনার নগ্ন প্রকাশ এ সবই কাল্‌চারের বিরোধী ব্যাপার, যার আজ নাম দেওয়া হয়েছে অপসংস্কৃতি। নামটি যদিচ বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে স্ববিরোধী—অপকৃতি বা অবকৃতি বা দুষ্কৃতি এরকম কিছু হলেই ঠিক হতো,

'অপসংস্কৃতি' আজ প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃতি শব্দের সব থেকে সংকীর্ণ অর্থ দেখি 'ফাংশান'-উন্মাদ অর্ধ-শিক্ষিত তরুণদের ধারণায়। শহরে গঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় প্যাণ্ডেল বেঁধে মাইক লাগিয়ে নাচগানের আয়োজন করা আর ঐ নাচগানকেই সংস্কৃতি মনে করা এদের মজ্জাগত। তাই এদের স্বচ্ছন্দে বলতে শোনা যায়—এতক্ষণ আপনারা সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহোদয়ের ভাষণ শুনলেন, এইবার আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতির ধারণা কালে কালে অল্পবিস্তর পরিবর্তনশীল। প্রাচীনের গ্রীক-রোমক সংস্কৃতি এবং তারই অনুদানে গঠিত আধুনিক য়ুরোপীয় সংস্কৃতি একই জাতের নয়। আবার দেশভেদেও সংস্কৃতির রূপভেদ অনিবার্য। নেপোলিয়নের আক্রমণের পূর্বে রুশ নোব্‌ল পরিবারে ফরাসী সংস্কৃতির উপর যে দুর্নিবার মোহ ছিল তা কেটে গেল মস্কো-দাহের পর। অর্থনীতির দিক থেকে ইংরেজের সঙ্গে মার্কিনের যতই গলাগলি থাক মার্কিনী জীবনদৃষ্টি ইংরেজকে সমগ্রভাবে মোহাবিষ্ট করতে পারেনি। বাংলায় কোম্পানির আমলের জমিদার-বাবু-কাল্‌চার কোথায় উড়ে গেল ব্রাহ্মধর্ম এবং নব্য হিন্দুধর্মের আন্দোলনে ও নূতনতর শিক্ষা ও সাহিত্যের পত্তনে। আজকের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বহু ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মিলিত ফল। ব্রাহ্মণ্য যুগে যে জীবনধারা প্রচলিত ছিল বৌদ্ধেরা তা অস্বীকার করলেন, ব্রাহ্মণ্য ডিক্‌টেটরশিপের উপর লোকায়ত সামাজিক মতের প্রভাব পড়ল। পরের অধ্যায়ে প্রচণ্ড বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ ক্ষত্রিয় শক্তির জন্মলাভে নব্য হিন্দুধর্ম—দেবপূজা দেবভক্তি এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যে শিল্পে উন্নত মানের অভ্যুদয় ঘটল। গুপ্তযুগের কাল্‌চার যার নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি, তা ক্ষত্রিয় রাজন্য-অনুকূল ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ মিশ্র উন্নত হিন্দুর কাল্‌চার। এই সময়কার সাহিত্যে শিল্পে ধর্ম অর্থ কামের, বস্তু ও ভাবের, দেহ ও মনের সামঞ্জস্য দেখানোর প্রয়াস। গুপ্তযুগের অন্তে সুস্থতা ও সামঞ্জস্যের বিনষ্টি, তান্ত্রিক ধর্মের প্রসার, মুসলিম আক্রমণ, সুফী ধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের বিমিশ্রণ, জাতিবর্ণভেদ, প্রেমমূলক ভক্তিধর্মের আবির্ভাব, নিম্ন-বর্ণের ও লাঞ্ছিত পতিত মানুষের ভাবগত মানবমহিমা স্বীকার। এই সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেমন সমাজ তেমনি সংস্কৃতিও পরিচালিত হয়েছে। সর্বোপরি কৃষি-প্রধান গ্রামীণ সমাজ জীবনের উদ্দামতাহীন স্থির সংস্কারগুলিও সাধারণ ভারতীয়ের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করেছে। পরিশেষে একালের সব থেকে উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন এসেছে পশ্চিমের সংস্রবে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের গ্রাম ও শহরের দুস্তর ব্যবধান ঘটিয়ে, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে যা

আপনাকে প্রকাশ করছে এবং আংশিকভাবে ভোগপ্রমত্ত ধনিক তন্ত্রের প্রতিপত্তি অনিবার্য করে তুলেছে। সংস্কৃতি বিষয়ে এই পরিবর্তনের তত্ত্ব বিশেষভাবে স্মরণ করে তবেই আজকের আমাদের সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, রুচি ও প্রকাশধর্মের অন্যান্য দিক সম্পর্কে মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হতে হবে। অর্থাৎ আজকের সমাজ, বাস্তবজ্ঞানের বিস্তার, আজকের শিক্ষিত পরিশীলিত বুদ্ধি ও রুচির মাপকাঠিতেই আজকের দিনের সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির সীমা নির্ণয় করতে হবে। ভিন্ন দেশের অথবা স্বদেশের প্রাচীন কি মধ্যযুগের সৃষ্টি-প্রকাশকে প্রমাণ ধরে নয়। সাম্প্রতিক কোনো কোনো সাহিত্যিকের কদর্যরুচির প্রসঙ্গে আত্মপক্ষসমর্থনে লেখকরা ঐরকম মধ্যযুগ ও প্রাচীনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই একথা বলতে হলো।

আমরা সাম্প্রতিক কালের ধারণার মানদণ্ডেই সাম্প্রতিক সাহিত্য সংগীত-শিল্পকলার সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের প্রসঙ্গ তুলেছি। এবং সেই সঙ্গে সর্বযুগের শিক্ষিত উঁচু সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের বিষয়ই বোধ হয় আলোচনা করেছি। এর অর্থ এই নয় যে, নিম্নবর্ণের ও অশিক্ষিত নির্বিত্ত সাধারণ জনের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির দিক এতই নগণ্য যে সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির পরিমাপে তাদের বিষয় অপ্রাসঙ্গিক। ঠিক তা নয়। এই শ্রেণীর মানুষের আত্মপ্রকাশে ভাষার দৈন্য যদিচ আছে, অপসংস্কৃতির, কদর্যতার পরিচয় নেই বললেই চলে। এরকম হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ হলো এদের আলস্য-বিলাসের অবকাশহীন কঠিন কর্মের জীবন। অলৌকিক এবং ধর্মীয় সংস্কার-কুসংস্কারে চালিত হলেও তারই দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত এদের গ্রাম্য ও কৌমসমাজ, যার মধ্যে যথেচ্ছাচারের অবকাশ খুবই স্বল্প। আমরা যাকে অপসংস্কৃতি বলছি—শিল্পে সংগীতে কদর্য যৌনাচারের চিত্রণ, সামাজিক আচরণে উচ্ছৃঙ্খলতা, কুৎসিত ভাষণ, দেহাসক্তি—তা এদের চিত্রে, সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য বললেও চলে। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কের ও প্রচারের মোহে আমরা এদের জীবন নিয়ে দেহরাগের ইঙ্গিতপূর্ণ যে সব গান ও গল্প রচনা করেছি, তা এদের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে ভুল চিত্র ও আমাদেরই বিকৃত চরিত্রের পরিচায়ক হয়েছে। বস্তুতঃ অর্থ, প্রতিপত্তি, উদ্দাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গেই কুরুচির ও কদর্যতার বিশেষ সম্পর্ক। সামন্ততন্ত্রের যুগে যেমন স্থূলরুচির প্রকাশে কবি-শিল্পীরা উৎসাহিত হয়েছেন, তেমনি আধুনিক বুর্জোয়া রীতির শিক্ষায় অভ্যস্ত নাগরিক কবি-চিত্রীরা উৎসাহিত হচ্ছেন বিকৃত রুচির অনুশীলনে। পর্নোগ্রাফি প্রচারেও এই শ্রেণীর উৎসাহ ও মদত দান স্বাভাবিক ব্যাপার। অলিখিত উদ্দেশ্য হলো তরুণ সমাজকে আদিরসে ডুবিয়ে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি ও

সামাজিক কর্মপ্রবণতাকে পঙ্গু করে দেওয়া—ঠিক যে অর্থে মিলে-কলে ঠাকুর-দেবতা হরিসংকীর্তন প্রভৃতির আয়োজন। সুখের বিষয়, শ্রেণীস্বার্থবুদ্ধি শিক্ষিত সমাজের উদ্দেশ্যমূলক বা সহজাত এই রুচিবিকার কৃষিকর্মাধীন পল্লীসমাজকে বা শহরঘেঁষা মেহনতী মানুষকে আজও গ্রাস করতে পারেনি। অথচ এমনও দেখা যায় যে আধুনিক গল্পকারদের কেউ কেউ গ্রামীণ এমন কি অরণ্যচারী নিম্নশ্রেণীর বা কৌমসমাজের নরনারীদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখছেন এবং প্রায়শঃই এদের নারীদের অবৈধ যৌনাসক্তি এবং সহজেই সতীত্ব ত্যাগের ছবি বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গেই আঁকছেন। এইসব কদর্যরুচির সাহিত্যিকদের কল্পনায় নিম্নবর্ণের বা উপজাতির নরনারী প্রায়শঃই যৌনরোগগ্রস্ত। মদ খাওয়া এদের অভ্যস্ত এবং উৎসবের মেলায় বাবুশ্রেণীর পুরুষের ইঙ্গিতে শাল-মহুয়ার ঘনায়মান অন্ধকারে এরা কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করে। বলা বাহুল্য, এ দৃষ্টিকোণ না বৈজ্ঞানিক, না বাস্তব সমাজ অধ্যয়নের ফল। শহরের পাশে, মিলে-কলে দরিদ্র শ্রমজীবী নারী উদরান্নের সংস্থানের জন্য কী করতে বাধ্য হচ্ছে সেই বিশিষ্ট নিদর্শন দিয়ে এই শ্রেণীর সমাজের মূল্যায়ন করার মত গুরুতর অন্যায় আর নেই। প্রায় নগ্ন ও আদিম আরণ্যকদের শিল্প-সংগীতের যেটুকু পরিচয় আমরা আজ পাচ্ছি তাতে দেখা যায় যে ধর্ম, শত্রুজয়, দেশপ্রেম, বিরহবেদনাবোধ প্রভৃতিই তাদের মানসিক অভিপ্রেত বিষয়, কামকলা নয়। সাঁওতালি ভাষায় অভিজ্ঞ আমার এক বন্ধু বলছিলেন, ওদের ভাষায় এবং আচরণে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে, বরং শিষ্টাচারসম্মত সংলাপের এমন রীতি রয়েছে যা বাংলাতেও নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি অনুজ্ঞা বোঝাতে 'মে' অব্যয়ের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। আদিম উপজাতিদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রা সভ্য মানুষেরও অনুকরণযোগ্য। তাদের ধর্ম ও জীবননীতি নিত্যসম্পর্কে আবদ্ধ থাকায় উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ স্বাভাবিকভাবেই নেই। ফলে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী-জীবনে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে নারীর সংসর্গ দেখা গেলেও তা হলো তাদের সমাজশাসিত প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল পরিব্যাপ্ত করে যেসব আদি মানবগোষ্ঠীর বাস রয়েছে তাদের জীবনধারার পরিচয় ক্যাপ্টেন কুক্ প্রমুখ অভিযাত্রীরা আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁদের বর্ণনা থেকে বিভিন্ন শাখার আদিম মানুষের সমাজবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সহনশীলতা এবং সংগীত-নৃত্যে আগ্রহের পরিচয়ই পাওয়া যায়। যে-স্পেনীয়রা সোনার লোভে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় নারকীয় হত্যালীলা ও নারীধর্ষণ সহ প্রাচীন সভ্যতার বিনাশ ঘটিয়েছিল, তারাও সেখানকার সমাজে যৌনাচারমূলক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখেনি।

আধুনিক অধ্যায়ে দ্বীপবাসীদের মধ্যে লোভ, চুরি, প্রবঞ্চনা, নারীর ভ্রষ্টাচরণ ও যৌনরোগ বিস্তারের জন্য ঔপনিবেশিকরা দায়ী। ফলতঃ আমরা মনে করি, বাংলা গল্পকথায় ও ছায়াছবির পটে নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীদের জীবন বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এতে লেখকদেরই বিকৃত চরিত্র ও পর্নোগ্রাফিক মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এরকম লেখনী শাসিত হওয়ার প্রয়োজন।

ঠিক এই ধরনের, অশিক্ষিত মূক সমাজের নারীদের নিয়ে যৌনলালসার গ্রন্থন মধ্যযুগের সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যেও একসময় দেখা গিয়েছিল। গাথা-সপ্তশতী, অমরুশতক, আর্যাসপ্তশতী এবং কাব্যকোষগ্রন্থগুলিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এসব কাব্য-কবিতার লেখক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়। যে-সমাজের নারীদের ভ্রষ্টতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা কৃষক, গোপ, মালাকর প্রভৃতি। এরকম কাল্পনিক ব্যভিচারের সপ্রশংস রস উপভোগ যাঁরা করে এসেছেন তাঁরা তখনকার শিক্ষিত, উচ্চবর্ণ ও বিত্তবান্। জীবনের অন্য সমস্ত ভাবের দিক লঙ্ঘন করে মধ্যযুগে শৃঙ্গার বর্ণনার যে প্রাচুর্য দেখা যায়, তারও কারণ শিক্ষা-সাহিত্যে উক্ত শ্রেণীবিশেষের অধিকার। গুপ্তযুগের পূর্বে প্রমত্ত শৃঙ্গারের তেমন প্রসার নেই। গুপ্তযুগের ঠিক প্রথম দিকে ক্ষত্রিয়-বৌদ্ধ মিলনের ভূমিতেও নেই। প্রারব্ধ হয়েছে এর পর থেকেই। ব্রাহ্মণ্য যখন থেকে ক্ষত্রিয় রাজন্যের পদাশ্রিত হল তখন থেকে। মহাকবি ছিলেন বলে কালিদাসের উন্নত ভাবাদর্শ গ্রন্থনের মধ্যে ইতস্ততঃ সম্ভোগ শৃঙ্গারের বর্ণন উৎকট হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু পরবর্তী অসংখ্য ক্ষুদ্র কবির মধ্যে তা হয়েছে। এর উপর তান্ত্রিক ধর্মের প্রসারে দেবতা ও মানুষের মিথুন মূর্তির চিত্রণ ও বিবরণ সামন্তপদানত শিক্ষিত সমাজের খুবই উপভোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁরা যাঁকে দেবদেবী বলে পূজো করেছেন, তাঁদেরও বন্দনা লিখতে স্বভাবতঃই কামুকতা এসে পড়েছে। দেবীদের শৃঙ্গার-মুকুলিত নয়ন, উচ্ছ্রিত বক্ষ, মেখলা ও মধ্যদেশের বর্ণনায় লেখনী হয়েছে উদ্দাম। এই 'ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাডিশন'কে সঙ্গী করতে বাধ্য হয়েছে পরবর্তী প্রেমমূলক ভক্তিধর্মও। অথচ দেখা যায়, বাংলা মঙ্গলকাব্যের গ্রন্থনে অশ্লীলতার অবকাশ খুবই স্বল্প। লোকমূল থেকে উদ্ভূত বলেই কি এরকম পার্থক্য? প্রচলিত মঙ্গলকাব্য শুনিয়ে রাজসভাকে পরিতুষ্ট করা যাচ্ছে না বলেই কবিশেখর কবিরঞ্জন ও ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অন্তর্নিবিষ্ট করলেন, রায়গুণাকর সকলের উপর টেক্কা দিলেন দিবাবিহার ও বিপরীতবিহার বর্ণনা করে। আবার দেখা যায়, সামন্ত-সভার প্রভাবপুষ্ট নয় এমন লোক-সংগীতে একই কালে যৌনতা ও আদিম স্পর্শ নেই বললেই চলে।

কিন্তু মধ্যযুগের দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের দাঁড়াতে হবে এ কালকে নিয়ে। আমাদের রুচি ও জীবনবিষয়ক দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হয়ে আজ যে ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে তারই নিরিখে আজকের এবং আগামী কালের সাহিত্য ও শিল্পের মূল্যায়ন করতে হবে। সুরুচি ও শিষ্টাচারসম্মত আত্ম-প্রকাশ আমাদের আধুনিক সমাজবুদ্ধির সহগামী ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবনে একান্ত গোপনে আমরা যা-খুশি আচরণ করতে পারি, পাঁচজনের সঙ্গে যেখানে সংস্রব সেখানে পারি না, আদিম কাল থেকেই পারি না। শিল্প-সাহিত্যে প্রকাশের আধার ব্যক্তি, কিন্তু প্রকাশের লক্ষ্য যে সমাজ তাতে তো আর দ্বিমত নেই। তা ছাড়া দেখতে হবে, নিরাবরণ বস্তু বা ঘটনার বর্ণনাই সাহিত্য নয়। সাহিত্য কৌশলে উপস্থাপিত বাস্তব, আভাসে বর্ণিত বাস্তব। ঐ কৌশলটাই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের কারণ, কৌশল না থাকলে শিল্পসাহিত্যের কিছুই থাকে না, প্রয়োজনও থাকে না। বস্তুজগতে তেমন কোনো রহস্য নেই, সবই আমাদের জানা। জানার উপর অজানা অভিনবত্বের কল্পনা গ্রথিত করতে হয় নতুবা তার সাহিত্যিক মূল্য নগণ্য হয়ে যায়। বাস্তব আমরা নিঃসন্দেহে চাইব, কিন্তু সাহিত্যিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে পড়ে এমন ক্ষুদ্র বাস্তব চাইব না। অথচ দেখা যায়, আজকের মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সাহিত্যিকেরা তুচ্ছ বিষয়েরও অতি খুচরো বর্ণনায় গল্পের সৌন্দর্য নষ্ট করছেন। নায়িকা কিভাবে মুখ ধুলেন, মুখ ধুয়ে টুথব্রাসটা রেখে কী কী নিয়ে কিভাবে বাথরুমে প্রবেশ করলেন, ফিরে এসে কী কী করলেন, উনুনে হাঁড়িটা ধপ করে চড়িয়ে দিয়ে বাজারের বস্তু নিয়ে কী কী বলতে লাগলেন, এই সব বিরক্তিকর বাস্তবে এবং ততোধিক বিরক্তিকর সংলাপে লেখক পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলছেন। এর উপর গল্প-উপন্যাসের যা প্রধানতম বর্ণনীয় বিষয় অর্থাৎ প্রণয় তার বিবরণ তো আছেই।

কিন্তু যাবতীয় সমস্যা এখানেই। লেখক কতটুকু বলবেন এবং কোন্‌খানে থামবেন বা ব্যঞ্জনায় বুঝিয়ে দেবেন। প্রণয়ের সঙ্গে যেহেতু যৌনতার সম্পর্ক অনিবার্য সত্য, আর পরিস্থিতির পার্থক্য ও ব্যক্তিস্বভাব নিয়ে মানুষের মনের জটিলতা অপরিমেয়, সেইহেতু এবিষয়ে পূর্বাহ্নে কোনো নীতিনির্দেশ সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলা যায় যে যা অনিবার্য তা বলতে হবে। যা অতিরিক্ত তা ছাড়তে হবে, নইলে সাহিত্যিক সৌন্দর্য নষ্ট হবে। সাহিত্যকে রক্ষা করতে গিয়েই অতিরেক বর্জন করতে হবে। যৌনক্ষুধা একটি বাস্তব জিনিস, তা অবশ্য প্রদর্শনীয়, কিন্তু এর খুচরো বর্ণনা তেমনি দুঃসহ, তার কারণ, জৈব স্থূলতা সকলেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়—শৌচাদি বিক্রিয়ার মত—এতে

নূতনত্ব কিছুই নেই। এর বর্ণনা পর্নোগ্রাফিতে মাত্র পাওয়া যায়। বিষয়টি লেখক অবশ্যই গ্রথিত করবেন, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে নয়। এ বিধি সাহিত্যেরই বিধি, নীতির নয়। যদি বলা যায়, যেমন একসময় বলা হয়েছিল, যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বৈজ্ঞানিক সত্যকে তো স্থান দিতেই হবে, তখনও ঐ একই জবাব দিতে হয় যে তা অবশ্যই দিতে হবে, সবই বলতে হবে, কিন্তু দু-একটি বিষয় বলার পর বাকি আভাসে ব্যঞ্জনায় রাখাই বিধেয়। তা ছাড়া সাহিত্য তো বিজ্ঞানের কারখানা নয়। আর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকও তো অসংখ্য, তার মধ্যে একটাকেই বা বেছে নিচ্ছি কেন।

সে যাই হোক, মনের জগতের যা বৈজ্ঞানিক সত্য তা-ই সাহিত্যিক সত্য, কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে সেই লেখকই শক্তিমান যিনি রুক্তিমতার পরিচয় দিয়েই পরমুহূর্তে অপরিমেয় মনের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হন। কবি ভারতচন্দ্র দিবাবিহার ও বিপরীতবিহারের বর্ণনা দিয়েছেন। এতে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আকর্ষণ কিছুমাত্র বাড়েনি। কারণ, এতে নূতনত্ব কিছুই নেই। অপরপক্ষে তিনি যেখানে ছদ্মবেশধারী সুন্দরকে বিদ্যার সঙ্গে রম্য বিতর্কে প্রবৃত্ত করেছেন, অথবা হীরামালিনীর সঙ্গে সুন্দরের রঙ্গরস বর্ণনা করছেন, সে সব স্থানের উপরেই কাব্যরসিকদের লোভ। বৈষ্ণব পদাবলীতে সম্ভোগ-শৃঙ্গার বর্ণনায় যৌন আচরণের ছবি ফুটেছে, এমন কি জয়দেব খোলাখুলিভাবেই বলেছেন,—ঘটয় জঘনপিধানম্, কিন্তু এর ধর্মীয় আবরণ রয়েছে, যেমন রয়েছে তান্ত্রিকতার, তা ছাড়া পূর্বেই বলেছি যে ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাডিশন্-এর অনুসরণও এর একটা কারণ।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যিক রুচি যে বিশেষভাবে ইংরেজি সাহিত্য থেকে, অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়র, স্কট, ডিকেন্স, শেলি-কীটস্, কার্লাইল-রাস্কিনের ধারায় পুষ্ট এ অস্বীকার করে লাভ নেই। এই রুচিতে মধ্যযুগের খিস্তি-খেউড়, কথায় কথায় 'বদ্‌জোবান', নারীর অমর্যাদাকর স্তন এবং নিতম্বের বর্ণনা প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। এর উপর বিশ শতকে সাম্প্রতিক পাশ্চাত্ত্যের বাস্তব বুদ্ধির কিছু কিছু অনুরঞ্জন এসেছে। শিক্ষিত মহলে উনিশ শতকে এমন কি বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে ধরনের শিল্পরুচি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আকস্মিকভাবে তার পরিবর্তন করার প্রয়াস করা হয় তৃতীয় দশক থেকে এবং এর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের সময় থেকে। কিন্তু পরিবর্তন দ্বিধাবিভক্ত হলো। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক নিযুক্ত রইলেন অবহেলিত দরিদ্র মানুষের জীবন-সমস্যার সোজাসুজি বর্ণনায়, অন্য শ্রেণী ব্যক্তি মানুষের প্রকট ও অবদমিত

যৌন-পিপাসাকেই বিশেষভাবে তাঁদের গল্পকাহিনীর সঙ্গী করলেন। এই সূত্রে দেখা দিল যৌনতার চিত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাবের উপর দণ্ডায়মান ও সুবিধা-আয়ত্তকারী কতিপয় লেখক নগ্ন যৌনতারই পথিক হলেন। একই সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চারঅধিকারের আড়ালে পরপর কয়েকটি এমন ধরনের কামতান্ত্রিক পত্রিকা শারদীয় বিশেষ সংখ্যা সমেত প্রকাশিত হতে লাগল, যেগুলির লক্ষ্য হল তরুণ-তরুণীকে পথভ্রষ্ট আদর্শভ্রষ্ট সংগ্রামবিমুখ করে সমস্ত দেশটাকে পঙ্গু করে নিজ স্বার্থ কায়েম রাখা। কিন্তু কেবল ঐ সব কদর্য পত্রিকাই নয়, সভ্য সমাজে চালু কয়েকটি সাময়িক পত্রও এর সঙ্গে যোগ দিতে লাগল, অবশ্য মাঝে মাঝে, সন্তর্পণে। পঞ্চাশ বছর আগেকার এবং বিশেষ উনিশ শতকের পরিস্থিতির সঙ্গে কী গুরুতর পার্থক্য। পিছন ফিরে তাকালে কী দেখা যায়? বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের কাহিনী বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও 'আদি'র আদ্যশ্রাদ্ধ করতে নিতান্ত সংকুচিত হয়েছিলেন। রঙ্গলাল রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্রের পূর্ণ অনুসরণ করতে চাইলেন না। বঙ্কিম উপন্যাসগত বাস্তবের দাবিতে অধর স্পর্শ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন, এবং যৌনকামনার আভাস মাত্র দিয়ে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য পরিস্ফুট করলেন। তখনকার বাস্তব বাংলা সাহিত্যের দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। যৌনতাবিলাসের প্রচুর অবকাশ থাকলেও সংযমেই সৌন্দর্য ফুটেছে, অথচ সবই দেখানো হয়েছে। একটি হল সীতারাম উপন্যাসে বর্ণিত জয়ন্তীকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাতের উদ্যোগপর্ব। আর একটি নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণির উপর রোগ সাহেবের বলাৎকার দৃশ্য। আধুনিক লেখক এরকম সুযোগে দৈহিক বিকারাদির বর্ণনার লোভ সংবরণ করতেন কিনা সন্দেহ। জলতল থেকে উদ্ধৃতা রোহিণীর বর্ণনায় লেখকের সংযম দেখুন। আবার প্রসাদপুরে যেখানে রোহিণী গোবিন্দলাল একক, সেখানে দেহক্ষুধার কোনো বিবরণই নেই। রোহিণীগত রূপক্ষুধার সিনেমা-সংস্করণটা একবার স্মরণ করা যেতে পারে। নির্বাক ছায়াছবিতে পেসেন্স কুপার ও দুর্গাদাস অভিনয় করেছেন। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে রোহিণী (অর্থাৎ কুপার) অন্তর্বাস ত্যাগের উদ্‌যোগ করছে। পর্দায় দেখানো হচ্ছে পা থেকে উপরের দিকে সায়া তোলা হচ্ছে। হাঁটুর বেশ একটু উপরে উঠিয়ে থেমে যাওয়ায় দর্শকবৃন্দ থেকে চিৎকার উঠল—সেণ্টার, সেণ্টার। এ খুবই স্বাভাবিক। রূপালি পর্দায় এই সোনালি অভিযানের লোভ দর্শকেরা কেনই বা সংবরণ করবেন। অর্থের লোভ সিনেমার মালিক ও প্রযোজকদের অশোভন রঙের খেলায় কিভাবে প্রবৃত্ত করে আজও তার দৃষ্টান্ত প্রচুর। শিল্প-সৌন্দর্যের নামের আড়ালে বেশ্যালয়-বিহিত নৃত্যাদির উৎসার আগের দিনের থেকে আজ আরও বেশি।

আধুনিক বাঙালী লেখকদের যে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ ঐতিহ্যের অনুগামী হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু বিকৃত রুচির উদ্দাম পরিবেশনে বিচ্ছিন্নতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখকেরা দেশ ও সমাজের প্রগতি অবরুদ্ধ করবেন এমনটাও তো কাম্য হতে পারে না। পশ্চিমা কতিপয় ইজম্-এর দোহাই দিয়ে কবিতায় —নাভিচক্রের নিম্নে আগামী সন্তানের কলহাস্যের বর্ণনা দেবেন, অথবা একেবারে কুৎসিত ভাষায় বলবেন—স্রষ্টার ঔরসে সৃষ্টির যোনিপথ পিচ্ছিল—এ কতদিন সহ্য করবে সমাজ ও রাষ্ট্র? কিন্তু আমরা মনে করি না যে সাম্প্রতিক লেখকেরা সবাই দুর্বল ও কদর্যতায় আগ্রহী। অন্ততঃ আজকের বাংলা গল্প-উপন্যাসে মৌলিক ও উন্নত কল্পনার ও বাস্তবদর্শনশক্তির ভালো নিদর্শন রয়েছে। তাহলে কি এমন কথা বলা যাবে যে সিনেমার মত এখানেও মালিকগোষ্ঠীর ফরমায়েশ তাঁরা পালন করছেন ও করবেন, অথবা অলিখিত ভিন্নতর চক্রান্তও এসবের পিছনে কার্যকর।

অপসংস্কৃতির স্বরূপ

সরোজমোহন মিত্র

'অপসংস্কৃতি' কথাটা সাম্প্রতিককালে প্রচলিত। এখনো অভিধানের পাতায় ওঠেনি। অথচ এ নিয়ে বর্তমানে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। 'সংস্কৃতি' কথাটা আমরা জানতাম। 'অপ' উপসর্গ তাতে যুক্ত হয়ে একটা নতুন অর্থ দ্যোতিত করছে। 'অপ' উপসর্গ নিন্দা, বিরোধ, স্থানান্তর, অপলাপ, বর্জন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব অপসংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি সংস্কৃতির বিকৃতি। সংস্কৃতির অপলাপ ইত্যাদি।

আর সংস্কৃতি ইংরেজী Culture কথাটার প্রতিশব্দ। কালচার বলতে ষোড়শ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বোঝাত Improvement or refinement by education and training অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা উন্নতি বা সংস্কার। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এর অর্থ আরও ব্যাপক হল, তখন বোঝাত The training and refinement of mind, tastes and manners ; the condition of being thus trained and refined ; the intellectual side of civilization. অর্থাৎ মন, রুচি এবং আচরণের শিক্ষা এবং সংস্কার ; মার্জিত এবং সংস্কৃত অবস্থা, সংক্ষেপে সভ্যতার মানসিক দিকটাকেই বলা হত কালচার। উনিশ শতকের শেষদিকে কালচার এবং সভ্যতা সমার্থক হয়ে পড়েছে।

কালচারের অনুসরণে বাংলায় 'সংস্কৃতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পকলা রুচিনীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ। অনেক সময় 'সংস্কৃতি'র অর্থ 'কৃষ্টি'কেও বুঝি। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উভয় শব্দ সমান অর্থ বা ব্যঞ্জনাবহ নয়। কৃষ্টির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক 'কৃতি'র। কৃতির মধ্যে গতিবেগটাই প্রধান। তা আমাদের ক্রমশ এগিয়ে দেয় কিন্তু সংস্কৃতি বলতেই যেন আমাদের মনের আকাশে ফুল ফোটে, ফসল ফলে। অবশ্য এর মধ্যেও 'কৃতি' প্রধান। তবে তার সঙ্গে সংস্কারও এসে পড়ে। আর সংস্কার বলতেই তার মধ্যে থাকে পরিমার্জনা, অনুশীলন, মাজা-ঘষা, প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্জন এবং পরিবর্ধন।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সংস্কৃতি বা মানসিক পরিমার্জনার তিনটি জিনিসকে প্রধান সত্য বলে মানতে হয়। "প্রথম হল মনের স্বাধীনতা (ফ্রিডম অব মাইণ্ড), দ্বিতীয় হল বিশ্বমানবতা (ইউনিভার্সালিজ্‌ম), তৃতীয় হল

শালীনতা (আর্বানিটি)।" আর্বানিটি বলতে অনেক কথা বোঝায়, এটা কেবল নাগরিকতা বা বৈদগ্ধ্য নয়, এটা ভদ্রতা, শিষ্টাচার, শালীনতা, ভব্যতা, প্রভৃতি।

এখানে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। মনের মুক্তি বলতে কি বোঝায়? মনের স্বাধীনতা, বুদ্ধির মুক্তি, বুদ্ধিবিলাস না কল্পনাবিলাস? মনের মুক্তি বলতে সাধারণত চিন্তার স্বাধীনতা, দৃষ্টিশক্তির স্বাধীনতা বোঝায়। এখানেও বিতর্ক দেখা দিতে পারে। মন বা চিন্তা বলতে কী বুঝি? তারও আবার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের উপর অর্থভেদ হতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গী দ্বিধাবিভক্ত। ভাববাদী এবং বস্তুবাদী। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী মন বলে একটা পৃথক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। মানুষের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও দেহ থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র। সেজন্য বহু প্রচীনকাল থেকেই বলা হয় দেহ নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। মানুষের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু নেই। তা নবরূপ পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধরা বলেন, বুদ্ধদেব সাড়ে পাঁচশ বার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব তাঁর সাড়ে পাঁচশ জাতকের কাহিনী আছে। এখানে মন এবং আত্মা দুটোকে একার্থ বলে গণ্য করা হয়। সেজন্য আদিম অধিবাসীরা মনে করত আত্মা বা spirit একটা পৃথক যন্ত্র। তা যে কোন সময় মানুষের দেহ থেকে বেরিয়ে এসে এক পৃথক অস্তিত্বের নেতৃত্ব দিতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে মন বা আত্মার এই পৃথক অস্তিত্ব হাস্যকর। বস্তুবাদীরা সেজন্য ভাববাদী এই দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন জীবনের বিকশমান উন্নতির প্রকাশের নামই মন। বস্তু সংগঠনের একটি উচ্চ পর্যায়। তাঁরা অবশ্যই মন, চিন্তা, ইচ্ছা, চেতনা, অনুভব প্রভৃতিকে বাস্তব বলেই মনে করেন। তবে তাঁরা দেহ থেকে তার পৃথক অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না। আমরাও মন বলতে সাধারণত চিন্তাশক্তি বুঝি। যখন বলি "তোমার মনে কি আছে?" তার অর্থ তুমি কি চিন্তা করছ? স্টালিন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেছেন, মস্তিষ্কের উচ্চ পর্যায়ের সার্থকতাকেই বলে চিন্তা এবং তা বস্তুরই প্রকাশ। আর মস্তিষ্ক হল চিন্তারই একটা জীবাঙ্গ। অতএব চিন্তাকে কখনো বস্তু থেকে পৃথক করা যায় না। ("Thought is a product of matter which in its development has reached a high degree of perfection, namely, of the brain, and the brain is the organ of thought. Therefore one cannot separate thought from matter."—Dialetical and Historical Materialism).

অতএব মন, চিন্তা, আদর্শ স্বয়ম্ভু নয়। বাস্তব পৃথিবীরই একটা প্রতিফলন।

মানবমনে বস্তুগত পৃথিবীরই প্রতিফলন দেখা যায়। পরিবেশ, সমাজ তার গঠনে যেমন সাহায্য করে তেমনি তার মধ্য দিয়েই আবার প্রতিফলিত হয়। আমাদের চেতনা বহির্জগতেরই প্রতিমূর্তি। বহির্জগতে নেই এমন কিছু চেতনায় প্রতিমূর্ত হতে পারে না। বরং মনে বা চেতনায় নেই এমন অনেক জিনিস বস্তুজগতে বিরাজ করে। অনুভব ক্ষমতার উপরেই মন বা চিন্তা নির্ভরশীল। অনুভব ক্ষমতার উন্নতি নির্ভর করে বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্কের উপরে।

মনের স্বাধীনতা বলতে সাধারণত বোঝায় আমরা যখন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারি। স্বাধীনতা কেবল স্বপ্নে সম্ভব নয়। আমাদের ইচ্ছা বিভিন্ন বহিঃশক্তির দ্বারা নির্ণীত হয় যার উপরে আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। সেখানে আমাদের অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। অতএব কোন বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকেই মনের স্বাধীনতা বলে। জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োগের আবার নিবিড় সম্পর্ক। প্রয়োগ ভিন্ন জ্ঞান অর্থহীন। প্রয়োগের ক্ষেত্র কিন্তু নানা বাধাবন্ধনযুক্ত। অর্থাৎ মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে তার মনের স্বাধীনতাও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তা কখনো বাস্তব বা সমাজনিরপেক্ষ হতে পারে না।

এমনি করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিশ্বমানবতা ব্যাপক অর্থে মানবিকতা-বোধ। যার সঙ্গে মানুষের জীবনসংগ্রামের ওতপ্রোত সম্পর্ক।' 'মানবতা' কথাটা আধুনিককালের সংযোজন নয়। মধ্যযুগ থেকেই এই কথাটা প্রচলিত আছে। এর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে মানবিকতাবোধের আন্দোলনের সঙ্গে 'মানবতা'র ব্যাপক সম্পর্ক। মানবিকতার অর্থই হল মানুষের সম্পর্কে একটু এগিয়ে ভাবনা। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের জীবনসংগ্রামে তা অগ্রগতিরই প্রকাশ। সামন্তযুগে তা ছিল সামন্তবিরোধী। ধনতন্ত্রের যুগে তা সমাজতন্ত্রের পক্ষে। যেখানে উৎপীড়ন, অত্যাচার, শোষণ, সেখানেই মানবতা তার বিরুদ্ধে। মানুষের পক্ষে কথা বলতে গেলেই তা শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলতে হবে। অতএব বিশ্বমানবতা বলতে বিশ্বমানবমুক্তিকেই বোঝায়।

সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 'আর্বানিটি। একে কেবল শিষ্টাচার বা ভব্যতা বললেই সব হয় না। এর মধ্যেও যে কথাটা বড় তা হল পরিমার্জনা, পরিশীলন, সভ্যতার একটা অগ্রগতি।

অতএব সংস্কৃতির গোড়ার কথাই হল সংস্কার, শোধন, পরিষ্করণ, সংক্রিয়া, উৎকর্ষ সাধন, এক কথায় সমাজ সংশোধন। সমাজ যেমন ঐতিহাসিক বিবর্তনে

ক্রমপরিবর্তনশীল, সংস্কৃতিও তেমনি কখনো স্থিতিশীল হতে পারে না, তাও গতিশীল। আসল কথা, সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন।

সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কাব্য, গান, শিল্প, সাহিত্য, নাটক, দর্শন, ধ্যান-ধারণা। আবার কেউ মনে করেন আচার-অনুষ্ঠান, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি। কিন্তু এ সবই আংশিক সত্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় জীবিকা প্রয়াসের সঙ্গে সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক। জীবমাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য আত্মরক্ষা—কোনরকমে টিকে থাকা। মানুষের সংগ্রাম কেবল টিকে থাকার জন্য নয়, ভালভাবে টিকে থাকার জন্য। এই আকাঙ্ক্ষার তো শেষ নেই। সেজন্য তাকে প্রতিনিয়ত যেমন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলতে হয় তেমনি তার মানসিক জগতের, বাস্তব জগতের অপূর্ণতার একটা কাল্পনিক পূর্ণতার জগৎ সৃষ্টি করে সে তার সংগ্রামী মানসিকতাকে সর্বদা সতেজ এবং উৎফুল্ল করে রাখে। তাই মানুষের জীবনসংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি ; জীবিকা প্রয়াসকে সহজায়ত্ত করাই তার মূল ভিত্তি।

সেজন্য সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টিসম্পদও নয়, বাস্তব প্রয়োজনেই তার জন্ম, জীবন-সংগ্রামে তা প্রেরণা জোগায়, জীবন-যাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সেই জীবনযাত্রারই ঘাতপ্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ ও রঙ পরিবর্তিত হয়, সংস্কৃতিও তেমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতিকে গাছের ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ফুলের সঙ্গে যেমন গাছের কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা এবং মূলের গভীর সম্পর্ক তেমনি সংস্কৃতিরও প্রধান আশ্রয় জীবনসংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ বা উৎপাদন সম্পর্ক বা material means, সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা বা social structure। এই হিসেবে সংস্কৃতি হল সমাজের মানস সম্পদ—সমাজসৌধের শিখরচূড়া বা superstructure। একটার সঙ্গে অপরগুলোর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

বাস্তবক্ষেত্রে নতুন নতুন জীবিকার উপকরণ আবিষ্কারের ফলে যেমন জীবন-যাত্রার অগ্রগমন ঘটে তেমনি তার ফলে সমাজসম্পর্ক পরিবর্তিত হয়, উন্নত হয়, আর তার ফলে মানসিক ক্ষেত্রে নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। আবার মানসিক ক্ষেত্রে নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টি বাস্তব ক্ষেত্রে জীবিকার নতুনতর উপকরণ আবিষ্কারে ও নতুনতর বাস্তব দৃষ্টিতে মানুষকে প্রবুদ্ধ

করে, তার সামাজিক জীবনযাত্রাকে সেভাবে বিন্যাস করতে প্রেরণা জোগায়। এভাবে উৎপাদন সম্পর্ক, সমাজ ব্যবস্থা এবং মানসসৃষ্টি সব সময়ই পরস্পর সাহায্যকারী। সক্রিয়ভাবে একে অন্যকে পুষ্ট করে চলেছে। জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ আর মানসিক সম্পদ এই তিনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় প্রতিযুগে সংস্কৃতির সমগ্র রূপ প্রকাশিত।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বাস্তব প্রয়োজনেই উৎপাদন শক্তির পরিবর্তন ঘটে, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তেমনি সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে। সহজ কথায় বলা যায়, জীবিকার প্রয়াসে মানুষের অগ্রগতির ফলে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন, পরিবর্জন এবং পরিবর্ধন ঘটে।

উৎপাদন শক্তির পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সম্পর্কেরও যে পরিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে মার্কস লিখেছেন, "Social relations are closely bound up with productive forces. In acquiring new productive forces men change their mode of production ; and in changing their mode of production, in changing the way of earning their living, they change all their social relations. The hand-mill gives you society with the feudal lord ; the steam-mill, society with the industrial capitalist."

এভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই উৎপাদন শক্তির উন্নতির ফলেই দাস-ব্যবস্থার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে সামন্ত ব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থার পরিবর্তে পুঁজিবাদ। এভাবে প্রতি পর্যায়েই দেখা যায় সমাজের মধ্যে বিশেষ করে আদিম সমাজ ব্যবস্থার পরে দুটো শ্রেণী গড়ে উঠল। এক শ্রেণী শোষণ এবং শাসন করে এবং অন্য শ্রেণী শোষিত এবং শাসিত হয়। স্বভাবতই দুই শ্রেণীর মধ্যেই থাকে তীব্র স্বার্থসংঘাত। সেজন্য মার্কসবাদ বলে আমাদের সমাজের ইতিহাস বিশেষ করে আদিম সমাজ ব্যবস্থার পরে শ্রেণীসংগ্রামের-ইতিহাস।

শ্রেণীবিভক্ত বা শোষণভিত্তিক সমাজে মানসসম্পদ এবং সংস্কৃতি সব সময়ই শাসক শ্রেণীর মনোভাব এবং স্বার্থই প্রতিফলিত করে। শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে,সেজন্য তারা শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রতিপালিত, সম্মানিত এবং পুরস্কৃত হয়। কিন্তু যখন সমাজের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন বা বিপ্লব আসন্ন হয়ে ওঠে তখন সংস্কৃতির মধ্যে পুরনো সমাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রেণীর মনোভাব বা আদর্শই প্রাধান্য লাভ করে।

দাস ব্যবস্থার সময় যে সংস্কৃতি ছিল সামন্ত যুগে তার বহু পরিবর্তন ঘটে।

আবার সামন্ত যুগের পরে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় তার রূপান্তর ঘটেছে। দাস ব্যবস্থার অবক্ষয়ের যুগে সামন্ত ব্যবস্থাকে যেমন উন্নত অবস্থা বলে মনে হয়েছিল তেমনি ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ব্যবস্থার সময় উঠতি বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে প্রগতিশীল বলেই গণ্য করা হয়। কিন্তু বর্তমানে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে বুর্জোয়া বা ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে, যখন টিকে থাকবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদীরূপে এই ধনতন্ত্রের নগ্ন মুখোস বারে বারে খুলে পড়ছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শই বিপ্লবী মতাদর্শ। সমাজ পরিবর্তনের এই ঐতিহাসিক এবং অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা স্থির প্রত্যয়ে গ্রহণ করতে না পারলে সংস্কৃতির বিকার ঘটতে বাধ্য।

সমাজের শাসক প্রভুরা সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের এই বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার কথা জানেন। সেজন্য তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার একান্ত তাগিদে তাঁদের বিরুদ্ধ শক্তি যাতে সংহত, সুদৃঢ় হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য সুকৌশলে সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে পুরনো আদর্শ এবং নানা উদ্ভট রীতিনীতির প্রচলন করিয়ে দেন। তার ফলে সাময়িকের জন্য তাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন।

এগুলো বিশেষ করে দেখা যায় সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মীয় আচরণে, বেশভূষায়। সাহিত্য শিল্প বলতে এখানে গল্প উপন্যাস নাটক কবিতা সঙ্গীত নৃত্য চিত্রকলা যাত্রা সিনেমা সবগুলোকেই বোঝায়। যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই এটা দেখা গিয়েছে। পুরনো সমাজ ব্যবস্থা যখন ধ্বংসের মুখে তখন শাসক শক্তি তার সজীবতা হারিয়ে ফেলে, নতুনের নাম করে অতি পুরনোকে আবার রঙচঙ করে নতুন করে চালাবার চেষ্টা করে। এই vulgarisation of cultureকেই বর্তমানে 'অপসংস্কৃতি' বলা হচ্ছে।

সংস্কৃতির এই বিকৃতি আজ নানাভাবে আমাদের সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রধান হল 'যৌনতা'। সংস্কৃতির চরম অসভ্যতা (vulgarisation) দেখা দিয়েছে এই ক্ষেত্রে। 'পর্নোগ্রাফি' বলে এক ধরনের অশ্লীল সাহিত্য তারা সুকৌশলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়। যা যত গোপন এবং যা যত নিষিদ্ধ তার প্রতি মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। স্টেশনে বা ফুটপাতের বই এবং পত্র-পত্রিকার দোকানে এগুলো থাকে। ক্রেতা বুঝে দোকানদার এগুলো গোপন স্থান থেকে বের করে এমনভাবে দেখায় যার মধ্যেই একটা মাদকতা থাকে। যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েদের কাছে এর ফল বিষময়। তা ছাড়া সকল প্রকার মানুষের কাছেই এর একটা স্থূল আবেদন আছে।

পর্নোগ্রাফি ছাড়া আর একটা জিনিস ব্যাপকতা লাভ করেছে সেটা হল নগ্নচিত্র বিক্রয়। নানা ধরনের নানা উত্তেজক নগ্নচিত্রের বোঝা বিক্রী করা হয়।

ব্যাপক হলেও এগুলোর মধ্যে এখনো একটা গোপনীয়তা আছে। কিন্তু এগুলোই প্রকাশ্যে ভদ্রবেশে হাজির হয় দামী দামী সাহিত্যিকদের লেখনীপ্রসূত হয়ে বাজারের দামী দামী সব পত্রিকায়। সেগুলোতে যে সব গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয় তার প্রধান কথাই হল যৌনতা। এদের নাম করে পাবলিসিটি বাড়াতে চাই না। একটা গল্পে আছে চার বন্ধু একটা মৃতদেহ সংকারের জন্য নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহটি ছিল একটি যুবতী নারীর। শ্মশানে বসে চার বন্ধু সেই নারীর সঙ্গে কে কিভাবে যৌন আচরণ করেছিল তারই কাহিনী বর্ণনা করেছে। আর একটা উপন্যাসে পড়েছি কোন এক অধ্যাপিকা ইতিহাস কংগ্রেসে যোগ দেন। তার যাওয়ার পথে এবং গন্তব্যস্থলে ইতিহাসের আলোচনা বা ইতিহাস কংগ্রেসের আলোচনা প্রাধান্য পায়নি। পেয়েছে তার যৌন ব্যভিচারের কাহিনী।

এমনি নানা ধরনের কাহিনী। একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা মন্তব্য করলেন এতদিনের ঐতিহ্যবাদী পত্রিকা (নামটা নাই বা করলাম) আজকাল আর সকলের সামনে বাড়িতে রাখা যায় না। তাহলে বাড়িরই রুচির পরিচয় দেয়। এরা প্রথমে শুরু করেছিল বারাঙ্গনা, বারবধূ, রূপোপজীবিনী বা বেশ্যাদের নিয়ে। এদের ছাড়া যেন নায়িকা পাওয়া যাচ্ছিল না। এদের কাহিনীর মধ্যে এই সমাজ-পতিতাদের জন্য একটু lip sympathy বা মৌখিক সহানুভূতি যে নেই তা নয়, তবে তার চেয়েও তাদের জীবনযাত্রা বা যৌনযাত্রাই প্রধান হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও পতিতাদের কাহিনী আছে। কিন্তু সেখানে যৌনতা প্রাধান্য লাভ করেনি। পতিতাদের জীবনকাহিনীর মধ্যে মানবিক দিকটাকেই তিনি প্রধান করে তুলেছেন যাতে পড়তে পড়তে পাঠকের মনে যে সামাজিক কারণে নারীত্বের এই অবমাননা সেই কারণের প্রতিকারের সংকল্পই বড় হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের বিষয়বস্তুর চেয়ে দৃষ্টিভঙ্গীই প্রধান। একাধিক লেখক একই বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন কিন্তু তাঁদের স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তিনজনেই বিধবার প্রেম নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য তিনজনের হাতেই তা অপূর্বতা লাভ করেছে। গল্পে উপন্যাসে বারাঙ্গনা বা বারবধূ থাকাই দূষণীয় নয়। কিন্তু বিচার্য লেখক তাদের কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তাদের মূল বক্তব্য কী।

যৌনতা আরও প্রকটতা লাভ করেছে নাটকে সিনেমায়। বাংলা নাটক স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে এবং তারপরে বিশেষ করে গণনাট্য আন্দোলনের পর থেকে অনেক বেশী জীবন-আশ্রয়ী এবং সংগ্রাম বা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গত পাঁচ-সাত বছরে একে এক ব্যাপক বিকৃতির পঙ্কে নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যবসায়ী নাটকই এই ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। এরা চরিত্রের মধ্যে যৌনতা দেখিয়েই তৃপ্ত হয়নি, একেবারে নগ্ন নারীর নৃত্য বা ক্যাবারে দেখিয়ে প্রচুর অর্থ লুটে নিল।

নাটকের এই রমরমা ব্যবসা দেখে যাত্রাওয়ালারাও যাত্রায় দর্শক পরিবৃত উন্মুক্ত মঞ্চে ক্যাবারে নাচাতে শুরু করলেন। কিন্তু নাটক সাধারণত নাগরিকদের জন্য আর যাত্রা পল্লীবাসীদের। নাগরিকজীবনে যেমন সভ্যতা যথেষ্ট তেমনি এখানে ইতরামিও প্রচুর। এখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেমন প্রবল তেমনি বিকারের প্রাবল্যও কম নয়। পল্লীজীবনে স্ববিরোধিতা কম। তাদের জীবনে যেমন প্রচণ্ড গতিবেগের অভাব তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতাও বেশি চোখে পড়ে না। তারা সংস্কৃতির বিপ্লবী আদর্শকে অনুশীলন করতে না পারলেও সংস্কৃতির বিকারকে তারা সহজে হজম করতে পারে না। তাই পল্লীবাসীদের ঢিল খেয়ে ক্যাবারে দেখানোর সখ টিট হয়ে গিয়েছে।

ক্যাবারের সঙ্গে আছে 'টুইস্ট' এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর বিকৃত নাচ। যা বিদেশ থেকে আমদানী হয়ে কোলকাতার বড় বড় হোটেলে বন্দী হয়েছিল তাকে সযত্নে চালিয়ে দেওয়া হল থিয়েটারে, জলসায়, বিয়েবাড়িতে, বরানুগমন মিছিলে, পুজো প্যাণ্ডেলে, বিসর্জনের শোভাযাত্রায়। বিকৃতিকে জোর করে স্বাভাবিক করা যায় না। সেজন্য ধীরে ধীরে তা অবলুপ্তির পথে।

তারপর যৌনতা এসেছে বেশভূষায়। ড্রেন-পাইপে, বেলবটমে, মিনিতে, ম্যাক্সিতে তা উৎকট। তার সঙ্গে হয়ত সমতাল রাখা হয়েছে ছেলেদের বড় চুল রেখে বরং মেয়েদের চুলে কাঁচি চালিয়ে এবং তার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের প্রথমে জুতোর মুখ সরু করে এবং পরে জুতোর সোল উঁচু করে। এ সবগুলোই অস্বচ্ছন্দ তবু এগুলোই আজকালের ফ্যাসান। ফ্যাসান যুগে যুগে পাল্টায় কিন্তু এই ক'বছরে যেরকম ঘন ঘন পাল্টাতে দেখেছি এমন আর কখনো নয়। সংস্কৃতির একটা প্রধান সত্যই হল আর্বানিটি বা শিষ্টাচার, তার একেবারে মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে।

মজার কথা হল এ সবগুলোই নাকি বিদ্রোহের প্রকাশ। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা পুরনো সব কিছুকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। অতএব

নতুন কিছু করতে হবে। যা কিছু প্রচলিত, যা কিছু এতদিন চলে আসছে, সব কিছুকে অস্বীকার করো।

ভাঙনের এই উত্তেজনায় হয়ত একটা নেশা আছে। অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ প্রবল ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে নিজেরাই ভাঙনের কথা চিৎকার করে বলে। সেজন্য তারা এই ভাঙনের নামে কৌশলে 'নিহিলিজমে'রই প্রচার করে চলে। শুধু ভাঙন, শুধু ধ্বংস কখনো হতে পারে না। ধ্বংসের জন্যই ধ্বংস নয়। নতুন সৃষ্টির জন্যই ধ্বংস। বুর্জোয়ারাই একদিন সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। বর্তমানে তেমনি ধনতন্ত্রের চরম সঙ্কটে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা জোরদার হয়ে উঠেছে। তার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব। এই আদর্শের প্রতি প্রচণ্ড বিশ্বাস নিয়েই সমাজের সর্বস্তরের সংগঠন এবং সংহতিবোধ জোরদার হয়ে উঠছে।

অতএব এই মুহূর্তেই একটা চরম অবিশ্বাসের কথা সুকৌশলে প্রচার করতে হবে। তাহলে পুঁজিবাদের প্রতিকূল শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়বে, এ কাজে সবচেয়ে সহজ পথ হল যৌন-বিদ্রোহ। তাদের মূল কথা হল, 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।' দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং অনুশীলনের ফলে সভ্যতার যে উন্নয়ন ঘটেছে তাকে অস্বীকার করো। কারণ 'এ সভ্যতা কৃত্রিম'। আদিমযুগে ছিল অবারিত যৌনাচার। দীর্ঘ দিনের সাধনা, পরিমার্জনা এবং পরিশীলনের ফলে যে সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা অগ্রাহ্য। ফিরে চলো আদিমযুগে। শুরু হোক মুক্তমেলা। মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত নয়। এ মনোভাব সংস্কৃতি-বিরোধী। কেবলমাত্র জৈবিক প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিলে মানুষ অমানুষে পরিণত হয়। বিকৃত সংস্কৃতি বা প্রচলিত 'অপসংস্কৃতি' মানুষকে অমানুষে, পশুতে পরিণত করারই একটা অপচেষ্টা।

সংস্কৃতির বিকৃতি এসেছে ধর্মীয় আচরণেও। কোলকাতা মহানগরীর বুকে জনবহুল রাস্তার মোড়ে মোড়ে গড়ে উঠেছে শনিপূজার অনুষ্ঠান। শনি, সত্যনারায়ণ, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি পূজো প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় এমনকি মধ্যযুগেও একটা প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রিক কারণে প্রাধান্য লাভ করেছিল। বর্তমানে তার কোনটাই নেই। যেমন মনসা পূজো হত সাপখোপে ভরা জলজঙ্গলে পরিপূর্ণ গ্রাম-বাংলায়। সাপের উপদ্রবে মানুষের অসহায়তাবোধ থেকেই তার উৎপত্তি। আধুনিক যুগে গ্রাম-বাংলার উন্নয়নের ফলে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সেই অসহায়তাবোধ আর নেই। কোলকাতার জীবনে তো মোটেই নেই। কিন্তু এখানেও মনসা পূজো বাঁচিয়ে রাখার অর্থ কি? শনিপূজো অনেক

পরের। তার মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি ধনের ঊর্ধ্বে নিয়তি বা গ্রহের প্রাধান্য কীর্তিত।

ধর্মমোহ আরও বহুগুণিত হল দুর্গাপূজা, কালীপূজা, কার্তিকপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজার মধ্যে। পূজো তো নয়, চাঁদার উৎপীড়ন। নীলামে রসিদ বই বিক্রী হয়। প্রতি রসিদ বই একটা নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রী হয়ে গেল। সেই রসিদ বইতে যদি তার চেয়ে বেশী আদায় হয় তবে তা আদায়কারীর। অর্থ আয়ের একটা সহজ পথ বেরিয়ে গেল। যত বেশী পূজো তত বেশী আয়; অতএব সারা বছর ধরে চললে সারা বছর ধরে লাভ। মুশকিল হচ্ছে চাঁদা দাতাদের আর সাধারণ মানুষের। রসিদ বই দেখলে তাঁরা পালিয়ে যাবার পথ খোঁজেন। কোলকাতার রাস্তা জুড়ে মাসাধিককাল ধরে চলে পূজো। যানবাহন চলাচল বন্ধ। মাইকের চিৎকারে বাড়িতে ছাত্রদের পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম।

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। কিন্তু বুর্জোয়ার অবক্ষয়ের যুগে সেই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গোঁড়ামিকে আমদানি করা হল। ধর্মের নামে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিল। অন্য ধর্মের মানুষের প্রাণহানি, ঘরবাড়ি জ্বালানো, দোকানপাট লুট করা এদের সংস্কৃতিতে আটকায় না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র অসহায়ের ভূমিকা নিয়ে পরোক্ষে এই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্রয়দান করে।

এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বশবর্তী হয়েই কোলকাতার রাস্তায় ভাড়াটে লোকদের সাহায্যে গো-হত্যা নিবারণী মিছিল বের হয়। যারা এর উদ্যোক্তা তারা প্রাণীহত্যার ঘোরতর বিরোধী, কিন্তু তারাই আবার নির্বিচারে হরিজন হত্যায় অকুণ্ঠ।

এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য বর্ণবিদ্বেষ, ছুঁৎমার্গিতা, পর্দানশীনতা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বিধবাবিবাহে অনীহা, নারী-স্বাধীনতায় বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গী এবং তথাকথিত ভদ্রলোকী এবং বুদ্ধিজীবীদের উন্নাসিকতা। সমাজ ব্যবস্থায় এই পশ্চাৎমুখিতা, ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি। আত্মরক্ষার তাগিদে তাই আজ শাসক এবং শোষক গোষ্ঠী ন্যায়, নীতি, শিল্প সংস্কৃতিকে পণ্যে পরিণত করেছে। ধনতান্ত্রিক লুণ্ঠনের স্বার্থেই তারা শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিবান মানুষদের তাদের সেবাদাসে পরিণত করেছে। মানুষকে পশুতে পরিণত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছে। তাই কিশোর ও যুবকদের মধ্যে নানা ক্রাইম স্টোরি বা খুনখারাপি, মারকাট, দাঙ্গা-হাঙ্গামার কাহিনী নাটকে সিনেমায় গল্পে উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে দিয়ে অপরাধপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

সঙ্গীতের নামে বর্তমানে আধুনিকমার্কা যা চলেছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি ও দ্বিজেন্দ্রগীতির দেশে তা অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। এই সব গানের সুরের মধ্যে আছে উদ্দামতা, কামোত্তেজক ইঙ্গিত, প্রলাপোক্তি আর সস্তা যৌন আবেদন। এদেশের 'কড়া' সেন্সর ব্যবস্থার ফাঁক দিয়ে 'সংগম' মার্কা ছবি যে কী করে পাস হয় তা সত্যি বিস্ময়ের। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে এ সবই হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক। আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বিকৃত করে সুস্থ চেতনা ও মূল্যবোধগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে মানুষগুলোকে জন্তুতে পরিণত করার এক ব্যাপক অপচেষ্টা চলেছে।

কোলকাতা শহরের ব্যবসায়িক নাট্যমঞ্চগুলোকে এই অপকর্মে লিপ্ত করে দিয়ে যাত্রাজগতেও সংস্কৃতির বিকার চালিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র চলেছে। মুকুন্দদাসের ঐতিহ্যবাহী স্বদেশী যাত্রায় আজকালকার যাত্রা হল, স্বামীর কোলে মৃত্যু, সিঁদুর দিও না মুছে, শাঁখা দিও না ভেঙে, প্রভৃতি।

এই বিকৃত সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে শতাধিক বছর আগেকার বিখ্যাত রুশ সমালোচক বেলিনস্কি বলেছিলেন, "জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার অধিকার থেকে শিল্পকলাকে চ্যুত করবার অর্থ হল তাকে উন্নত করা নয়, অবনত করা, কেননা শিল্পের প্রাণশক্তি যে ভাবধারা, তাকে বঞ্চিত করে চটুল আনন্দ বিলাস ও অলসের খেলার সামগ্রীতে পরিণত করাই হল তার অর্থ। এর আরও অর্থ হল শিল্পকে হত্যা করা যা চিত্রকলার শোচনীয় পরিণতির মধ্যে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

"এই শিল্পকলা চারিদিকের বিক্ষুব্ধ জীবন সম্পর্কে যেন অনবহিত, যা কিছু জীবন্ত, আধুনিক এবং বাস্তব তার প্রতি দৃষ্টিপাতহীন হয়ে অতিক্রান্ত অতীত থেকে প্রেরণা লাভ করতে চায় এবং তার থেকে তৈরী আদর্শ পেতে চায়, যা পুরাতন জীর্ণ বলে পরিত্যক্ত, যা কোন মানুষের ঔৎসুক্যকে জাগ্রত করে না, উৎসাহ সঞ্চার করে না বা সহানুভূতির সৃষ্টি করে না।"

সংস্কৃতির এই বিকৃতি সম্পর্কে আজ বিবেকবান সংস্কৃতিবান মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদর্শ বা চিন্তার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল লেখকদের সৃজনশীল সংগ্রাম করতে হবে। অপসংস্কৃতির উপদ্রব দূর হলে সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পথ অনেক সহজতর হয়ে উঠবে।

অপসংস্কৃতিবিরোধী সংগ্রামে চাই ব্যাপক ঐক্য

উৎপল দত্ত

অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা যায় অপসংস্কৃতি হচ্ছে সংকট-জর্জর পচে-যাওয়া মরণোন্মুখ সমাজ-ব্যবস্থার বমন, একটা গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ। সব দিকে কোণঠাসা হলে শাসকশ্রেণী তখন চেষ্টা করে জনগণকে তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে ব্যভিচার আর নগ্নতার চড়কি পাকে ঘুরিয়ে তার চারিত্রিক দার্ঢ্য ও প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট করতে। আরো লক্ষ্য করা প্রয়োজন, পশ্চিমের অগ্রসর বুর্জোয়াশ্রেণীর অপসংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের ঔপনিবেশিক মুৎসুদ্দী ব্যবসাদারদের 'সংস্কৃতি'র পার্থক্য। হিটলার এবং নাৎসিদেরও উপস্থিত করতে হয়েছিল কিছু 'যুক্তি', কিছু 'কার্যকারণ'। তাদের প্রয়োজন হয়েছিল রোজেনবের্গের 'দার্শনিক চিন্তা', যার মূল নীটশে, ফিখ্‌টে এবং হেগেল। তাদের সামনে রাখতে হয়েছিল ভাগনারের সংগীত ঐতিহ্যকে, তুলে ধরতে হয়েছিল ট্রোস্ট বা গসেলারের মতন স্থপতিদের, হাউপ্টমানের মতন নাট্যকারকে, মারিনেত্তির মতন কবিকে। একদিকে তারা বই পুড়িয়েছে, সংস্কৃতি কথাটি শুনলেই পিস্তল টানার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে, শিল্পী সাহিত্যিকদের হত্যা ও দেশছাড়া করেছে; কিন্তু অন্যদিকে বিকল্প শিল্পচিন্তার এক বিরাট ভান তাদের বজায় রাখতে হয়েছে, বায়রয়েথ শহরে মার্গ সংগীতের আসরে বিভোর হয়ে বসে থাকার অভিনয় করতে হয়েছে হিটলারকে। নইলে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত করা যেত না কিছুতেই। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা পশ্চিম ইউরোপে 'পারমিসিভ সোসাইটি'র অবাধ স্বাধীনতার প্রচণ্ড ও ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন হয়েছে, যার যা খুশি লেখার অধিকার নতমস্তকে স্বীকার করে নেয়ার অভিনয় প্রয়োজন হয়েছে, এবং এই অবাধ স্বাধীনতার অছিলায় মঞ্চে আনা হয়েছে নগ্নতা ও যৌনক্রীড়া, 'হেয়ার' বা 'ও ক্যালকাটা'র মতন 'নাটক', যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এল এস ডি আর মারিজুয়ানা, 'মুক্ত' দুনিয়ার দোহাই পেড়ে মেরুদণ্ড ভাঙার প্রয়াস চলছে যুবশক্তির, পরের ভিয়েৎনামে পাঠানোর জন্য কামানের খোরাক তৈরী করা হচ্ছে। কিন্তু ঐ অবাধ স্বাধীনতার স্লোগানের পরিসরেই সম্ভব হয়েছে প্রতিরোধ, যা পরে আলোচ্য।

কিন্তু ভারতের শাসকশ্রেণী মূর্খ, হনুমানের পূজারী, জ্যোতিষীর বশম্বদ। সংস্কৃতি বস্তুটি এদের ধাতে নেই। উত্তর ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু জোতদারদের

কদর্য ধ্যানধারণা ভারতের শাসকশ্রেণীর মজ্জার মধ্যে। তাই এখানকার অপসংস্কৃতিও সেই পরিমাণে স্থূল, উৎকট, নির্লজ্জ। বিশ্বরূপা বা প্রতাপ মঞ্চে যা ঘটে তার মধ্যে 'হেয়ার' নাটকের বুদ্ধিনির্ভর চমক কেউ আশা করেন না। কলকাতার ফুটপাথে শনিপূজো, মাস্তানদের মদোন্মত্ত হল্লা আর অসীম-রাসবিহারীর নাট্যকম্মো একই জাতের। বর্তমান শাসকশ্রেণী হিন্দী ভাষা নিয়ে যে পাঁয়তারা কষছেন, যেভাবে মুসলিম শাসকের প্রশংসা করা হয়েছে বলে পাঠ্য-পুস্তক নিষিদ্ধ করছেন, উর্দুর কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছেন, তিরুপতির মন্দিরে ধর্ণা দিচ্ছেন, বারাণসীতে কদর্য হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার উস্কানি দিয়েছেন, যে দেশে প্রধানমন্ত্রী গোহত্যা নিষিদ্ধ করবেন বলেন—সেখানে শাসকদের অপসংস্কৃতিটা সেই মাত্রায় নিরেট হবে এটা সহজেই অনুমেয়।

অপসংস্কৃতি চিরদিনই বুর্জোয়া-জমিদাররা সৃষ্টি করে থাকে, এটা নূতন কিছু নয়। আমাদের লোকসংস্কৃতি ধরা যাক। তার মধ্যে যা কিছু অশ্লীল ও ক্ষয়িষ্ণু তাই জমিদারবাবুর হুকুমে সৃষ্ট অথবা উনিশ শতকের কলকাতার বাবুদের চাহিদা মেটাবার জন্য তৈরী, তা সে খ্যামটাই বলুন আর খেউড়ই বলুন। এখানে একটা কথা বলা বোধহয় দরকার। বুর্জোয়া সর্ববিষয়ে জমিদারের চেয়ে অগ্রসর, একমাত্র সংস্কৃতি ব্যতীত। কথাটা কার্ল মার্কসের। কোনো কোনো জমিদার ছিলেন সংস্কৃতির বিরাট পৃষ্ঠপোষক, এটা ভারতে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। রাজা ও নবাবদের রক্ষণাবেক্ষণে ভারতের মার্গ সংগীত একসময়ে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, প্রখ্যাত লোককবির আহার্য জুটেছে, চিত্রকরের রুজি জুটেছে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী গোড়া থেকে সংস্কৃতির আপসহীন শত্রু, কারণ বুর্জোয়ার কাছে বিক্রেয় পণ্য ব্যতীত আর কিছুরই মূল্য নেই। এ বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য লর্ড বায়রন সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কির রচনা। তাই বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় এলে অপসংস্কৃতির তীব্রতা ও কদর্যতা শতগুণ বৃদ্ধি পায়, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

তবে সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে অপসংস্কৃতির যে রমরমা, আমার মতে তার স্পষ্ট আরম্ভ ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের কালে। বুর্জোয়ার যুদ্ধের জিগিরে উচ্চকিত ভাড়াটে লেখক নাট্যকার চলচ্চিত্রকাররা নোংরামির মজির সৃষ্টি করেছিলেন। প্রতিবেশী মহাচীন সম্পর্কে কুৎসিততম জাতিবিদ্বেষী মিথ্যার বেসাতি বসেছিল শিল্পের সর্বক্ষেত্রে। এই অঙ্কুরিত ফ্যাসিবাদের প্রতিবাদ করেছে যে শিল্পী তাকে প্রহার করায় উল্লাস করেছেন ঐসব লেখক-সাংবাদিক-নাট্যকার। বই পোড়ানো হয়েছে ধর্মতলায়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে

মূর্খ বলে গাল দিয়েছে আনন্দবাজারের বিদ্যাদিগ্‌গজরা। চীনারা নাকি শূকরের মতন বংশবৃদ্ধি করে, লিখলেন 'যুগান্তর'। আর পা মিলিয়ে কুচকাওয়াজ করেছেন শিল্পীর স্বাধীনতার ধ্বজাধারী পরাধীন শিল্পীর দল। আর তখন কমিউনিস্ট পার্টির অফিসগুলি আক্রান্ত হচ্ছে, নাট্যশালায় হামলা হচ্ছে, সত্যজিৎ রায়কে আক্রমণ করছে 'দেশ' পত্রিকা। এভাবে ক্ষেত্র হচ্ছিল প্রস্তুত।

অপসংস্কৃতির বিজয়কেতন উড়লো যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পর, সারা বাংলায় শ্বেত সন্ত্রাসের আমলে। পুলিসের গুলিতে নিহত কমিউনিস্ট যুবকের শবদেহের ছবি কাগজে দেখে, বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই ভাবছিলেন, কয়েকটা কমিউনিস্ট মরেছে তাতে আমাদের কী? কমিউনিস্টদের পিছু হঠতে দেখে তাঁরা এ কথাটা ভাবলেন না, এর পরই আসবে সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদের প্রয়াস—সেটাই ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। বামপন্থী রাজনীতির উত্থান ও পতনের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িত অপসংস্কৃতির প্রশ্ন। কংগ্রেসী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর আক্রমণে কমিউনিস্ট নেতার রক্তাক্ত মৃত্যু, সি আর পি-র তাণ্ডব আর পুলিসের হত্যাভিযান, এমার্জেন্সি আর বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা—এসবের আশ্রয়ে দন্তপংক্তি বিকশিত করে অপসংস্কৃতি। রাইফেলের নলই তার উৎস। 'দর্পণ', 'বাঙলা দেশ' আর 'সত্যযুগে'র বহু‍্যুৎসব গোয়েবল্‌স্ আগেই করে গেছেন বার্লিনে।

আমাদের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আজ যৌনতা, খুন-জখমের প্রাধান্য—কেন এমন হলো? শিল্পের স্বার্থে এগুলিকে কিভাবে এবং কতখানি ব্যবহার করা যায়?

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে আমাদের অনেকেই অসতর্কভাবে খুনজখম বা 'ধর্ষণ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করছেন। আমার বিনীত বক্তব্য—খুনজখম মাত্রই আমাদের পরিত্যাজ্য হতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে, কী উদ্দেশ্যে, কেন, কোন্ শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে খুনজখম দেখানো হচ্ছে? খুনজখম নিষিদ্ধ হলে শ্রেণীসংগ্রাম দেখাবো কি করে? আমরা তো হিংসাবর্জিত গান্ধীবাদী শ্রেণী-সংগ্রাম দেখাতে রাজি নই। লুমুম্বা হত্যা বা ভিয়েৎনামের যুদ্ধ অথবা চিলির প্রতিবিপ্লব দেখাতে গেলে সেটা তো খুনজখমই হবে। ধর্ষণ মাত্রেই যদি বর্জনীয় হয় তবে 'নীলদর্পণ' অপসংস্কৃতি হয়ে যায় না কি? আমার মতে শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে এ-প্রশ্ন বিচার করতে হবে। যা কিছু জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামকে সাহায্য করে তাই সুস্থ সংস্কৃতি। আর যা-কিছু জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামকে ব্যাহত করে তাই অপসংস্কৃতি। তাই শ্রেণীগত চেতনা সজাগ থাকলে খুনজখম,

ধর্ষণ, যৌনতা, কিছুই অশ্লীলতার পাঁকে নিমজ্জিত হয় না। সমকামিতাও হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাসে রোমক সভ্যতার অবক্ষয়ের ভীষণ ও যথাযথ প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে শাসকশ্রেণীর ভাড়াটে প্রচারকদের হাতে সতীত্ব, প্রেম, পুত্রস্নেহ প্রভৃতিও অনেক সময়ে হয়ে ওঠে নারীকে শৃঙ্খলিত করে রাখার অশ্লীল বাজারী ওকালতি।

অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ করার উপায় কী? এর জবাবে বলা যায়, অপ-সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করা যাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও বহু দশক যাবৎ তীব্র সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালিয়ে। বর্তমানে তার প্রসার রোধ করা শুধু ততটুকুই সম্ভব যতটুকু রাজনৈতিক সংগ্রাম এগুবে। তবে এই পরিবেশেও যতটা প্রত্যাক্রমণ সম্ভব ছিল, বুদ্ধিজীবীরা তা করছেন না, এটা মানতেই হবে। লক্ষ্য করবেন, অপসংস্কৃতি সর্বসময়ে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের কথা মনে রেখে সৃষ্ট। কিন্তু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশ এ-বিষয়ে উন্নাসিক এবং উচ্চশিক্ষিত স্বশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। অপসংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্রের কাহিনী সরল ও নাটকীয়, তার রং ঝলমলে, তার চরিত্রচিত্রণ স্পষ্ট ও ফর্মুলা বাঁধা, তার সমস্ত আবেদন শ্রমিক-কৃষকের প্রতি, যারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, সেই হেতু যারা টাকার যোগানদার। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকাররা ধরেই নেন যে আপামর সাধারণ তাঁদের ছবি বুঝবে না? এবং দু-একজন তা নিয়ে গর্বও করেন? এটা কি করে ক্ষমা করা হবে—যে দেশে সাক্ষরের সংখ্যা মুষ্টি-মেয় সেখানে ইওনেস্কোর নাটকের অনুবাদ অভিনয় করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন সিরিয়াস নাট্যকর্মী? শিল্পের উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তার মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে নিয়ে স্বশ্রেণীর পিঠ চাপড়ানোর এই লালসা বাংলায় বুদ্ধিজীবীদের লজ্জাকর পরাজয়ের নিশানা। জনতার অঙ্গন ছেড়ে তাঁরা পিঠটান দিয়েছেন আর সেই ফাঁকা অঙ্গনে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে শাসকশ্রেণীর যৌনতা ও নগ্নতা। তাঁরা কবিতা লেখেন যা উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী ব্যতীত কেউ বোঝে না। তাঁরা সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে বাংলা ভাষা নিয়ে এমন লোফা-লুফি করেন, যা অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিতের কাছে হিং টিং ছট মাত্র। তাঁরা কিমিতিবাদী নাটক করেন, বিপ্লবী নাটককেও এমন ফর্মে উপস্থিত করেন যে কলকাতার গণ্ডী ছাড়ালেই কেউ আর বোঝেন না। উপরন্তু যাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য নাটক করেন তাঁদের প্রতি এঁরা বর্ষণ করে চলেছেন নিরন্তর উপহাস ও কটূক্তি। কিন্তু মার্কসবাদী কখনোই জনতার মুখরিত সখ্যকে এড়িয়ে শিল্প-কর্মের কথা ভাবতে পারে না। কমরেড মাও-ৎসে-তুং তাঁর ইয়েনান ভাষণে

স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছিলেন শিল্পমান এবং জনপ্রিয়তার ডায়ালেকটিক্যাল সম্পর্ক। বিপ্লবী শিল্পী কখনোই বলতে পারেন না, অজ্ঞ জনতা আমাকে বুঝলো না। যদি বলেন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে কোথাও বৃহৎ ফাঁকি আছে, আছে চালবাজি ও অসাধুতা। জনতার বর্তমান মান থেকে শুরু করে যেতে হবে উচ্চ থেকে উচ্চতর মার্গে, জনতাকে সঙ্গে নিয়ে—এটাই মাও-এর কথা, মার্কসবাদের কথা, প্রগতিশীল শিল্পকর্মের গোড়ার কথা। অন্যথায় ঘটে ময়দান ছেড়ে পলায়ন এবং ফাঁকা মাঠে অপসংস্কৃতির গোল দেয়া।

অসহিষ্ণু বুদ্ধিজীবীরা আরো বিপত্তি ঘটিয়েছেন। তাঁরা থেকে থেকে বাংলার সংস্কৃতির মূল ধরে ওপড়াবার চেষ্টা করছেন। 'দেশ' পত্রিকায় বাংলার এক অগ্রণী লেখক অম্লানবদনে বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দী ছবির লেখক আখ্যা দিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছেন। ছাপার অক্ষরে বিখ্যাত নাট্য পত্রিকায় একজন লিখে দিলেন—গিরিশ ঘোষ বিয়ারসেবী ছিলেন এবং বিনোদিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল কদর্য। রবীন্দ্রনাথ কতবার একপেশে আক্রমণের শিকার হলেন তার হিসেব নেই। তেমনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর। এসবকে লেনিন স্রেফ পাতিবুর্জোয়ার কালাপাহাড়ি কাণ্ড আখ্যা দিয়েছেন। পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর কোনো অধিকারই নেই অতীত সাহিত্যের শেষ বিচারে বসবে। সে বিচার করবে শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লবের বেশ কয়েক বৎসর পর। শ্রমিক এখনো বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ পড়েইনি, তাকে পড়তে দেয়া হয়নি। বর্তমান সমাজে যাঁরা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ ভোগ করছেন, সেই পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর একমাত্র কাজ হলো চিরায়ত সাহিত্যের মধ্যে যা কিছু প্রগতিশীল তাকে শ্রমিক-কৃষকের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা—আর কিছু নয়। এটাই লেনিনের নির্দেশ, প্রোলেটকুল্ট সংক্রান্ত ভাষণগুলিতে। পরে শ্রমিকশ্রেণী সব আয়ত্ত করে বিশ্লেষণ করে দেখবে রবীন্দ্রনাথ কতটা অগ্রসর কতটা পশ্চাৎপদ, গিরিশ কি শুধুই লম্পট ছিলেন, না, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাটকও সৃষ্টি করেছেন অনেকগুলি।

পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী অতীতকে ধ্বংস করার কাজে মেতে উঠলে মানুষ তার ঐতিহ্য থেকে বিয়োজিত হয়। সে মনের দিক থেকে নিরস্ত্র হয়ে পড়ে এবং অপসংস্কৃতির আফিম তখন সহজেই তাকে আকৃষ্ট করে।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রগতিমূলক সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনতার জন্যে চলচ্চিত্র, জনতার জন্যে নাটক, জনতার জন্যে গান-কবিতা-সাহিত্য—এই চেতনায় ভরপুর করে দিতে হবে শিল্পীদের। একা নাটক কিছু করতে পারে

কখনো? একথা সত্য নয় যে বাংলার দরিদ্র মানুষ উচ্চ চিন্তা বোঝে না। তারা রামায়ণের দর্শন বুঝেছে, অর্জুনের চরিত্র বুঝেছে। সেগুলি যথেষ্ট জটিল। এটা মফস্বল বাংলার গৌরব যে, যাত্রায় ক্যাবারে নৃত্য ঢুকতে পায়নি। অর্থগৃধ্নু অশিক্ষিত কিছু যাত্রার মালিক চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু প্রথম প্রয়াসেই ইঁটের অভ্যর্থনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁরা ভোল পাল্টেছেন। সুতরাং এই মহান জনতার জন্য শিল্পসৃষ্টি করতে পাওয়াটা সম্মানের ব্যাপার, কলকাতার বুদ্ধিজীবী দর্শকের হাততালির চেয়ে ঢের বেশি সম্মানের।

শিল্পের ফর্ম হবে একান্তভাবে জাতির নিজস্ব, বলেছিলেন স্তালিন। ব্রেখ্‌ট্‌, স্তানিসলাভ্‌স্কির প্রশ্ন এখানে ওঠে না। যে ফর্ম বাংলার জনগণ বুঝবে, ভালবাসবে, যা দেখে সে উদ্দীপ্ত হবে, সেই ফর্মের মোড়কে রাখতে হবে বিপ্লবী বিষয়বস্তু। মাও বলেছেন, আমাদের শিল্পসাহিত্য হবে প্রথমত শ্রমিক-কৃষকের জন্য, দ্বিতীয়ত মধ্যবিত্তের জন্য ; বিপরীতটা ভুল এবং বিপজ্জনক [ইয়েনান ভাষণ]।

বাংলা পেশাদারী নাটকে 'অপসংস্কৃতি' শুধু নগ্ন নৃত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার শিকড় আরও অনেক দূর বিস্তৃত। আর—শুধু বাংলার পেশাদার মঞ্চ নয়, চলচ্চিত্র-সাহিত্য প্রভৃতি সব মাধ্যমেই অপসংস্কৃতি বহু রূপে বিস্তৃত। ধর্মীয় কুসংস্কার ছড়াবার প্রবণতা প্রতি পদে। নারীজাতিকে লম্পট স্বামীর পায়ে গড়াগড়ি খাইয়ে সতীত্ব জাহির করার কাহিনীতে আমাদের সাহিত্য কলঙ্কিত। তবে আমাদের ধৈর্যসহকারে এক এক করে লক্ষ্য বেছে নিতে হবে। ধর্মের নামে বদমাইশির বিরুদ্ধে লেখনী উদ্যত করার সময় এটা নয়। সেটা বিপ্লবের পরেও দীর্ঘপ্রক্রিয়াসাপেক্ষ। লা পাসিওনারিয়া স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে নৈরাজ্য-বাদীদের গীর্জা পোড়ানোর ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখে বলেছিলেন, ধর্মে হাত দিচ্ছ কেন? ধার্মিক লোক কি যোদ্ধা হতে পারে না? প্রশ্নটা সেইখানে—কে লড়বে, কে লড়বে না। বিপ্লবের পূর্বে আর কোনো প্রশ্নের তেমন গুরুত্ব নেই। সুতরাং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিপুল শতকব্যাপী সংগ্রামে আমাদের বোধহয় সর্বসময়ে স্মরণ রাখতে হবে, সংগ্রামের কোন্ স্তরে আমরা আছি, এবং সেই স্তরে আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য কী হবে। সংগ্রামের একেক স্তরে একেক লক্ষ্য। বর্তমানে আমার বিনীত মত—নগ্নতা ও যৌনতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত সকলের সব প্রয়াস।

বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার যারা আপাতদৃষ্টিতে প্রগতিবাদী, তারা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে কি সক্ষম? এর উত্তরে বলা যায়, নিশ্চয়ই সক্ষম, যদি শুধু সাধারণ মানুষের শিল্পবোধকে আমরা মর্যাদা দিতে শিখি, তার বোধগম্য নাটক

করাটাকে লজ্জার বিষয় মনে না করি। আমার ক্রমশঃ মনে হচ্ছে স্তানিসলাভ্স্কি, ব্রেখ্ট্ এবং অন্যান্য দিক্‌পালদের কাছে কলকাতার নাট্যবিদ্‌রা অনেকে প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণ না করে, তাঁদের নামগুলোকে ছুঁড়ে মারছেন বুদ্ধিবাজীর প্যাঁচ হিসেবে। মঞ্চে গিয়ে দেখছি ফিজিক্যাল অ্যাকটিংয়ের নামে আচমকা সব মুষ্টিযোদ্ধার পাঁয়তারা ও হাত-ছোঁড়া। নাটকের নামে শুনছি আধুনিকতম বাংলা কবিতা যা একবার শুনে শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে মহাশয়ও বুঝতে পারবেন কিনা সন্দেহ। অনেক দলে আজকাল নাটকে প্লট থাকাটাই মহা দূষণীয় বলে গণ্য। না, এসব চালিয়াতি ও বুজরুকির পসরা নিয়ে গ্রাম-বাংলায় বা শ্রমিক এলাকায় গেলে জুটবে শুধু চরম লাঞ্ছনা। বিদেশের সব শিক্ষকের কাছে শেখার পর আমার মনে হয় শেখা দরকার আমার দর্শক কিভাবে দেখতে চায়. নাটক। তারপর সব অভিজ্ঞতার একীকরণে আমরা সৃষ্টি করতে পারবো গণনাট্য।

গণনাট্যকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হোন পূর্বোক্ত ঐ একটি স্লোগানের ভিত্তিতে—নগ্নতা ও যৌনতা দূর হোক—এটাই আমার বিনীত প্রস্তাব। আর অনবরত পরস্পরকে গালিগালাজ করার প্রবণতা ত্যাগ করে আসল শত্রুর প্রতি উদ্যত হোক সমবেত ঘৃণা।

অপসংস্কৃতির কথা কইলেই আমরা বোধহয় উত্তেজনার চোটে ইতিবাচক দিকগুলো বিস্মৃত হয়ে বিকট কৃষ্ণবর্ণ এক নেতিবাচক দৃশ্য উপস্থিত করি যা একপেশে বলেই অসত্য। অন্য দিক আছে, প্রবলভাবে আছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর 'অবাধ স্বাধীনতা'র সুযোগে বিপ্লবী চলচ্চিত্রকার ও নাট্যকাররা মাথা তুলেছেন সাম্প্রতিককালে। এবং তাঁরা আত্মকণ্ডূয়নে কালক্ষেপ না করে আপামর সাধারণের জন্যই সৃষ্টি করছেন। কিন্তু আধা-ঔপনিবেশিক এই সুদূর গ্রামীণ কলকাতায় আপনি সে সম্পর্কে আলোচনা শুনবেন না, পড়বেন না। এখানে এখনো চলচ্চিত্রের আলোচনা মানেই ক্ষয়িষ্ণু বের্গমানের আলোচনা বা জঁ্য লুক গদারের। জনপ্রিয় ছবি তো ছবিই নয় কলকাতার বুদ্ধিবাজদের কাছে। তাই 'জেড' বা 'স্টেট অব সীজ' সম্পর্কে এখানে বলার লোক নেই, কেউ নেই যে মার্কিন ছবি 'ট্যাক্সি-ড্রাইভার' বা 'অপারেশন ডে ব্রেক' সম্পর্কে দুটো প্রশংসা করে। কারণ ছবিগুলো সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, উদ্দীপ্ত করার জন্য সৃষ্ট। নাটকের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে পিটার শ্যাফার বা পরিচালক সিগুন কিংবা ওয়ান্টার নান সরাসরি বৈপ্লবিক বার্তায় এসে উপনীত হয়েছেন। অন্য পক্ষে পিণ্টার-ইওনেস্কোর দল ফাঁকা নাট্যশালায় বুদ্ধির কসরৎ করতে করতে হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। এঁদের কলকাত্তাই শিষ্যরাই বা গেলেন কোথায় জানতে ইচ্ছে করে।

ফ্রান্সে তো দেখছি বিপ্লবী নাট্যপরিচালক পাত্রিস শেরো-ই বর্তমানে বিরাজ করছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে।

অনেকে বলছেন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সিনেমা এবং নাটকে ইদানীং অপসংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে—এটা কতখানি সত্য? যদি সত্য হয় তবে কেন এমন ঘটলো? এর উত্তরে বলা যায়, কদর্য ছবি পূর্ব ইউরোপে হচ্ছে, তবে বিপ্লবী ছবি কি কম হচ্ছে? 'হুইট ওয়ার্ড লিবার্টি' তো সোভিয়েত ছবি, অথবা বন্দারচুকের 'দে ফট ফর দেয়ার মাদারল্যাণ্ড'। পোলিশ ছবি 'প্রমিস্‌ড্‌ ল্যাণ্ডে'র তুলনা কোথায়? তবে নাটকের কথাটা ভুল। পূর্ব-ইউরোপের নাট্যশালায় যৌনতা বা নগ্নতা প্রবেশ করতে পারেনি, এটাই বৃহৎ সত্য। পূর্ব-বার্লিন থেকে মস্কো পর্যন্ত নাট্যশালায় মহৎ পুরনো ও নতুন নাটকের সাধনা চলছে, স্বার্থান্বেষীদের নানা প্রয়াস সত্ত্বেও।

কেন পূর্ব-ইউরোপের চলচ্চিত্রে কিছু কিছু নোংরামি ঢুকলো? ক্ষমতাসীন শোধনবাদী চক্রের তথাকথিত 'মুক্ত শিল্পের' আওয়াজ আজ বিশ্বের উত্তেজিত আলোচনার বিষয়। স্তালিন যে অসীম ধৈর্যসহকারে ট্রটস্কিবাদী কালাপাহাড়দের হাত থেকে সোভিয়েত সংস্কৃতিকে রক্ষা করে বহু যত্নে নতুন প্রোলেতারীয় সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, জ্‌দানভ এসে পরে যে বিশাল কর্মকাণ্ডে স্তালিনের হাত জোরদার করেন, সেসব পণ্ড করার এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রয়াস চলে খ্রুশ্চভের আমল থেকে। তবে শোধনবাদীরাই সব নয়, এটাই বড় কথা। লেনিন-স্তালিনের দেশে, লেনিন-স্তালিনের পার্টিতে বিনা যুদ্ধে স্থচ্যগ্র মেদিনীও বিপ্লবীরা ছাড়েননি, ছাড়ছেন না, এটাই বিশেষ করে মনে রাখতে বলেছেন মাও-ৎসে-তুং।

অপসংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট শ্লোগানের ভিত্তিতে। প্রথম এবং এই মুহূর্তের শ্লোগান হওয়া উচিত—বাংলা নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য থেকে যৌনতা দূর করো। এ দাবীতে আমরা পাবো সৎ শিল্পী মাত্রকেই। যাঁরা চিরদিন রবীন্দ্রনাট্যের ব্যাখ্যাকার, যাঁরা হয়তো বা শরৎসাহিত্যকে আশ্রয় করে আছেন, যাঁরা বিদেশী নাটকের একান্ত বুদ্ধিনির্ভর অনুবাদে আটকে আছেন, এমন কি যাঁরা কিমিতি-জ্যামিতি-কুমতি প্রভৃতির কসরৎ করছেন, তাঁদের কেউই থাকতে পারবেন না এ মোর্চার বাইরে। যে যাই করুন গিরিশ-শিশিরের নাট্যশালায় নগ্ন নারীর নৃত্য সহ্য করা তাঁদের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। ঐক্য গড়ে তোলার পথে বাধা

শুধু একটাই চোখে পড়ে—আমাদের মধ্যে কারুর কারুর পরমত অসহিষ্ণুতা এবং নগ্ন ঈর্ষা। এমনও দেখেছি অপসংস্কৃতিবিরোধী সম্মেলনে এক প্রগতিশীল পরিচালক আকারে ইঙ্গিতে 'জগন্নাথ' নাটককে অপসংস্কৃতি বলে বসলেন! 'জগন্নাথ' অপসংস্কৃতি হলে সংস্কৃতি কাকে বলে আমি জানি না। আরেক দুর্দমনীয় বিপ্লবী একধারসে বহুরূপী, নান্দীকার, রূপকারকে নানা অভিযোগে জর্জরিত করতে লাগলেন। কোথায় কী বলতে হয় তার প্রাথমিক জ্ঞান ঐ বক্তার নেই; অপসংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় তাও তাঁর জানা নেই। তিনি জানেন না নগ্নতা ও যৌনতা যেখানে আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য সেখানে উল্লিখিত সংস্থাগুলির সম্মানজনক স্থান থাকবে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রণ্টে। পূর্বে বহুবার বিভেদের এই নিপুণ বিশেষজ্ঞরা শিল্পীদের ছত্রভঙ্গ করে মোর্চা ভেঙে দিয়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করেছেন, কার্যতঃ অপসংস্কৃতির জয়ের পথ প্রশস্ত করেছেন। আর নয়। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠুক শিল্পীদের ব্যাপক ও দৃঢ় ফ্রণ্ট। এ বিষয়ে এখুনি এগিয়ে আসতে হবে গণনাট্য সংঘ, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, সি পি এ টি, থিয়েটার কমিউন, চেতন, পি এল টি প্রভৃতি সংস্থাকে সংগঠকের ভূমিকা নিয়ে।

অন্ধকারের উৎস

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

(Dying in this life is not so hard
building life is harder I daresay.—মায়াকোভস্কি)

সংস্কৃতির জগতে আমরা একটি বিতর্কের সম্মুখীন—এই সমাজ যেহেতু শ্রেণী সমাজ এই বিতর্কও অবধারিত। সমাজের গভীরে রয়েছে এই বিতর্কের উৎস। সমাজ ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। মূলতঃ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের উপর দাঁড়িয়ে। আর সেই কর্মকাণ্ড মনের উপর ফেলছে ছাপ। অন্যদিকে মন ও মননের গুরুত্বও অপরিসীম। সেও নির্দেশ জানাচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে। এই নিয়েই তো সমাজ। যে সমাজের অর্থনীতির মধ্যেই রয়েছে গোলমাল, যার সম্পর্কটা বেমানান, উৎপাদন শক্তি আর সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ, সেই সমাজের মন ও মননের মধ্যেও বিরোধ অনিবার্য।

কোন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মানস জগতে কোন ফসলই শ্রেণীর উর্ধ্বে নয়, সংস্কৃতিতে তো নয়ই। কেউ কেউ মনকে, মনের ফসল সংস্কৃতিকে সমাজ-অর্থনীতি থেকে আলাদা করতে চান। এই বিতর্ক দীর্ঘদিনের। মনই নাকি সমাজ গড়ছে, সমাজ ভাঙছে। আত্মাই নাকি মূল, আর সব বাহ্য। এই ভাববাদ অবশ্য ধোপে টেকে না। এঙ্গেলস্ ব্যাখ্যা করেছিলেন বিষয়টিকে এইভাবে :

'Division of labour only becomes such from the moment when a division of mental and material labour appears. From this moment onward consciousness can really flatter itself that it is something other than consciousness of existing practice, that it is really conceiving something real, from now on consciousness is in a position to emancipate itself from the world and to proceed to the formation of 'pure' theory, theology, philosophy, ethics, etc'.

এমন একদিন সত্যিই ছিল যখন পুঁজিতন্ত্র নীলাকাশের নীচে তাদের পতাকা উড়িয়েছিল। সেদিন আকাশও ছিল মেঘমুক্ত, পতাকার রঙও ছিল রঙীন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায়—

Bliss was it in that dawn to be alive
And to be young was very heaven.

কিন্তু সেই পতাকার রঙ বেশীদিন উজ্জ্বল থাকেনি। কেন থাকেনি? সেও এক প্রশ্ন। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সেই জীবন্ত সৌন্দর্যের নন্দনকানন ছারখার হয়েছে, 'God is in his heaven and all's right with the world'-কে আঁকড়ে থাকা যায়নি। স্বর্গ থেকে পতন হয়েছে রোমান্টিক ইমাজিনেসনের, তার কারণও সমাজ ব্যবস্থার গভীরে। যে পুঁজিবাদ একদিন নিজের নিয়মে গড়ে উঠেছিল ইতিহাসে প্রগতির সূচনা করে, সেই একদিন নিজের জালে বন্দী হলো। ভয়ংকর দুটো বিশ্বযুদ্ধকে সে প্রত্যক্ষ করলো। জালের মধ্য থেকে তার কণ্ঠস্বরও তখন ভয়ংকর—'আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত' (রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ)।

বস্তুতঃ বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পুঁজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে মৃত, সেই শিবিরের মানবতাও মৃত্যুপথগামী। তাই, সেই মৃতের শবদেহ যাঁরা আঁকড়ে থাকতে চান তাঁদের অবস্থাও বড়ই যন্ত্রণার, হতাশার, অসহায়তার। সংস্কৃতি ও নন্দনতত্ত্বের অনেকগুলি বিতর্ক তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন। কেউ তখনও বললেন, 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের রণধ্বনি সেই পলায়নবাদের প্রাসাদকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। কেউ বললেন, সমাজের জন্য লিখি না, স্বপ্নের জন্য লিখি (সুররিয়ালিজম্) কেউ বললেন,—লিখি কিন্তু লেখার অর্থ খুঁজে পাই না (কিমিতিবাদ)। এই পথ ধরেই পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী সংকট ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান জাতির অবমাননা ও হতাশাকে রূপ দিলেন কাফ্‌কা। কেউ ইতিহাসের গতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে 'আমি'র দর্শনে বাঁচতে চেষ্টা করলেন যেমন—সার্ত্রে (Existence is pre-political)। কেউ বললেন, মানুষের জন্মমূলই অর্থহীনতা, আত্মহত্যা থেকে ফিরে আসাই জীবন। মানুষ অভিশপ্ত, সিসিফাসের মতনই, নিজদেশে পরবাসী। এর উপর দাঁড়িয়ে কামুর ক্লাসিক্যাল পেসিমিজম্।

দেশ-বিদেশে পুঁজিবাদ শিবিরে সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং আধ্যাত্মিক শূন্যতার উপর শিল্প সংস্কৃতির এক বিস্তীর্ণ পটভূমি ছড়িয়ে পড়লো। বেকেট, আয়নেস্কো, অস্‌বোর্নের মতন শক্তিমান নাট্যকার পুঁজিবাদী মানুষের বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা, অর্থহীনতা, অমানবিকতার হাহাকারগুলিকে রূপ দেবার চেষ্টা করলেন। কবিতাতেও টি. এস্ এলিয়টের "ওয়েস্ট ল্যাণ্ড"-এর বালি ও কাঁটাগাছ আর প্রুফকের প্রেম আরও আরও বেশী কঠিন, প্রাণহীন, হিংস্র ও ভয়ংকর হয়ে উঠল। আর্নেস্ট ফিসার লিখেছেন—

'In the late bourgeois world of today, when the class struggle

has become more intense, art tends to be divorced from social ideas to drive the individual still further into his desperate alienation to encourage an impotent-egoism and to turn reality into a false myth surrounded by the magic rites of a bogus cult'—The Necessity of Art.

পুঁজিবাদী শিবিরে এই সাংস্কৃতিক সংকট, এই এলিয়েনেশন বা মূল শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন এই অবস্থান এক বিপর্যয়কর রূপ নিল। যাঁরা বুঝতে অস্বীকার করেছেন, 'The world is not in me, I am in the world', পথ চলার স্বাভাবিক নিয়মে তাঁরা এসে পড়েছেন এক গভীর খাদের মুখে। সেই খাদের অতল অন্ধকার দেখে তাঁরা আর্তনাদ করছেন। কিন্তু বিপরীত পথকে আবিষ্কার করতে পারেননি। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের, সভ্যতার অনিবার্য অগ্রগতিকে উপলব্ধি করতে পারেননি বলেই এদেশেও জীবনানন্দ দাশের মতন শক্তিমান কবিও কোন শুভ্র মানবিকতার ভোর খুঁজে পাননি রূপসী বাংলার শরীরের গভীরে। তাঁর কাছে পৃথিবীর এখন এক গভীর অসুখ। জাপানি ঔপন্যাসিক ওসামু দাজাই (লেখক আত্মহত্যা করেছিলেন) লিখেছিলেন—'We are victims of a transitional period of morality.'

একটি বিশেষ যুগে অস্থিরতা, অসুস্থতা যাঁরা আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁরা পুঁজিবাদী সমাজের তাৎক্ষণিক অসুস্থতাকে চিরন্তন বলেই যাচাই করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা পুঁজির দাসত্বকেই ভেবেছেন স্বাধীনতা। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ কর্তৃক মানুষের রক্ত-মাংস খাওয়ার প্রতিযোগিতার জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার 'ইল্যুশনে' ভুগেছেন বা এখনও ভুগছেন। পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত গ্লানিকে—শোষণ, বেকারী, ছাঁটাই, কালোবাজারী, ভেজাল প্রভৃতির মত রালফ্ ফকস্ যাকে বলেছেন anarchy of capitalism in the human spirit…সেই বেশ্যাবৃত্তি, খুন, আত্মহত্যা, অবিশ্বাস, অসুস্থতা, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতিকেও চিরন্তন সত্য বলে দাবী করছেন। কেউ সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে পাগলা ঘোড়ার মত নিজেরই খুরে মাটি খুঁড়ে ধুলোর ঝড় তুলে আর সেই ধুলোর ঝড়ে নিজেই দিশেহারা হয়ে 'সব কিছুই অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না'—বলে আর্তনাদ শুরু করেছেন। তাঁদের কাছে শেষ সম্বল এক মেকি ব্যক্তি স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার পরিচ্ছন্ন কোন সংজ্ঞা দাবীদারদের কাছেও অনুপস্থিত।

ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল তাঁর 'ইল্যুসন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি'তে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

'...And bourgeoisdom, shutting its eyes to beauty, turning its back on science, only follows its stupidity to the end. It crucifies liberty upon a Cross of gold and if you ask in whose name it does this, it replies, 'In the name of personal freedom'.'

বিকল্প সত্যের দিকটিও আছে। পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্ত হয় পূর্ব প্রান্তে সূর্যোদয়ের জন্যই। সমাজ-ব্যবস্থার নিয়মে পুঁজিবাদের যেখান থেকে পতন সেখানে সভ্যতাকে মোড় ঘুরিয়েছে আর একটি বিকল্প সত্য। কারণ পুঁজিবাদের পরিণতি সভ্যতার পরিণতি হতে পারে না। সেই বিকল্প সত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে ১৯১৭ সনে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। মার্কস্ যাকে বলেছিলেন, এলিয়েনেসান থেকে ইন্টিগ্রেসনে ফিরে আসাই মন ও মননের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তারই ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে হাতেকলমে নভেম্বর বিপ্লব রূপ দিয়েছে। সারা দুনিয়ার সৃষ্টিশীল সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছে। দুই দশক পেরিয়ে সংস্কৃতির এই নতুন মূল্যবোধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এই পরীক্ষা ইতিহাসেরও, নতুন বিশ্বাসেরও। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যে পৃথিবীর রঙ বদলেছে। পুঁজিবাদের জঙ্গল থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাসের গতিধারাকে উপলব্ধি করে শ্রেণী সংগ্রামকে স্বীকৃতি জানিয়ে, শ্রেণী সংগ্রামেরই সৈনিক হিসাবে এগিয়ে এসেছেন নতুন চিন্তানায়করা, স্রষ্টারা। শ্রেণী সংগ্রামের পরিণতিতে শ্রেণীবিহীন সমাজের বিশ্বাসকেই বুকের মধ্যে আঁকড়ে থেকে 'রুটি ও গোলাপের জন্য' যুদ্ধে এসে উপস্থিত হলেন অনেক নতুন শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি। শুধু সোভিয়েট সাহিত্যেই নয়, শুধু ইউরোপীয় সাহিত্যেই নয়, পাঁচ মহাদেশ জুড়েই শিল্প সাহিত্যের নতুন শিবির গড়ে উঠল। ব্যারিকেডের এপারে দাঁড়িয়ে মৃত্যুপথগামী পুঁজিবাদকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যাঁরা নতুন জীবনের জয়গান গাইলেন। অনেক নতুন ফুল ফুটল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের নতুন বাগানে। সে এক অন্য দুনিয়া, অন্য প্রসঙ্গ। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

॥ দুই ॥

বাংলাদেশের সংস্কৃতির গর্ব আমাদের সকলের। এই সমাজ আমাদের উপহার দিয়েছে অনেক মনীষীদের যাঁরা আমাদের চিন্তার জগতে যথার্থ পূর্বসূরীর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ইতিহাসের একটা নিয়ম আছে। সমাজ বিকাশের একটা ধারা আছে। এই মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করে যেমন

সংস্কৃতি সাহিত্যের বিচার হয় না তেমনি সংস্কৃতি জগতে আজকে যে আত্মসমীক্ষা বা বিতর্ক চলছে তারও মীমাংসা হবে না। ব্রিটিশ যুগে উপনিবেশিক ভারত, সামন্তবাদী কৃষি ব্যবস্থার জগদ্দল পাথরের চাপে আক্রান্ত ভারত, বৃটিশ ও অন্যান্য বিদেশী পুঁজিতন্ত্রের হাত ধরাধরি করে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের নতুন ভারত যে অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যে সামাজিক রাজনৈতিক উপরিকাঠামোকে গড়ে তুলেছে, তাকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির কোন মূল্যায়ণই সম্ভব নয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আমরা তো এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন—স্বাধীনতা আমাদের পরিপূর্ণ স্বাধীন করেছে কি? সমাজের সম্পদ যদি থাকে মুষ্টিমেয়র হাতে আর অধিকাংশের হাত যদি হয় নিঃস্ব, আর তারা যদি সেই মুষ্টিমেয়র রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয় তাহলে শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজের জমে থাকা গ্লানি সংস্কৃতি জগতের আঙিনাকেও কলঙ্কিত করে। আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলি আজ তাই আক্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে তার মুখবন্ধে হিত-বাদের নোটিস টাঙিয়ে দিয়েছিলেন—দেশের ও দশের উপকার করতে পারলেই লিখবেন, নয়তো না। কারণ শিল্পী হিসেবে 'রজনী' উপন্যাসের নায়ক অমর-নাথের মত তিনিও নিজের মুখোমুখি হয়েছিলেন—'এই জীবন লইয়া কি করিব?' এ হলো মহৎ শিল্পীর অনিবার্য জীবনজিজ্ঞাসা। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন সুখের বিপরীত শব্দ দুঃখ, কিন্তু আনন্দের কোন বিপরীত শব্দ নেই। আনন্দ-বাদে বিশ্বাসী কবির স্থির প্রত্যয় ছিল—'সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে যে এমন সকল বিষয় মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে, যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, যুক্তি আছে, যা 'ব্যাপক এবং গভীর'। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ—তাঁর দীর্ঘ আশী বছরের শুভ্র সমুজ্জ্বল জীবনে সেই পাপকে তিনি কোন-দিনই স্বীকার করেননি।

কিন্তু এই ঐতিহ্য আজ ধূলিধূসরিত। ত্রিশ বছর স্বাধীনতার পরও যাঁরা অর্থনৈতিক শোষণভিত্তিক ব্যবস্থাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, যাঁরা বাঁচিয়ে রাখতে চান এই অমানবিক নির্মম কাঠামোকে, তাঁদের সংস্কৃতি আর ঠিক তার উল্টো দিকে যাঁরা স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও পথ খুঁজছেন প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার, মুক্ত হওয়ার, যাঁদের হাতে সম্পদ নেই কিন্তু মন আছে—তাঁদের সংস্কৃতি এক নয়, এক হতে পারে না। বলা বাহুল্য, সমাজের এই বৈপরীত্য যত বেড়েছে সংস্কৃতির মানদণ্ডের বিতর্কও বাড়বেই।

একটি নাটকের প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছিলাম ব্যক্তিগত রুচিবোধ এবং সামাজিক শিল্পবোধের তাগিদেই। দেশ-বিদেশী সাহিত্যের অকৃপণ দানে গঠিত এই যুগের একজন মানুষ হিসাবে। বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার, নান্দীকার, গণনাট্য সংঘ প্রভৃতির অভিনীত নাটক থেকে যে মূল্যবোধ জন্মেছে তারই তাগিদে। নাটকটিকে প্রত্যাখ্যান করার পিছনে নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক কোন উন্নত বিতর্কের অবকাশ আছে বলেই আমি মনে করি না। কারণ নাটকটি সে পদবাচ্য নয়। কিন্তু তাই নিয়েই এ বিতর্ক সত্যই আমাকে উৎসাহিত করেছে। সেই বিতর্ক ছড়িয়ে গেছে কলকাতার 'নামী-দামী' দু-একটি সংবাদপত্রের দু-একটি 'নামী-দামী' লেখকের আসরে আবির্ভাবে।

ব্যাপারটি আমার কাছে একদিকে যেমন আকস্মিক, কৌতুককরও বটে। কারণ প্রধান অতিথি হওয়ার এই প্রত্যাখ্যান এক সাংস্কৃতিক বিতর্কের আবতারণা করবে আমি ঠিক বুঝিনি। একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় মাথা ঘামিয়ে একটি প্রবন্ধও লিখে ফেলা হলো (যদিও এই প্রবন্ধের সূত্রপাত একটি ভুল তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে যে, নাটকটিকে নাকি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। নাটকটিকে বন্ধ করা হয়নি।) এক আশ্চর্য হাস্যকর 'আবু হোসেনের তত্ত্ব' হাজির করা হলো। কিন্তু লেখক বোধহয় জানেন না সত্যিই আবু হোসেনের দল রাষ্ট্রীয় জীবনেও আছে। সংস্কৃতির মঞ্চেও আছে। প্রশ্ন হলো, সেই আবু হোসেনরা কোন্ জীবনদর্শনের সিংহাসনে বসে আছে। যদি সেই সিংহাসনটি পচে গিয়ে থাকে তাহলে আবু-হোসেনরাও চিৎপাত হয়। যে গোয়েবেলস্‌দের (প্রবন্ধকারের উদাহরণ) পতন হলো তাদের পতন হলো সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন সবকিছু নিয়েই। সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি সব কিছুরই সৃষ্টি সমাজ-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মননজগতে। সেখানে কোন দর্শন, সাহিত্য বা রাজনীতি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর মননজগতে অনেকদিন বিধৃত থাকে, সযত্নে লালিত হয়, নতুন নতুন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, আবার কেউ ক্ষণস্থায়ী, ধোপেই টেকে না। এই কারণেই টেকে না তারা কালের যাত্রার বিকশমান সত্যের বিরুদ্ধতা করে, প্রতিক্রিয়ার পক্ষে দাঁড়ায়। আর যাঁরা বিকশমান সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন সেই মনীষীদের বরণ করে নেয় বিশ্ববাসী। এমতবিচারে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন সবকিছুই পড়ে। যে কারণে গোয়েবেলস্ টিকতে পারল না, সেই কারণে সল্‌ঝেনিৎসিনদের দল সমাজতন্ত্রের পবিত্র মাটিতে দলে দলে ফিরে আসতে পারবে না। সেই দুঃখে অনেক সাংস্কৃতিক আবু হোসেনরা আস্ফালন করলেও উপায় নেই।

উক্ত সংবাদপত্রের লেখক খুব হাস্যকর একটি প্রশ্নও করে বসলেন আমাকে —'তিনি যখন থাকবেন না, এই নাটক (বারবধূ) ও নাটুয়ারা যে থাকতে পারেন সেটা তিনি ভেবে দেখেছেন কি ?' খুব স্পষ্ট ভাষায় বলি ভেবে দেখেছি। সমাজ বিকাশের মধ্যেই আগামী দিনের একটা নির্দেশ থাকে। সেই নির্দেশ মাথায় নিয়েই বলছি, না, টিকতে পারবে না। গোয়েবেল্‌স্‌রা জার্মানীর মাটিতে যেমন টিকতে পারল না। তারা যাবার আগে অনেককেই ধ্বংস করে গেল। অনেক মূল্যবোধকে পচিয়ে গেল, কিন্তু মৃত্যুকে উত্তীর্ণ করেও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীনতার, শান্তির আকাঙ্ক্ষাই জিতল। পতিতারা বা 'ডাস্টবিনে অপজাত বাচ্চা' (প্রবন্ধকারের উদাহরণ) কোন সভ্যতার চিরন্তন সত্য নয়। যে সায়গন শহরে সদ্যমুক্তির হাওয়া বইছে সেখানে আর 'বিবর' 'প্রজাপতি' লেখা হবে না। ধনিকদের পয়সায় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি ঠিক হবে না। লেখকদেরও এইরকম অলৌকিক অপরিণত তত্ত্ব নিয়ে কালি খরচ করতে হবে না।

এদেশ পেছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশ। পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী সংকটের যুগে এদেশে গান্ধীর হাত ধরে টাটা-বিড়লারা হাঁটি হাঁটি পা পা শুরু করেছিল। এরা প্রথম থেকেই খঞ্জ। তারপর গোদের উপর বিষফোঁড়া। সামন্তবাদের অবসান না ঘটিয়ে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছে। (এদেশে হনুমান অবতার দেখতেও ভিড় জমে, বিড়লা প্লানেটোরিয়াম দেখতেও লোক হয়।) অর্থ নৈতিক জগতে এই পেছিয়ে থাকা সমস্যা আমাদের সাংস্কৃতিক জগৎকে করেছে ভীষণভাবে কলুষিত। আর পুঁজিবাদের শিবিরে 'সংস্কৃতির প্রভু'রা এর অন্তঃসারশূন্য মেকি নাকি-কান্না ছাড়া কীইবা উপহার দেবেন এ যুগে। এ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে ইউরোপের সংস্কৃতিতে যে অন্ধকারের আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল বেশ কয়েকটি দশক পেরিয়ে আমাদের দেশে সেই আর্তনাদকে এখন শোনাচ্ছে বিত্তবানের মৃত্যুর পর ভাড়া করে আনা কাঁদিয়ে দলের অন্তঃসারশূন্য কান্নার মত।

'সংস্কৃতির প্রভু'দের একটি ধারালো হাতিয়ার হলো অশ্লীলতা। যদিও শ্রেণীভিত্তিক সমাজে এর সংজ্ঞা কোনদিনই সর্বজনগ্রাহ্য হলো না। সমাজে দুই শ্রেণী যদি থাকে দুই মেরুতে তাহলে বোধহয় হবেও না। কিন্তু অশ্লীলতার প্রবক্তাদের বড় যুক্তি হলো, যে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি আছে, যে সমাজে যৌন অপরাধ বাড়ছে সেই সমাজে সাহিত্য তাকে রূপায়িত করবে। তার ফলাফল যাই-ই হোক এটাই নাকি মহৎ শিল্পীর লক্ষণ। আমাদের বিতর্কের মাপকাঠি এই নিয়ে নয় যে, মহৎ শিল্প সমাজের ক্ষতগুলিকে তুলে ধরবে কিনা ? প্রশ্ন

হলো সমাজের ক্ষতকে শেষ কথা বলে স্বীকার করে নেব কি না? এই প্রসঙ্গে আর্নেস্ট ফিসারের একটি মন্তব্য আমার কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে—

'In a decaying society, art, if it is truthful, must also reflect decay. And unless it wants to break faith with its social function art must show the world as changeable. And help to change it.'—(The Necessity of Art).

আমাদের বাংলা সাহিত্যের উদাহরণে দেখা যেতে পারে যৌন জীবনকে বিষয়বস্তু করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমস্ত সাহিত্যজীবনে যে সুদূরপ্রসারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার সমতুল্য নজীর কোথায়? প্যাভলভের পাশাপাশি ফ্রয়েড, হ্যাভলক্ এলিসের সূত্রগুলি নিয়েও পরীক্ষা করেছেন। মহৎ শিল্পী বলেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুতে পেরেছিলেন—"ভেবে দেখলাম, যৌন অত্যাচারের হাত থেকে মানুষের উদ্ধার পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। মানুষ তার শ্রম খাটিয়ে ভালভাবে বাঁচতে শিখলে অনেক গ্লানির পাঁক থেকে সে নিজেকে তুলে ধরতে পারবে।" (একটি বখাটে ছেলের কাহিনী)।

কিন্তু চোর কেন ধর্মের কাহিনী শুনবে? আর এর মূলে আছে একটা শ্রেণী রহস্য। তাদের জীবনবেদ হলো অর্থই পরমার্থ। খুব নির্দিষ্ট করে বললে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মত এদেশেও প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃতির প্রভু'রা সংস্কৃতি চর্চা করে নির্দিষ্ট মুনাফার লক্ষ্যে। সংস্কৃতি তাদের কাছে পণ্য। তারাও বাজারের সাইকোলজি বোঝার চেষ্টা করে। কোন কোন আইটেমের (যেমন সেক্স্, ক্রাইম, স্মাড্-ইজ্ম্, মাতলামি, মূল্যবোধহীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি) কিরকম ডিম্যাণ্ড সৃষ্টি করা যায়। তারপর তারা বাজারে সাপ্লাই দিলেন। সাপ্লাইয়ে আবার কিছু ভেজালও পড়লো। বছরের শেষে অ্যাকাউণ্টস হবে নেট প্রফিট কত? আর্থিক ও আধ্যাত্মিক প্রফিট। এই তো বাস্তবতা। আমাদের দেশে দারিদ্র্য যেমন সীমাহীন, সামাজিক অসাম্য যেমন বেপরোয়া, তেমনি এই 'সংস্কৃতির প্রভুদের' সংস্কৃতির পসরাটিও স্বাভাবিক কারণে নিকৃষ্টতার চরমে পৌচেছে। আর জমে থাকা আবর্জনার গন্ধ মন্দের হলেও সবার নাকেই পৌচেছে। কারণ এর জাল ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সিনেমায়, নাটকে, যাত্রায়, পত্র-পত্রিকায়, কবিতায় উপন্যাসে, নাচে-গানে, বিজ্ঞাপনে-পোশাকে। সব মিলিয়ে যেন এক বিচিত্র রঙের আয়োজন। কিন্তু সব রঙেরই আড়ালে পুঁজিবাদের মৃত্যুর রঙটাই যেন ফেটে বেরিয়ে আসে। সেই রঙ সাদা।

কিন্তু জীবন তো নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেই। তাই আমাদের সমাজও শুধু পুঁজিবাদের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শুনে শান্ত থাকতে পারছে না। এক অনিবার্য সচেতনতা গড়ে উঠছে সমাজ মানসের মধ্যেই। এই সচেতনতা নতুন বিশ্বাসের, নতুন সৃষ্টির। ক্ষমতাবান শ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে হলে সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শের জগতে সংগ্রাম অনিবার্য এবং সেই সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে না পারলে সংগ্রাম তার চূড়ান্ত লক্ষ্যেও পৌঁছুতে পারে না। একটি উদাহরণ দিই। শত্রু-কবলিত সায়গন শহরেও সিনেমা হল ছিল, আর সেই সিনেমা হলে দেখানো হতো আমেরিকান কোকা-কোলা-মার্কা উলঙ্গ ফিল্ম। একটি ভিয়েতনামী প্রতিনিধিদল কলকাতায় এসেছিলেন। শত্রু-কবলিত সায়গনের এই সিনেমা হলগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন, আমেরিকান সৈন্য আর শহরে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ভবঘুরে ছিন্নমূল কিছু উন্মাদ ছাড়া হলে লোক ঢোকে না। ভিয়েতনামের কোন নাগরিক সেখানে ঢোকার প্রয়োজন মনে করেন না। স্তম্ভিত হয়েছিলাম। অবশ্যই এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিপুল সাফল্য ভিয়েতনাম দেখিয়েছে মনের জগতে তথা সংস্কৃতি জগতেও এই সংগ্রামের সাফল্য বোধহয় একই সত্যের দুটি দিক। বস্তুতঃ পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন ব্যবস্থার সংগ্রাম চলে সর্বক্ষেত্রে—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সংস্কৃতি তথা মতাদর্শের ক্ষেত্রে এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সংগ্রামও চূড়ান্তভাবে জয়যুক্ত না হলে চূড়ান্ত জয়কেও বোধহয় ছিনিয়ে আনা যায় না।

কেউ কেউ বলছেন, আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, সরকার তার দায়িত্ব পালন করুন। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানে রাস্তায় মাতলামো নয়। কেউ যদি এই অধিকার চান তাহলে সরকার তার রাশ টেনে ধরতে পারেন। আমরা এই সামাজিক দাবিকে নিশ্চয়ই মূল্য দিই। যে-কোন সুস্থ সমাজই যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করে, তেমনি ব্যক্তিস্বাধীনতার অপপ্রয়োগকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বকে স্বীকার করে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তো চূড়ান্ত সমাধান হয় না। কোথাও হয়নি।

পুঁজিবাদী সমাজও স্বীকার করে 'সংস্কৃতির প্রভু'দের হাতে সংস্কৃতি নিশ্চিত ভাবে নিরাপদ নয়। তাই সেনসরশিপ, বই বেআইনী করা, গাইড-লাইন নির্ধারণ করা এই সবেরও রেওয়াজ আছে (অবশ্য কোন দেশে এও তুলে দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু এ তো মৌলিকভাবে সমাধানের পথ নয়। যে সমাজ নিশ্চিতভাবে খুনী আর অপরাধীর সৃষ্টি করে, আবার সেই খুনী, অপরাধীদের ধরার জন্য আইন রচনা করে সেই সমাজ মানুষের কাছে আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। তেমনি

যে সমাজ সংস্কৃতিজগতে পাঁক জমাচ্ছে আবার সেই পাঁককে দূর করার জন্য লোক-দেখানো ঝাড়ুদারদের নিয়োগ করছে তাও আমাদের কাম্য নয়। আমাদের লক্ষ্য এই সমাজটাকে পালটানো। আর সমাজটাকে পালটানো যায়। সেই পালটানোর দর্শন এ যুগের মানুষ আয়ত্ত করেছে। হাতে-কলমে প্রমাণ করেছে। মানব-সভ্যতার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে নতুন সভ্যতার জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

শ্রমিক শ্রেণীর তথা দেশের শোষিত জনগণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে না আসা পর্যন্ত নতুন কোন সংগ্রামই চূড়ান্তভাবে জয়যুক্ত হয় না। কিন্তু সেই জয়ের লক্ষ্যে চাই ধারাবাহিক সংগ্রাম। যদি আমরা স্বীকার করে নিই আমাদের বাংলা সংস্কৃতি, আমাদের বাংলা সাহিত্য একদল মুনাফাখোর, ফাটকাবাজ আর তাদের উচ্ছিষ্টভোগীর হাতে থাকবে, তারাই পরিচালনা করবে মঞ্চ, প্রতিটি দৃশ্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ব্লো-হট্ নাটক লিখবে, শারদীয়া সংখ্যায় হাত উঁচিয়ে বেলেল্লাপনার প্রতিযোগিতা করবে আর তাদের কর্মকাণ্ডকে বেশ তাত্ত্বিক সমর্থন যুগিয়ে কিছু 'অভিভাবকের দল' নৈর্ব্যক্তিক আভিজাত্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখবে, তাহলে বোধহয় আমরা পূর্বসূরীদের কাছে যে ঋণ তাও অস্বীকার করবো আর উত্তরসূরীদের কাছেও চিরকালের মত অপরাধী থেকে যাবো।

শোষক শ্রেণীর সংস্কৃতি আর শোষণ-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচারক বাহিনীর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমরা চাই ব্যাপকতম মানুষের সমর্থনপুষ্ট সাংস্কৃতিক মঞ্চ। "প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল"—এই নির্মল আবেগ নিয়েই আমরা এই মঞ্চকে গড়ে তুলতে চাই। সমস্ত সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে আমরা আন্তরিক আবেদন জানাই—আসুন, আমরা গৌরবময় জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেব না। গ্রামে শহরে অজ্ঞাত অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকার, অভিনেতা, লেখক আমরা জড়ো করতে চাই এই মঞ্চে। অন্ধকার শেষ কথা নয়। কোন সমাজের চিরন্তন সত্য নয়। আসুন, আমরা আলোর সন্ধান করি। এই আলোর সন্ধান তো মানুষকে সভ্যতাকে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উন্নত করেছে।

আমরা এই সাংস্কৃতিক সংকটের মুখোমুখি। এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আমরা যদি একদিকে ব্যাপকতম প্রতিবাদের মঞ্চ গড়ে তুলতে পারি, অন্যদিকে যদি আমরা পারি নতুন বিশ্বাসের এক রক্তমাংসের শরীর গড়ে তুলতে আমাদের শিল্পকর্মে, নাটকে, কবিতায়, চলচ্চিত্রে, কথাসাহিত্যে, ছবিতে, পোস্টারে, গানে, যাত্রায়—তাহলেই আমাদের দায়িত্ব বোধহয় পালন করতে পারবো। আত্মবিশ্বাস এই যে ইতিহাসের নির্দেশ আমাদের পক্ষে।

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে লেনিন

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

এক

সমাজের অভ্যান্তরীণ দ্বন্দ্বের গতিময়তা সমাজকে বিবর্তনশীল করে রেখেছে। এই বিবর্তনমূলক সমাজ ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। উৎপাদন যন্ত্রগুলির উপর কর্তৃত্ব ও অধিকারের তারতম্যের উপর সমাজের শ্রেণী সম্পর্কগুলি দাঁড়িয়ে আছে। এই বি-সম শ্রেণী সম্পর্ক তথা শ্রেণী সংঘাতের মধ্য দিয়েই একটি নির্দিষ্ট কাল বিধৃত সমাজে বিভিন্ন ভাবাদর্শ গড়ে ওঠে। এই ভাবাদর্শ থেকে সৃষ্ট শিল্প সাহিত্যও তাই শ্রেণী চরিত্রে চিহ্নিত না হয়ে পারে না। শ্রেণী সমাজে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও শ্রেণী স্বার্থ জড়িত। কিছুটা পরোক্ষ কিছুটা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভূমিকা থাকে বলেই শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে কোন যুগেই সমাজ অধিপতিরা নির্বিকার থাকে না। ট্রাইবাল, ফিউডাল ও বুর্জোয়া যুগের শিল্প সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশরীতির বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে কিভাবে উৎপাদন যন্ত্রগুলির উপর প্রভুত্ব সৃষ্টিকারী শ্রেণী এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। ন্যায়, নীতি, সত্য, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্বের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত, শ্রেণী নির্বিশেষে একাত্মক নয় বরং অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিভিন্ন। সুতরাং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক বনিয়াদের উপরিতল। মার্কসবাদ লেনিনবাদ এই সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে। জমিদার ও ভূমিদাস নিয়ে যে সামন্তপ্রথা তারও উপরিতল ছিল—সামন্তপ্রথাকে রক্ষা করে এমন রাজনৈতিক প্রচার, আইনকানুনও ছিল। এরপর পুঁজিবাদী সমাজেও শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উপযোগী রাজনৈতিক তত্ত্ব, আইনকানুন এবং তার প্রচারক তথাকথিত পণ্ডিত গোষ্ঠী সৃষ্টি হল। আবার রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিপ্লবের পর বনিয়াদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন উপরিতলের জন্ম হল। উপরিতল কিন্তু শুধু বুনিয়াদের ছায়ামাত্র নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উপরিতল একটি কার্যকরী শক্তি হিসেবে বনিয়াদকে শক্তিশালী করার কাজে অংশ গ্রহণ করে।

লেনিন তাঁর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন সম্বন্ধে প্রবন্ধে বলেছেন যে, সমস্ত শোষকশ্রেণীর দুটো ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজন। ঘাতক আর পুরোহিততন্ত্র এই

দুই ধরনের ব্যবস্থা না হলে তাদের পক্ষে অত্যাচার ও শোষণ চালানো সম্ভব হয় না। ঘাতক অর্থাৎ শোষণ করে এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা যার কাজ হচ্ছে শোষিত মানুষের, অত্যাচারে নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহকে নির্মম আঘাতে দাবিয়ে রাখা। আর এই রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থনে যে দার্শনিকেরা, পণ্ডিতেরা, প্রচারকরা সাহিত্য, শিল্প দর্শন, অর্থনীতি প্রচার করে থাকেন, তারাই এই পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোক। এই পুরোহিতদের কাজ সম্পর্কে লেনিন বলেছেন যে, এরা দুঃখী জনতাকে ধোঁকা দেবার জন্যে উজ্জ্বল রঙে মিথ্যা ছবি আঁকে, তাদের মনকে কুরুচি আর প্রলোভনের পাঁকের দিকে টানে, চলতি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি সমর্থন তাদের মনের মধ্যে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। বিপ্লবের ভাবধারা, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছাকে দুর্বল করবার জন্যে নানা কায়দায় প্রচার এই বুর্জোয়া পণ্ডিতরা চালায়। বিপ্লবীদের মনে নিজেদের শক্তির উপর অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে, এরা পুঁজিবাদকে বরবাদ করতে পারবে কি, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব, শোষণ নেই, অত্যাচার নেই, এই রকম সমাজ ব্যবস্থা কি এরা কোনদিন গড়ে তুলতে পারবে?—সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধরনের সন্দেহ, নিজেদের শক্তির উপর অনাস্থা সৃষ্টি করাই এই পুরোহিত সমাজের কাজ। এই জন্যেই বণিক সমাজ ও পুঁজিবাদ এদের মোটা বেতন বা নানারকম অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে পোষণ করে। পুঁজিবাদী সমাজের উপর মহল এইভাবে তার বনিয়াদকে রক্ষা করে—মেহনতী মানুষের অবাধ শোষণের পথ সুগম করে।

দুই

মার্কস এক জায়গায় বলেছেন যে, শিল্প সাহিত্য হল বস্তুসত্তাকে সৃষ্টিমূলক-ভাবে জানার প্রক্রিয়া। লেনিন বলেছেন, শিল্প হল আত্মেতর বাস্তবের প্রতি-ফলন। সাহিত্যিকের মানস মুকুরের মতো সামাজিক বাস্তবকে প্রতিফলিত করে। কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিককালে সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এবং তার অর্থনৈতিক কাঠামোটি চিহ্নিত করতে পারলে শ্রেণী দ্বন্দ্বের চরিত্রটি পরিষ্কার হবে এবং সে যুগের শিল্প-সাহিত্য ব্যাখ্যাও সহজ হয়ে যাবে। শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে লেনিনবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সোভিয়েত সমালোচক লিফশিৎস বলেন, "অতীত সংস্কৃতির মহৎ প্রতিনিধিগণের চেতনায় বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে।" তিনি আরও বলেছেন, "লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় কেমন করে কোন্ শিল্পসৃষ্টিতে তার

ঐতিহাসিক মর্ম খুঁজে বের করতে হয়, কেমন করে পৃথক করতে হয় তার মধ্যে মৃত থেকে জীবন্তকে, কেমন করে স্থির করতে হয় কোন্ অংশ ভবিষ্যতের অভিমুখী ও কোন্ অংশ অতীতের দাসত্বে চিহ্নিত।" লেনিন একটি প্রবন্ধে লেখেন—"ধনবাদ আমাদের যে সংস্কৃতি দিয়ে গিয়েছে তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং তার ভিতর থেকে গড়ে তুলতে হবে সমাজবাদ। সব রকমের বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, সব রকমের সাহিত্য ও শিল্প আমরা অবশ্য নেব।" ইয়ং কমিউনিস্ট লিগের তৃতীয় কংগ্রেসের ভাষণে (১৯২০) লেনিন বলেন—"সমগ্র মানবজাতির বিকাশের ধারা বেয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, আমরা যদি তার সঠিক স্বরূপ স্পষ্ট বুঝতে না পারি, এই সংস্কৃতিকে যদি আমরা পুনরায় প্রয়োগ করতে না শিখি, তাহলে আমাদের পক্ষে প্রলেটারিয়েন সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এ না বুঝলে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারব না। প্রলেটারিয়েন সংস্কৃতি একটা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যাপার নয়। প্রলেটারিয়েন সংস্কৃতিতে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করেন, এমন কয়েকজন ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভাবনও তা নয়। এ ধারণাগুলো একেবারে বাজে। আমলাতন্ত্রী সমাজ, ধনতন্ত্রী সমাজ—এদের শাসনের মধ্যেও মানবসমাজ জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করেছে, প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি হবে তারই স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি।"

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে যেমন নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না আবার নির্বিচারে বর্জন করাও যায় না। মহান শিল্প সাহিত্যের এতিহ্য বা মহৎ শিল্প-সাহিত্যিকদের সৃষ্টি মর্মবস্তুকে বিচার সাপেক্ষে গ্রহণ করতে না পারার মনোভাবকে লেনিন 'সাংস্কৃতিক নেতিবাদ' (Cultural Nihilism) বলে অভিহিত করেছেন। লেনিন বলেছেন, "কোন শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ হন, তাহলে তাঁর রচনায় বিপ্লবের কোন না কোন মর্মগত অংশ প্রতিফলিত না হয়ে পারে না।" এই মন্তব্যের মর্মার্থ হল বিগত দিনের শিল্পী সাহিত্যিক যাঁদের প্রভাব জনগণের উপর থাকে তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ আছে, প্রগতিয়ানা আছে তা নিষ্কাশিত করে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। বুর্জোয়া যুগের লেখকদের শ্রেণী সমঝওতার পদক্ষেপকে শাসকগোষ্ঠী কাজে লাগায়। আবার সেই শিল্পী সাহিত্যিকের মধ্যে অনুভূতির গভীরতা, দৃষ্টির ব্যাপকতা, সহানুভূতিশীল মনোভাব, ব্যক্তিত্ববোধ ইত্যাদি কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর গণ্ডী অতিক্রম করতে দেখা যায়। বিসমার্ক হেগেলের দর্শনকে পররাষ্ট্রগ্রাসী জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দর্শন হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাই বলে হেগেলের বিপ্লবী প্রেরণা অস্বীকার করা যায়? গ্যেটে

ফরাসী বিপ্লবেরও বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তার জন্য গ্যেটের সাহিত্যকে কি আমরা বর্জন করতে পারি? লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় নির্মমভাবে আমাদের সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। মহৎ লেখকদের, যেহেতু তাঁরা এক একটি যুগকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে যা লেনিন করেছিলেন তলস্তয় সম্পর্কে। তলস্তয়ের মৃত্যুর পর লেনিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, "তলস্তয় আর বেঁচে নেই, যে প্রাক্-বিপ্লব রুশিয়ার দুর্বলতা ও ক্লীবত্ব সেই মহান শিল্পীর দর্শনে অভিব্যক্ত এবং তাঁর রচনাবলীতে চিত্রিত হয়েছে তাও আজ অতীতের জিনিসে পর্যবসিত। কিন্তু তিনি যে উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছেন তার মধ্যে এমন সব জিনিস আছে যা অতীতের নিদর্শন নয়, ভাবী-কালের সম্পদ। রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এই উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। রাষ্ট্র, গির্জা, জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে তলস্তয়ের সমালোচনার কথা রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের সামনে ব্যাখ্যা করবে। জনগণ নিজেদের কার্যকলাপ আত্মশুদ্ধি ও ঈশ্বরপরায়ণ জীবন যাপনে সীমিত রাখবে এই উদ্দেশ্যে নয়—১৯০৫ সালে সামান্য আহত জার গণতন্ত্র এবং ভূস্বামী প্রথার বিরুদ্ধে নতুন আঘাত হেনে তাকে ধ্বংস করার জন্য জনগণ আবার যাতে মাথা তুলে দাঁড়ায় সেটাই হবে উদ্দেশ্য। রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী জনগণের সামনে পুঁজিবাদ সম্বন্ধে তলস্তয়ের সমালোচনাকে ব্যাখ্যা করবে—জনগণ পুঁজি ও টাকার শাসনের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত বর্ষণেই ক্ষান্ত থাকুক শুধু এই জন্য নয়। জনগণ যাতে তাদের জীবন ও সংগ্রামের প্রতি পদক্ষেপে পুঁজিবাদের দ্বারা অর্জিত প্রযুক্তি বিদ্যাগত ও সামাজিক সাফল্য-গুলিকে কাজে লাগাতে পারে, যাতে তারা সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী অক্ষৌহিণীরূপে সংগঠিত হয়ে পুঁজিবাদকে ধ্বংস এবং দারিদ্র্যের অভিশাপ আর মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত এক নতুন সমাজ গঠনে সমর্থ হয় তাই হবে ব্যাখ্যার লক্ষ্য।" [এল. এন. তলস্তয়। কালেক্টেড ওয়ার্কস ১৬শ খণ্ড]

তলস্তয় সাহিত্যের বিপ্লবী কার্যকারিতা প্রসঙ্গে লেনিন আরও বলছেন:

"তলস্তয় শুধুমাত্র শিল্পকৃতি রচনাই করেননি। জনসাধারণ যখন ভূস্বামী এবং পুঁজিপতিদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে নিজেদের জন্য মানুষের মত জীবন যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করবে তখন তারা সর্বদা তলস্তয়ের রচনাবলী পাঠ এবং তার রসাস্বাদন করবে। তিনি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার দ্বারা নিপীড়িত বিশাল জনগণের মনোভাব এবং তাদের প্রতিবাদ ও ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। তলস্তয় ছিলেন

প্রধানত ১৮৬১-১৯০৪-এর যুগের মানুষ। তাই তিনি তাঁর রচনাবলীতে শিল্পী এবং চিন্তাবিদ্ ও প্রচারক উভয়রূপেই, প্রথম রুশ বিপ্লবের গোটা যুগের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিস্ময়কর স্পষ্টতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন—বিপ্লবের শক্তি ও দুর্বলতা দুটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।" [ঐ]

চিরায়ত সাহিত্য লেনিন পড়তে ভালবাসতেন। অনেকের মনে হতে পারে মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রয়োগবিদ্ ও বিশ্লেষক এই দার্শনিক সাহিত্য পাঠে সময় করে উঠতে পারতেন না। বিপ্লবী কাজকর্মে ও তাত্ত্বিক রচনায় তাঁর দীর্ঘ সময় কেটে যেত ঠিকই কিন্তু প্রবীণ রুশ লেখক এবং ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি তিনি বারবার পড়তেন। ক্রুপস্কায়া সাইবেরিয়ার নির্বাসন কালের স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "সাইবেরিয়ায় আমি পুশকিন, লেরমন্তভ, নেক্রাসভের বই সঙ্গে নিয়ে যাই। ভ্লাদিমির ইলিচ সেগুলির ঠাঁই করেছিলেন তাঁর খাটের কাছে, হেগেলের পাশেই, রোজ সন্ধ্যেয় বারবার করে তা পড়া হত। পুশকিন ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তবে শুধু প্রসাদগুণেরই ভক্ত তিনি ছিলেন না। যেমন, চের্নিশেভস্কির 'করণীয় কী?' উপন্যাসখানা তিনি ভালবাসতেন, যদিও শিল্প আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা ছিল দুর্বল, কাঁচা। কী মন দিয়ে তিনি উপন্যাসখানা পড়েছিলেন এবং তার ভিতরকার-সূক্ষ্ম দিক তিনি আবিষ্কার করে-ছিলেন দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। তবে চের্নিশেভস্কিকে তিনি ভালবাসতেন তাঁর সামগ্রিক অবয়বে। তাঁর দুটি ছবি ছিল ইলিচের সাইবেরীয় অ্যালবামে, একটির তলে ইলিচ নিজের হাতে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর বছর লিখে রেখেছিলেন। এই অ্যালবামটিতে এমিল জোলারও ছবি ছিল, রুশী লেখকদের মধ্যে ছিলেন গের্ৎসেন আর পিসারেভ।...মনে আছে সাইবেরিয়ায় জার্মান ভাষায় গ্যেটের 'ফাউস্ট' বইখানিও ছিল, আর ছিল হাইনের একটি কবিতা গ্রন্থ।"

[ইলিচের প্রিয় বই—নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া]

তিন

মার্কসবাদ লেনিনবাদ শিল্প সাহিত্যের বিষয়ের উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে কেননা বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে থাকে সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কগুলি। কিন্তু আঙ্গিক বা রচনার প্রসাদগুণ সম্পর্কে মার্কস বা লেনিন কেউই উদাসীন ছিলেন না। মার্কসের বিখ্যাত উপদেশ 'সেক্সপিয়রের মতো লিখতে শেখ' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একবার লেনিন ছাত্র-ছাত্রীদের একটি কমিউন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন, 'কী পড়ো

তোমরা? পুশকিন পড়ো?' 'একদম না। পুশকিন তো বুর্জোয়া, আমরা পড়ি মায়াকভস্কি'—একটি ছাত্র সোৎসাহে জবাব দিল। ছাত্ররা ভেবেছিল লেনিন এই উত্তরে খুশী হবেন। লেনিন মৃদু হেসে বললেন, 'আমার মনে হয় পুশকিন আরো ভাল।' লেনিন মায়াকভস্কির কবিতার দুর্বোধ্যতার জন্য তখন একটু বিরূপ ছিলেন। পরে আমলাতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করে লেখা বা শ্রমিকদের উপর কবিতা পড়ে খুশী হয়েছিলেন। আঙ্গিকের নবীনত্ব লেনিন পছন্দ করতেন যে জন্য গোর্কির সাহিত্য তাঁর ভাল লাগত। কিন্তু রীতিসর্বস্বতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

বিষয়বস্তুই প্রকাশরীতি বা আঙ্গিকের উদ্ভব ঘটায়। একটি নির্দিষ্ট বিষয়-ভাবনা, তার মাধ্যম চরিত্রগুলির টিপিক্যাল বৈশিষ্ট্য বা জীবনধারা, সমাজ-জীবনে তার স্থান প্রভৃতি লেখককে প্রকাশরীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। বুর্জোয়া সাহিত্যে রীতিসর্বস্বতার ঝোঁক দেখা যায় এবং নব নব আঙ্গিক উদ্ভাবনের প্রয়াসে উদ্ভট সাহিত্যিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। মার্কসবাদী লেনিনবাদীর মতে রীতিসর্বস্বতা বিষয়ের দীনতা বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়ের বাস্তবতা থেকে পাঠককে দূরে রাখার চাতুর্য থেকে উদ্ভূত। শিল্পী সাহিত্যিক যখন শোষকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করে তখন জীবনের মূল সমস্যার তীব্রতা ও বাস্তবতাকে ভয় পায় এবং ভাষার মায়াজাল ও আঙ্গিকের কুহেলিকা সৃষ্টি করে পাঠককে মোহাচ্ছন্ন এক স্বপ্নজগতে দূরমনস্ক করে দেয়। ফলে শোষকশ্রেণীর লাভ হয় যে মানুষ সমস্যার তীব্রতার যন্ত্রণা থেকে প্রতিকার চিন্তায় উদ্যোগী হতে পারবে না। শুধু বুর্জোয়া জগতে নয় ইদানীং শোধনবাদের উদার আবহাওয়ায় কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশেও বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শ্রমজীবী মানুষের বীরত্বের কাহিনী ইত্যাদি কম গুরুত্ব পাচ্ছে। সেখানে নিরবয়ব আঙ্গিকের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পেয়েছে যা শিল্প সাহিত্যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আত্মীকরণ ছাড়া কিছু নয়। জাগ্রত ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে খোঁচা দিতে গিয়ে শোধনবাদের প্রবক্তা ক্রুশ্চভকেও নিজের দেশে কী পরিমাণ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে ঘটনা সকলেরই স্মরণ আছে। আমাদের দেশেও শোধনবাদী বুদ্ধিজীবীরা চিৎকার জুড়ে দিলেন, তাঁদের অভিযোগ শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হচ্ছে। বাংলাদেশের শোধনবাদীদের মুখপত্র 'পরিচয়ে' প্রতি-বাদের ঝড় বয়ে গেল। অবশ্য সেই সব লেখকদের অনেককেই এখন অনিবার্য পরিণতি হিসেবে কংগ্রেস স্বতন্ত্র পার্টির দলে ভিড়তে দেখা যাচ্ছে। অভিনবত্বের নামে পুরাতনকে বর্জন করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। লেনিন বলছেন :

"যা সুন্দর তাকে নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখতে হবে, রাখতে হবে নমুনা হিসেবে, তা থেকে শুরু করতে হবে, সেটা যদি পুরনো হয় তা সত্ত্বেও। যা বাস্তবিক সুন্দর তার দিকে আমরা কেন মুখ ঘুরিয়ে থাকব, নতুন বিকাশের যাত্রাবিন্দু হিসেবে সেটাকে কি পরিত্যাগ করব কেবল এই কারণে যে ওটা 'পুরনো'? কেন নতুনকে আমরা দেবতার মতো পূজো করব কেবল এই কারণে যে সেটা 'নতুন'? বাজে কথা, একেবারে বাজে কথা! তার মধ্যে অনেক ভণ্ডামি আছে এবং অবশ্যই আছে পাশ্চাত্যে শিল্পের যে ফ্যাশন চালু রয়েছে তার প্রতি অজ্ঞানকৃত শ্রদ্ধা। আমরা ভাল বিপ্লবী কিন্তু কেন জানি 'আধুনিক সংস্কৃতি'তে আমরাও পিছিয়ে নেই, এইটে প্রমাণের জন্য ভারি তাগিদ অনুভব করি। আমি কিন্তু নিজেকে 'বর্বর' বলতে ভয় পাই না। এক্সপ্রেশনিজম, ফিউচারিজম, কিউবিজম এবং অন্যান্য ইজমকে শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি বলে গণ্য করা আমার সাধ্যের অতীত। ওগুলো আমি বুঝতে পারি না। ওগুলোর মধ্যে আমি কোন আনন্দ পাই না।"

মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর বোধগম্য শিল্প সাহিত্যের প্রতি লেনিনের সমর্থন ছিল না। তিনি শিল্প সাহিত্যের কার্যকারিতা সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শ্রমিক কৃষকের সাংস্কৃতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে শিখিয়েছিলেন। বুর্জোয়া শিল্পী বা লেখকরা শ্রমিক কৃষক জনগণের সাংস্কৃতিক তৃষ্ণাকে স্বীকার করে না। তারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি দুটি শ্রেণী বিভাগ করে থাকে। শিল্পের মান রক্ষার অভিমানটাই তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। শ্রমিকশ্রেণী কম বোঝে সুতরাং সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তারা করুণার পাত্র এই হল বুর্জোয়া শ্রেণীর ধারণা। শোধনবাদীরাও এই একই ধারণা পোষণ করেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে উদার নীতিবাদের সুযোগে তৎকালীন পার্টি পোষকতা পুষ্ট পত্রপত্রিকায় আঙ্গিক চর্চার মরশুম পড়ে যায়। বুর্জোয়া ফ্রয়েড তত্ত্ব কমিউনিস্ট শিবিরের লেখকদের জীবনদৃষ্টির মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গল্প কবিতায় উপন্যাসে অবচেতন মনের তথাকথিত উদঘাটনের নামে উদ্ভটতত্ত্বই স্থান করে নিয়েছিল। এই সবই হয়েছিল বুদ্ধিজীবী সূক্ষ্মতা ও জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের অছিলায়। কালের গতিতে, শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্য আঘাতে সে সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে কিছু লেখক প্রগতি শিবির থেকে বুর্জোয়া শিবিরে বিক্রীত হয়ে গেছেন। লেনিন বলছেন:

"শিল্প সম্বন্ধে আমরা কি ভাবছি সেটা বড় জিনিস নয়। কোটি কোটি জনগণের মধ্যে কয়েক শ অথবা এমন কি কয়েক হাজার মানুষ শিল্প থেকে কী পেল

সেটাও জরুরী না। শিল্প জনগণের সম্পদ। ব্যাপকতর মেহনতী জনের ঠিক গভীরেই তার শিকড় যাওয়া দরকার। তাকে হতে হবে এই জনগণের কাছে বোধগম্য ও প্রিয়। তাদের অনুভূতি, ভাবনা ও অভিপ্রায়কে সম্মিলিত ও উত্থিত করতে হবে তাকে। তাদের মধ্যকার শিল্পীকে জাগিয়ে তুলতে হবে, বিকশিত করতে হবে। শ্রমিক কৃষক জনগণের যখন প্রয়োজন কালো রুটির তখন অল্প কিছু লোকের জন্য মিষ্টি মিহি কেক দেব কি আমরা? বলাই বাহুল্য যে নিম্নোক্ত কথাগুলোকে শুধু আক্ষরিকভাবে নয় রূপকার্থেও বোঝা দরকার: চোখের সামনে সর্বদাই শ্রমিক কৃষকদের রাখতে হবে। তাদের জন্যই আমাদের ব্যবস্থাপনা শিখতে হবে, হিসেব করতে শিখতে হবে। একথাটা শিল্প এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।" [সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব—লেনিন]

চার

সাম্রাজ্যবাদী যুগে ভাববাদী অনুভূতিসর্বস্ব বুর্জোয়া শিল্পী সাহিত্যিকরা আজ যৌনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এক নোংরা জীবন বিরোধী শিল্প সাহিত্য প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের সমস্ত ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ-পোষকতায় এই প্রচেষ্টা চলছে। ধনবাদ সমাজের শ্রেণী শোষণের প্রকৃত রূপটি গোপন করবার জন্য, জনমানসকে প্রবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ করবার জন্য তার অধিকারের সমস্ত প্রচার যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার করে। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের প্রতিটি ধনবাদী রাষ্ট্রে পত্রপত্রিকাগুলি মনোপলি ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত। তারা স্বভাবতই শ্রেণী স্বার্থে তরল যৌন আবেদনমূলক শিল্প সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দান করে। ধনবাদ নারীর প্রতি মর্যাদা কখনই রক্ষা করতে পারে না কারণ নারীকে তারা ভোগ্যপণ্য রূপে গণ্য করে। তাই নরনারীর সম্পর্কের কোন সুস্থ সৃজনশীল রূপ তাদের কাছে ধরা পড়ে না। তারা নরনারীর সম্পর্ককে বিকৃত জীবিকতার পঙ্ককুণ্ডে নামিয়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। মানুষের যৌনতার জৈব ভূমিকা ছাড়াও একটা সামাজিক ভূমিকাও আছে যা প্রজাতি রক্ষার এবং উৎপাদনী শক্তির বিকাশের পক্ষে একটি অপরিহার্য উপাদান। এই শক্তি শ্রমের সহযোগী হিসাবে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করলে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুর্জোয়া মতাদর্শের স্থিতাবস্থা শিল্পী সাহিত্যিকরা সচেতন বা অবচেতনভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন বলেই যখন শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীসংগ্রাম উচ্চতম স্তরে পৌঁছেছে তখন এঁদের শিল্প সাহিত্যে প্রধানত যৌন প্রসঙ্গ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং তা চলছে ফ্রয়েডীয়

তত্ত্বকে সামনে রেখে। লেনিন বলেছেন: "ফ্রয়েডের মতবাদকে আরও বেশীদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যেন "পণ্ডিতি", এমন কি বিজ্ঞানসম্মতও বলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু আসলে তা হলো মূর্খতা ও আনাড়িপনা। ফ্রয়েডের মতবাদ আধুনিক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌন সমস্যার উপর ঐ প্রবন্ধগুলির মতামত, তর্কাতর্কি —ঐ পুস্তিকাগুলি সংক্ষেপে বলতে গেলে বুর্জোয়া সমাজের নোংরা মাটিতে ঠিক যে ধরনের সাহিত্য ফনফন করে বেড়ে ওঠে সেগুলিতে আমার বিশ্বাস নেই, নিজ নাভির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ভারতীয় যোগীর মত এই সব প্রশ্ন নিয়ে যারা সব সময়ই মাথা ঘামায়, তাদের প্রতি আমার আস্থা নেই। আমার মনে হয় এই সব আড়ম্বর যুক্ত যৌন তত্ত্বগুলি যা কিনা প্রধানত প্রতারণামূলক এবং প্রায়ই নিছক কল্পনাপ্রসূত সেগুলি ওঠে বুর্জোয়া নৈতিকতার কাছে মাথা নোয়ান আর নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অস্বাভাবিকতা ও ভোগের আতিশয্যকে সমর্থন করার খাতিরে। বুর্জোয়া নৈতিকতার প্রতি এই প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাকে আমার অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হয় এবং এর দ্বারা যৌন সমস্যার বিষয়গুলিকে আরও খুঁচিয়ে তোলা হয়। এইগুলি প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের ও তাদের ঘনিষ্ঠতম লোকদের সখের ব্যাপার। পার্টিতে, শ্রেণী সচেতন সংগ্রামী সর্বহারাদের মধ্যে কোনও স্থান নেই। [নারী ও সমাজ – লেনিন]

প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের লেখকরা জীবন দর্শন হিসেবেই এগুলিকে গ্রহণ করে স্থতরাং তাদের বিরুদ্ধে লেনিনের এই বক্তব্য প্রয়োগে আমাদের সামনে বাধা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু পেটি বুর্জোয়া মানসিকতা দুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা শ্রমকশ্রেণীর সংগ্রামের ছদ্ম সহযোগী হয়ে যখন শিল্প সাহিত্যে জীবনযন্ত্রণার নামে, বাস্তবতার অছিলায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অতিচর্চা করে তখনই প্রগতি শিবিরে যথার্থ সঙ্কট দেখা দেয়। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে শোধনবাদী মতাদর্শের প্রভাবে যখন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি হতে থাকে তখনই এই ধ্যানধারণা প্রাধান্য পেতে থাকে। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমশক্তি ও সৃজনশীল ক্ষমতার প্রতি পেতি বুর্জোয়ারা আস্থাহীন, তাই বুর্জোয়া মতাদর্শের পক্ষভুক্ত হয়ে প্রতি-বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। কখনও উদারতা কখনও বাস্তবতার ছদ্মবেশে শোধনবাদী শিবিরের শিল্প সাহিত্যে তাই দেখা যায় যৌন বিষয়ের অকুণ্ঠ চর্চা। লেনিন এদের সম্পর্কে বলেছেন বুর্জোয়া ভাবধারার ডিম থেকে সদ্যজাত হলুদ ঠোঁটওয়ালা ছোট পাখিগুলো সব সময়ই ভয়াবহ রকমের চালাক। লেনিন আরও বলেছেন: "যৌন জীবনের লাম্পট্য হল বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য—ক্ষয়ের লক্ষণ। সর্বহারারা একটি উদীয়মান শ্রেণী। এদের পক্ষে নিস্তেজক বা উত্তেজক ওষুধের

দরকার হয় না। যৌন আতিশয্য বা মাদকদ্রব্য কোন উত্তেজকেরই প্রয়োজন নেই। এরা কখনই ভুলবে না—কিছুতেই ভুলবে না ধনতন্ত্রের লজ্জা, ক্লেদ, ক্রুরতা। শ্রেণীর অবস্থা থেকে, কমিউনিস্ট আদর্শ থেকেই তারা সংগ্রাম করার সবচেয়ে বেশী প্রেরণা লাভ করে।" [নারী ও সমাজ—লেনিন]

পাঁচ

চের্নিশেভস্কি বলেছেন, "আর্ট হল জীবনের পাঠ্যপুস্তক।" শিল্প সাহিত্যকে সমাজজীবন, শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজের যে কোন আন্দোলনের ঊর্ধ্বে বিরাজমান সৃজন প্রচেষ্টা বলে বুর্জোয়া তত্ত্ববিশারদেরা যে প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা সৃষ্টি করে, মার্কসবাদ তাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করেছে। বুর্জোয়া দার্শনিক ও শিল্প তাত্ত্বিকরা একটি বক্তব্য খুব জোরের সঙ্গে বলে আসছেন, শিল্প সাহিত্যের কোন শ্রেণী বিচার হতে পারে না। শিল্প শিল্পীমনের লীলাময় এক সমাজ নিরপেক্ষ ব্যাপার। আসলে তাঁরা এই উক্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের দাসত্বের গ্লানি গোপন করতে চেষ্টা করেন। অপরদিকে তাঁদের এই বক্তব্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে সেই দিন থেকে যে দিন শিল্পী সাহিত্যিকরা জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের দ্বন্দ্বময় রূপটি বস্তুগতভাবে উপস্থাপিত করতে শুরু করলেন। এই বাস্তব শিল্পের গভীরতা ও জনপ্রিয়তা থেকে আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়াগোষ্ঠী বকধার্মিকের মত উদার নীতিবাদের নামাবলী ধারণ করেন। লেনিন দেখিয়েছেন, বুর্জোয়ারা দল-নিরপেক্ষতার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য, কারণ দল না থাকলে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন লড়াইও থাকবে না। লেনিন আরও বলেছেন, "ব্যক্তিগত মালিকানার উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, শিল্পী সেখানে শিল্প সৃষ্টি করে বাজারের জন্য, ক্রেতারা তার প্রয়োজন।"

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বর্তমানের মানুষকে এই কথাই শিখিয়েছেন, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শিল্প সাহিত্যও শ্রেণী স্বার্থের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য। শ্রেণী নিরপেক্ষতার বক্তব্য তোলার অর্থ হল প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে নিজের শ্রেণীর সপক্ষে প্রচার চালিয়ে যাওয়া।

লেনিন বলেছেন, "বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদীদের আমরা অবশ্যই বলব, পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য নিছক ভণ্ডামি। যে সমাজ অর্থক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, যে সমাজে শ্রমজীবী জনগণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে এবং মুষ্টিমেয় ধনীরা পরগাছার মত বেঁচে থাকে, সেই সমাজে কোন প্রকৃত ও কার্যকরী 'স্বাধীনতা' থাকতে পারে না। শ্রীযুক্ত লেখক মহাশয়, আপনি কি আপনার বুর্জোয়া

প্রকাশক বা বুর্জোয়া লোকজনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীন, যারা উপন্যাসে ও চিত্রশিল্পে পর্নোগ্রাফি এবং 'পবিত্র' Scenic শিল্পের পরিপূরণ হিসেবে বেশ্যাবৃত্তি আপনার কাছে দাবী করে? এই পূর্ণ স্বাধীনতার বক্তব্য বুর্জোয়া ও অ্যানার্কিস্ট বুলি (বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে অ্যানার্কিজম হল সেই বুর্জোয়া দর্শন যা অন্তর্লোককে বহির্লোকে পরিণত করেছে)। সমাজ ছাড়া কেউ বাস করতে পারে না এবং সমাজ থেকে মুক্তও হতে পারে না। বুর্জোয়া লেখক, শিল্পী বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বাধীনতা টাকার থলি, দুর্নীতি ও বারবণিতা বৃত্তির উপর নির্ভরশীল নিছক একটি মুখোশ (ভণ্ডামিপূর্ণ মুখোশ)।"

এই হল তথাকথিত স্বাধীন শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনবাদের বিশ্লেষণ। বুর্জোয়া জগতে দীর্ঘদিন যাবৎ এই তথাকথিত স্বাধীনতার বক্তব্য প্রচারিত আছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও শোধনবাদের আবহাওয়ায় বুর্জোয়াদের এই শিল্প বক্তব্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ায় সৃজনশীল মার্কসবাদের নামে স্তালিন আমলের তথাকথিত লৌহযবনিকা উত্তোলিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী মার্কিনী সংস্কৃতির জন্য সমাজতন্ত্রী দেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। এতদিনের রুদ্ধদ্বার খোলা পেয়ে পচা দুর্গন্ধ-যুক্ত দূষিত বুর্জোয়াদের 'শিল্পে স্বাধীনতা'র মতাদর্শের হাওয়া সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আক্রমণ করল। বিমূর্তবাদ, উদ্দেশ্যহীন রীতিচর্চা, ইয়াঙ্কি চটুলতা সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যে দ্রুত অনুপ্রবেশ করল। ক্রুশ্চেভ নিজেই বেসামাল হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে ক্রুশ্চেভকে রাশ টানার চেষ্টা করতে হল, "যাঁরা মনে করেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং আঙ্গিক সর্বস্বতা, বিমূর্তবাদ প্রভৃতি ধারাগুলি সোভিয়েত শিল্পে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারে অনিবার্যভাবে তাঁরা নেমে যান ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের শত্রুদের অবস্থানে, ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থানে।"

জলে নামলে দেহ ভিজবে না এ তো হতে পারে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব মেনে নিলে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে অর্থাৎ Superstructure-এ তার প্রভাব পড়বেই। তাই ক্রুশ্চেভকে তাঁর শোধনবাদী অনুসরণকারীদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ভারতীয় শোধনবাদীরা তো এতদূর স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন যে তাঁদের পার্টি পত্রিকার পাতায় লেনিনবাদও আক্রমণের লক্ষ্য থেকে বাদ পড়ল না। শোধনবাদী শিবিরের তত্ত্ববিশারদ শ্রীসতীন্দ্র চক্রবর্তী 'পরিচয়ে'র পাতায় লিখলেন, "লেনিন অসহিষ্ণু দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন", বা আরেক জায়গায়—"লেনিনের পার্টি-তত্ত্বের অভিঘাতে মার্কসবাদের মানবিকতা অনেকখানি স্বরূপ ভ্রষ্ট হয়েছে।"

শিল্পী সাহিত্যিকদের 'স্বাধীনতা'র স্লোগানটি যে কতবড় রাজনীতিক চাতুর্য তা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পরবর্তী কালে। উগ্র জাতীয়তাবাদের আক্রমণ যখন কমিউনিস্ট শক্তির উপর নগ্ন হয়েছে ঠিক সেই সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বুর্জোয়াদের আজ্ঞাবহ শিল্পী সাহিত্যিকরা জনগণের উপর প্রগতি সংস্কৃতির প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজে'র পতাকাতলে ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকল। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য কমিউনিস্টরা এবং প্রগতি শিল্প সাহিত্য। শোধনবাদীরাও এ ব্যাপারে তাদের দোসর। স্বাধীনতার রাজপথে ভাববাদী ঈশ্বরবিশ্বাসী থেকে দৈহিক নগ্নতাবিলাসী পর্যন্ত সকলেই অবাধচারী, বুর্জোয়া প্রহরীর একমাত্র কাজ মার্কসবাদী ভাবাদর্শের অনুপ্রবেশ রুদ্ধ করা।

মার্কসবাদী সাহিত্যাদর্শ থেকে বিচ্যুতির সর্বপ্রধান প্রবণতা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্ক আত্ম-সন্তুষ্টি ও সংগ্রাম-বিমুখতা—তথা প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে নির্দ্বিধায় সহাবস্থান। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিল্পতত্ত্ব বিশ্বাসী শিল্পী সাহিত্যিকদের সংগ্রাম এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে। যে শ্রেণীর মানুষ এখনও বাঁচার সামর্থ্য অর্জন করেনি, স্বাক্ষরতাটুকু শেখেনি, তাদের হয়ে রাজনীতিকের যেমন দায়িত্ব আছে শিল্পী সাহিত্যিকেরও সমান দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব যাঁরা স্বীকার করেন না তাঁদের সাহিত্য শিল্পগুণে যত উন্নতই হোক জীবনবিরোধী একথা বলতেই হবে।

অপসংস্কৃতি : অবক্ষয়ের বেনো জল

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

এক

সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তার সংস্কৃতির উপরিথাক গড়ে ওঠে। যুগে যুগে উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্কের পরিবর্তনে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটেছে। নতুন অর্থ নৈতিক ভিত গড়ার উন্মেষপর্বে নতুন সংস্কৃতির ইমারত গড়ে উঠছে; ক্রম উৎপাদন ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংকট ও শ্রেণী-সংগ্রামের চাপে সেই ভিত জীর্ণ হলে, পচতে শুরু করলে, যে অবক্ষয়ের ফাঁকগুলো (উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে) বেরিয়ে পড়ে, সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে অপসংস্কৃতির বেনো জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়; ক্ষয়িষ্ণু ভিতের মালিক-প্রভুরা বাঁচার চেষ্টা করে। সংস্কৃতির বিকার বা সংকট মানেই গোড়ায় গলদ। এই অন্ধকার গর্ত থেকেই নতুন জন্মের যন্ত্রণা ও স্বপ্ন মাথা তুলতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদ মানেই অবক্ষয়। লেনিন একে 'মৃতপ্রায়' বলে বর্ণনা করেছেন; কারণ, এই স্তরে শ্রম ও পুঁজির সংঘাত তীব্রতর হয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবের পথে নিয়ে গেছে; দ্বিতীয়তঃ এই স্তরে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি কাঁচামাল ও বাজারের জন্য নিজেরাই মারামারি করছে, অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটিয়ে নিজেরাই ভেঙে পড়ছে ক্ষয়ে যাচ্ছে; তৃতীয়তঃ মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পরাধীন ও উপনিবেশের জনগণের বিরোধ ও সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে। স্তালিন বলেছেন, "Imperialism was instrumental not only in making the revolution a practical inevitability, but also in creating favourable conditions for a direct assault on the citadels of Capitalism"

তবু এই 'মৃতপ্রায়' বা অবক্ষয়ী ব্যবস্থাও বাঁচতে চায়। তার এ বাঁচা গুলিবিদ্ধ হায়নার মত পচা ঘা আর প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে বাঁচা। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের গর্ভ থেকে একদিকে জন্ম নিল 'মহান নভেম্বর বিপ্লব' ও দিকে দিকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম; অপরদিকে কোণঠাসা পচনশীল পুঁজিবাদকে কুৎসিত ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে হল। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফ্যাসিবাদকে কবরে যেতে হল; কিন্তু তার সংস্কৃতি মরল না; তাকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, গত পঞ্চাশের দশক থেকে, নয়া-ফ্যাসিবাদী সূক্ষ্ম কায়দায় সাজিয়ে একই সঙ্গে নিজেকে বাঁচাতে এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তি ও তার প্রভাবগুলিকে ঠেকাতে আসরে নামল।

সেই থেকে, সঙ্কট-জর্জর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ক্ষয়িষ্ণু একচেটিয়া পুঁজি-বাদের পাহারাদারীর কাজে এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অপারেশন চালিয়েছে। উৎপাদনের উপকরণগুলির সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের বিচ্ছিন্নতার সময়ে, অবদমন ও অবক্ষয়ের সময়ে একদিন যেমন ধর্ম বা আত্মার তত্ত্ব এসেছিল, আজ এই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে এবং তারই রাজ-নৈতিক সংকটের পর্যায়ে নয়া-ফ্যাসিবাদের উপরিথাক বানাতে তৎপর শাসক-শ্রেণী নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা, ব্যক্তিগত বাউণ্ডুলেপনা বা বিদ্রোহ, খুন রাহাজানি, প্রতিহিংসা, মানববিদ্বেষ, যৌনসম্ভোগের নৈরাজ্য—এই সমস্ত উপাদানে শিল্প-সাহিত্য, নাটক-চলচ্চিত্র, রেডিও-টেলিভিশন ও জনগণের সমগ্র জীবনচর্যার মধ্যে চালান করছে। উদ্দেশ্য সেই একই—সব রকম ক্ষুধাই নষ্ট করে দেওয়া, গণতান্ত্রিক ও মানবিক অনুভূতিগুলিকেই অসাড় করে দেওয়া, মনটাকেই বদলে দেওয়া। এই অবক্ষয়ী সমাজ যে 'অবাধ স্বাধীনতা' বা 'মুক্ত দুনিয়া'র কর্মসূচী রাখছে তা হল, নরনারীর প্রেমের গুরুত্ব ও মূল্যবোধ থেকে মুক্তি, জননী হওয়ার দায় থেকে মুক্তি এবং যৌন সম্ভোগের অবাধ স্বাধীনতা। আজ সাম্রাজ্য-বাদী ঘাতকশ্রেণীর কাছে এটাই 'বিকল্প সমাজ' যা সমাজতান্ত্রিক বিকল্প সমাজের চাহিদা ও দাবি থেকে জনগণকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশলী লাইন।

ক্ষয়রোগে আক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা বিজ্ঞাপন, পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র, নাটক ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলিকে নিও-ফ্যাসিস্ট কায়দায় এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যাতে প্রায় গোটা সমাজটাই এই ধরনের বিকারের তাড়নায় উগ্র হয়ে উঠেছে। মদের সঙ্গে যেমন চাট, পূজোর সঙ্গে যেমন পুরুত, তেমনি মূল্যবোধহীন পাশবিক যৌনসম্ভোগের সঙ্গে নাইট ক্লাব ও ব্রথেল ইত্যাদিতে পপ, ক্যাবারে, রক অ্যাণ্ড রোল, শেক, ক্যান্‌ক্যান ইত্যাদি ভয়ংকর-ভাবে ব্যাপক ও শিকড়সঞ্চারী হয়েছে। মহান চিলীয় কবি পাবলো নেরুদা তাঁর 'কবিতা ও দুর্বোধ্যতা' প্রবন্ধে বলেছেন: "আমার বিশ্বাস পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়নীতি আজ গভীর সংকটে নিমজ্জিত…হলিউড আজ জনসাধারণকে লোভ দেখানোর জন্য এবং সিনেমা-দর্শকদের মনকে নির্দয়ভাবে আচ্ছন্ন রাখার জন্য বলতে গেলে একমাত্র নগ্ন নারীদেহ ও খুন-সন্ত্রাসের বেসাতি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচারিত সাময়িকপত্র, অসুস্থ শিশুসাহিত্য ও গোয়েন্দা কাহিনীগুলি সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। এই বেনিয়াসুলভ আক্রমণের মুখে পড়ে আমাদের নিজস্ব দেশীয়

সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও সুস্থ অভিব্যক্তিগুলি ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।" আমাদের মত সামন্তবাদী অবশেষের সঙ্গে যুক্ত দেশী-বিদেশী পুঁজির আধিপত্যে গড়া অপূর্ণ ও রুগ্ন সমাজে সাম্রাজ্যবাদী 'সাহায্য' ও সহযোগিতা' ছেড়ে কথা কইছে না। এই ধরনের উপনিবেশতন্ত্রের পাহারা লাগাতে বিপুল পরিমাণে আমদানি হচ্ছে প্রায় নগ্ন নারীদেহের বিচিত্র লীলাভঙ্গি সম্বলিত 'নাইট ক্লাব' সিরিজের, 'ওম্যান অব দি ওয়ার্ল্ড' সিরিজের, স্পাই সিরিজের এবং যুদ্ধ সিরিজের ছবি। এই সব ছবিতে খুনী প্রতারক গুণ্ডা সমাজবিরোধী নায়কদের কার্যকলাপকেও আদর্শায়িত করা হচ্ছে, পারমাণবিক যুদ্ধের যুগে মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার—এই ধরনের বক্তব্য রেখে মুক্তিযুদ্ধের আবেগকেও ভোঁতা করে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে স্তালিনোত্তর সোভিয়েত রাশিয়াও পিছিয়ে নেই। এই পর্বে তোলা 'ফরটি ফার্স্ট', 'ক্লিয়ার স্কাই' ও 'ব্যালাড অব এ সোলজার' ছবিতে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে বুর্জোয়া উদারনীতি ও ব্যক্তিগত প্রেম ঢুকিয়ে বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধের প্রবণতাকে থিতিয়ে দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ আইজেনস্টাইন ও ডবঝেঙ্কো ও গোর্কি প্রমুখ মহান স্রষ্টাদের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ঐতিহ্য থেকে শিল্প-সাহিত্য সহ জীবন-চর্যার সকল ধারাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কেবল সিনেমাতেই নয়, সোভিয়েতের সাম্প্রতিক (ষাটের দশক থেকে) গল্প-উপন্যাসেও এই রকম হতাশা, সব রকম যুদ্ধ সম্পর্কে (মুক্তিযুদ্ধ সহ) বিতৃষ্ণা, আত্মকেন্দ্রিক যৌনসর্বস্ব প্রেম ও তার জন্য রোমান্টিক বিষাদ এবং সেই বিষণ্ণতার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে। এইগুলি তাদের বিভিন্ন এজেন্সি মারফত নানা দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল 'সাহায্যপ্রাপ্ত' দেশের পাঠক সমাজেও ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি শিশুদের জন্যেও যে সব কম দামী বই বাজারে ছেয়ে গেছে, সেগুলিতে কি নিস্তালিনীকরণের আগেকার 'বালিকা টোনি', 'শিশুরা' কিংবা 'আমার সোভিয়েতের মানুষ' ধরনের ইতিবাচক অনুভূতির স্বাস্থ্যকর গল্প পাওয়া যাচ্ছে? আদৌ তা নয়। অধিকাংশই বিষণ্ণ ও নেতিমূলক অনুভূতির ছোটদের গল্প। বাবা গত যুদ্ধে (ফ্যাসিবাদী জার্মানির বিরুদ্ধে) মারা গেছে। সে জানে না। মা চাকরী করে গ্রামীণ শহরের এক অফিসে। পাড়ার কমবয়সী ছেলেরা তাকে খেপায় তার বাবা নেই বলে। সে বিষণ্ণ হয়—এইরকম সব ক্ষতিকর গল্প। অথচ এইরকম গল্পের লেখকরাই এখন লেনিনের নামাঙ্কিত পুরস্কার পাচ্ছেন। অনুমান করা যায়, কোন্ সমাজের ফসল এইসব গল্প, কোন্ সমাজের 'উপযুক্ত নাগরিক' করার প্রয়াস! মার্কিন লেখক জন স্টেনবেক যে মূল্যবোধের সুরে ও প্রেরণায় এক সময়ে 'গ্রাপ্‌স অব রথ'-এর মত উপন্যাস লিখেছিলেন,

সেই তিনিই শেষ দিকে ভিয়েতনামের বুকে বোমাবর্ষণকারী মার্কিন যুবকদের মধ্যে 'আদর্শ নায়ক' দেখেছেন। 'বাইসাইকেল থিভ'-এর স্রষ্টা ভিত্তোরিও দি সিকা পঞ্চাশের দশকে এমন সব ছবি করতে লাগলেন, যা তাঁর করা উচিত নয় বলে নিজেই সমীক্ষা করেছেন। আমাদের দেশে 'বি টি রোডের ধারে', 'গঙ্গা' ধরনের উপন্যাসের লেখক শেষ পর্যন্ত 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'মানুষ' নিয়ে নর্দমার পাঁক ঘাঁটাকেই সার করলেন। তাও আবার বিকারকে বিকার না বলে তাকেই বাস্তবসত্য বলে জাহির করতে সচেষ্ট।

একটু খতিয়ে দেখলে, সাধারণতঃ কেন এমনটা হয় বোঝা যায়। সমাজের যে শ্রেণীশক্তি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের পালাবদলে নেতৃত্ব দেয়, সেই শক্তি-চক্র সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সমর্থন পাওয়ার জন্য বেশ কিছু আশা, বিশ্বাস ও মুক্তির তত্ত্ব-দর্শন বানিয়ে বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে ছড়ায়; স্বভাবতই পুরনো কায়েমী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের পর্বে নতুন পরিবর্তনকামী শক্তির পক্ষে শিল্পী-সাহিত্যিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও যোগ দিয়ে নিজেদের মধ্যেকার জড়ত্ব, দ্বিধা ও আত্মশাসনের যন্ত্রণা কাটিয়ে নতুন স্বপ্ন ও বিশ্বাসের নৈতিক মূল্যবোধে নিজেদের সৃষ্টি ও ভূমিকাকে সজীব করে তোলেন। পরে যখন সেই শ্রেণীশক্তি ক্ষমতায় কায়েম হয়ে মুখোশ খুলে ফেলে ও মানবিক বিবেক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে পদদলিত করে, তখনই নেমে আসে নৈরাশ্য, অনিশ্চয়তা, ক্লীবত্ব ও ধ্যান-ধারণার বন্ধ্যাত্ব। এই কারণেই ১৮৪৮ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের পটভূমিকায় এমিল জোলা, বোদলেয়ার ও ভেরলেইন প্রমুখ যে সব কবি ও কথাশিল্পীরা শ্রমজীবী মানুষের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরাই আবার উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরের নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিজেদের ডুবিয়ে দিলেন। ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের পর্বে র‍্যাঁবো ও গর্গ্যাঁ প্রমুখ যে কবি শিল্পীরা কমিউন-চেতনাকে নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে অবারিত করেছিলেন, তাঁরাই আবার ব্যর্থ-বিপ্লবের আঘাতে দাঁড়াতে না পেরে তলিয়ে গেলেন। অথচ এই পর্বেই আমরা স্তেফান জাইগ, আঁরি বারবুস, পল রবসন ও রলাঁকে পেয়েছি; পেয়েছি বিপ্লবী শ্রমিক-কবি ইউজেন পতিয়ের ও ল্যাংস্টন হিউজকে। আমরা দেখেছি গোর্কির প্যাভেল ('মা' উপন্যাসে) প্রথমে বুর্জোয়া অভ্যাসের মধ্যেই ছিল; ক্রমে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে মিলে মানুষ হিসাবেই বদলে গেল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কংক্রীট' গল্পের রঘু এমনই একটি বিপ্লবী শ্রমিক চরিত্র।

উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৭ সালের পর নতুন পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ

বেশ কিছু রাজনীতিবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। তাঁরা জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ধারা থেকে সরে গিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদ লেখক শিল্পীদের শোষিত ও সংগ্রামী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্বর বানায়; আর মার্কসবাদ তাঁদের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও সংগ্রামী ধারার সঙ্গে মিলিয়ে মানুষ হিসাবেই বদলে দেয়, বিপ্লবী মানবতায় জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া কোন সমাজে শুধুই নেতি আর নেতি, এটা কখনই হতে পারে না; সংখ্যায় কম হলেও, যাঁরা মানুষের গণতান্ত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধে শ্রদ্ধাশীল, সেইসব লেখক শিল্পীরা সাহিত্য সংস্কৃতির উত্তরণের সংগ্রামে মূল্যবান অবদান রাখেন। সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় সাময়িকভাবে বাস্তব হলেও, এটা বাস্তবসত্য বা মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে গত শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকে শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের মহান চার্টিস্ট আন্দোলনকে বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী সমাজের অন্যান্য সুবিধাবাদী ও কায়েমী স্বার্থ-চক্রকে দলে নিয়ে ভয়ংকর দমন-পীড়ন চালিয়ে প্রায় ধ্বংস করে এনেছে এবং চারিদিকে যখন নৈরাশ্য ও মূল্যবোধ-হীনতার শ্মশান বিরাজ করছে, তখনই চার্টিস্ট শ্রমিক কবি উচ্চারণ করেছেন: 'অহো! কালো রাত্রি সরে যাচ্ছে; সূর্যোদয়ের কাল আসন্ন।' এই তো মহান সৃষ্টি! এই তো সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য! এই ঐতিহ্যই দেখেছি, ১৮৭৬ সালে রচিত পতিয়েরের 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত'-এ; আর এরই উত্তরসাধনা ঘটল রুশভূমির মহান নভেম্বর বিপ্লবে। যে সময়ে ডস্টয়ভস্কি ও ভিনিচেস্কোরা 'স্তোলিপিন প্রতিক্রিয়া'র (১৯০৫-৭ পচা-গলা অপসাহিত্যের ইন্ধন যোগাচ্ছেন, সেই নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ করে ম্যাক্‌সিম গোর্কি গাইলেন 'ঝড়ের পাখির গান', আর ঘোষণা করলেন 'মা'র বিপ্লবী অভিযানের অমর বাণী।

দুই

রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে পদ্ধতি প্রকরণের ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদ ও সংশোধনবাদ যমজ ভাইয়ের মত গলাগলি করে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লাতিন আমেরিকায় নাৎসি জার্মানির 'সাংস্কৃতিক' অনুপ্রবেশের সমান্তরাল পদক্ষেপ হিসাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 'সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিভাগ' খোলেন, এরপর ১৯৪১ সালে মার্কিন যুদ্ধ দপ্তরের হাতে (সামরিকীকৃত অর্থ-নীতির প্রয়োজনে) সমস্ত সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলি চলে যায় এবং সেই থেকে 'ভয়েস অব আমেরিকা'র মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের 'সাংস্কৃতিক মিশন' দুনিয়ার

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার সম্বন্ধে নিপীড়িত জনগণের মহান সঙ্গীতশিল্পী পল রবসন তাঁর 'ফ্লাড লাইট অব পিস' প্রবন্ধে বলেছেন : "এখানে আর একটি আমেরিকা আছে যার কণ্ঠস্বর ভয়েস অব আমেরিকায় শোনা যায় না।" এই জালেরই সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে 'স্মিথ মুন্দ অ্যাক্ট'-এ, ১৯৫৩ সালের 'ইউসিয়া'তে (United States Intelligence Agency) এবং অবশেষে সি. আই. এ., ইউসিস প্রভৃতি। ওরা এখন ভাবছে, দেশে দেশে ইস্কুল গড়ার চেয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভিন্ন মনের কমপিউটার বানানোর কাজে টেলিভিশন সেট বেশী ও দ্রুত ফল দেয়। অল্ডাস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' উপন্যাসে যেমন ঘুমের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ যোগে মন বদলানোর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, এই সব সাম্রাজ্যবাদী নয়া ফ্যাসিস্ট প্রচার-যন্ত্রগুলি তেমনি উন্নত ধরনের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাকে জাতীয় ঐতিহ্য, মানবতা ও সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ চালানোর কাজে লাগাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের সংস্কৃতি-ধর্ষণ শুরু হয়েছিল ১৯২৭—১৯৩৭ সালের মধ্যে প্রধানতঃ ইতালি ও জার্মানীর ফ্যাসিবাদী পর্বে; ইতালির 'ড্যুচে' ও জার্মানির 'ফুয়েরার'-এর আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য জঙ্গলে, নয়ত কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; যৌন-বিকার, উদ্ভট অলৌকিকতা, মানুষ, সভ্যতা ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বাসহীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়ই তখন চিরন্তন ও মহান বলে প্রতিফলিত ও প্রচারিত হয়েছে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লোপ করে করে এই ছাঁচে ঢালাই করার কারখানা ছিল জার্মানির রাইখস্টাগ সংস্কৃতি দপ্তর। যেমন এই দপ্তর 'প্রগতিশীল', তেমনি এরই গর্ভ থেকে জন্মানো ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর আমলের 'ফালাঙ্গ' হয়েছিল 'আধুনিক', যা দুঃখ-নৈরাশ্যের জলাভূমিতে কাদা পায়ে হেঁটে যাওয়াকেই একমাত্র সত্য বলে প্রচার করেছিল। এইসব ফ্যাসিবাদী লেখকরা বলে : 'এই ঘিন্‌ঘিনে বাস্তবতার সঙ্গে যতদিন না আমরাও শেষ হচ্ছি, ততদিন সুখ নেই; বাস্তবতাই হল পাগলামি' (লোলা এসপোজা অন্‌সারে); 'যতদিন জগৎটা জগৎ থাকবে ততদিনই জনগণের মন প্রতিহিংসাপরায়ণ, জান্তব ও অকৃতজ্ঞ থাকবে' (লা আলসারে)। এই সব 'প্রগতিশীল' ও 'আধুনিক' উপাদানের প্রভাবে আমাদের দেশেও কি অন্তঃশীলা অরণ্যের দিন রাত্রি ও ঘুণপোকা ধরনের কাহিনী তৈরী হচ্ছে না? এবং এগুলি সিনেমায় তুলে কি প্রচার করা হচ্ছে না? আমাদের মত আধা-সামন্ততান্ত্রিক অপূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভয়াবহ রকমের বেকার, গরিব ও নিরক্ষর জনসাধারণের উপর এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ফল কী মারাত্মক ও শিকড়সঞ্চারী হতে পারে তা ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়।

আমরা লক্ষ্য করছি, নয়া-ফ্যাসিবাদী অপসংস্কৃতির বিষাক্ত গ্যাসে ইতালির সাহিত্য চলচ্চিত্রে তৈরী হল 'নয়া বাস্তবতা'। তাই ফেলিনি তাঁর 'দি রোড' ছবি সম্পর্কে বলেন : "বর্তমানে মানুষের দুর্ভাগ্য তার নিঃসঙ্গতা। এর শিকড় অনেক গভীরে। এর নিরাময় আর এক নিঃসঙ্গতার শিকারের সঙ্গে মিলন।" কিছুদিন আগে ফরাসী 'নিউ ওয়েভ'-এর প্রখ্যাত চলচ্চিত্র স্রষ্টা আলা রেঁনের 'হিরোসিমা মন আমোর' দেখলাম। এটি আত্মকেন্দ্রিক ও বিষণ্ণ যৌন অনুভূতির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকে ঘুলিয়ে দেওয়ার এক ভয়ংকর প্রতিক্রিয়াশীল ছবি।

এই ধরনের অনেক ছবির সঙ্গে কামু-হামসুনীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই আমাদের এখানে তৈরী হচ্ছে আপনজন, যদুবংশ, প্রজাপতি, পাতক, পাতালে এক ঋতু, মানুষ ইত্যাদি সাহিত্য ও চলচ্চিত্র। এখানে 'বারবধূ'র মতো অশ্লীল নাটক ছশ' রাত পেরিয়ে যায়, বিষ ও ব্যভিচারের মত নাটক দিনের পর দিন 'হাউস ফুল' যায় ; এস্ট্যাবলিসমেণ্টের শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা সার্টিফিকেট দেন এবং সুস্থ সংস্কৃতির বিবেকী শিবির থেকে প্রতিবাদ হলে প্রতিক্রিয়ার মৌচাকে ঢিল পড়ে। বন্ধুর কাছে শুনে কী ধরনের অপসংস্কৃতি পেশাদারী নাট্যমঞ্চে চলছে তা দেখার জন্যে সেদিন সারকারিনায় 'অগ্নিবন্যা' দেখলাম। সেখানেও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী ঘটনার সঙ্গে ক্যান্ ক্যান্ নাচের রগরগে যৌন-পসরা! এর সঙ্গে আনন্দলোক, অপরাধ, জীবনযৌবন, সচিত্র যৌনকথা ও ক্রাইম ইত্যাদি অপসংস্কৃতিমূলক পত্রপত্রিকা বৃহৎ পুঁজিপতিদের মদতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে এবং গ্রাম-শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অভাব ও বিষাদের শূন্যস্থানে ঢুকে পড়ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সাহিত্যে শিল্পে যদি বুর্জোয়া ও ভূস্বামী শিবিরের অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতনের ছবি দেখানো হয়, তাতেও কিছুটা কাজ হয়, অবশ্য যদি সেই সঙ্গে শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত চরিত্রের নৈতিক বা মানসিক শক্তির পরিচয় দেখানো হয়, তবেই। কিন্তু এ ব্যাপারে 'বুর্জোয়া ডিম থেকে বেরনো হলুদ ঠোঁটওয়ালা চালাক পাখি'দের (লেনিন) সম্পর্কেও সচেতন ও সতর্ক থাকা দরকার। এরা হল সংশোধনবাদী চোরা বামপন্থী লেখক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর দল। এরা ছাঁটাই শ্রমিক কিংবা জমিহারা কৃষককে হয় পেটি-বুর্জোয়াসুলভ অবসন্নতার রোমাণ্টিক জলাভূমিতে, নয়ত স্থূল যৌন বাসনার পাঁকে ডুবিয়ে দেয়। লেনিনই বলেছেন : "যৌনজীবনের লাম্পট্য হল বুর্জোয়া বৈশিষ্ট্য—ক্ষয়ের লক্ষণ। সর্বহারা একটি উদীয়মান শ্রেণী। এদের পক্ষে নিস্তেজক বা উত্তেজক ওষুধের দরকার হয় না। এরা কখনই ভুলবে না—কিছুতেই ভুলবে না ধনতন্ত্রের লজ্জা ক্লেদ ও ক্রুরতা।"

তিন

কাজী নজরুল একবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'যে ল্যাজ বাইরের দিকে তা সাধারণভাবে কাটা সহজ, কিন্তু যে ল্যাজ ভিতরের দিকে তা কাটা শক্ত।' আমাদের দেশের অপসংস্কৃতি দুই খাতে চালু হয়েছে: অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের ধর্মসংস্কার, প্রথমটি বাইরের দ্বিতীয়টি ভিতরের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীসেবা' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলছেন, "মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের সহযোগিতা নিবিড় নয়, সেখানেই বর্বরতা।" এই বর্বরতা হল, ধর্মীয় ভেদ-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, অস্পৃশ্যতার ব্যাধি ও নানা রকম অন্ধ কু-সংস্কারের যোগফল। অথচ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাকে ঐতিহাসিকেরা 'স্বর্ণযুগ' বলে বর্ণনা করে বলেছেন, তখন একটা বাঁধন ছিল, একটা শৃঙ্খলা ছিল। কার্ল মার্কস কিন্তু গোটা সামন্তযুগকে 'প্রাচ্য স্বৈরাচারে'র যুগ বলে বর্ণনা করে বলেছেন: "সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ব্যবধান ও সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতা-জনিত এক ধরনের ভারসাম্য ছিল সেই সমাজ কাঠামোর ভিত্তি।" ব্রিটিশরা এদেশকে কাঁচামালের কৃষি-কলোনি বানাতে চেয়ে, গ্রামীণ লৌকিক ভিত্তিটা সরিয়ে দিলেও, সনাতনী সামন্ততান্ত্রিক ভিত সংগঠিত করল এবং তার উপরিথাক পরিকল্পিতভাবেই বজায় রাখল। অর্থাৎ পরবর্তী ঐতিহাসিক স্তরের বা বুর্জোয়াতন্ত্রের স্বাভাবিক ও দ্রুত বিকাশ সম্ভব হল না। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও এই মিশ্র-অর্থনীতির জেরই চলছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবটা পর্যন্ত সম্পন্ন হল না। আজ আমাদের দেশে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন ও বড় বড় ভূস্বামীদের সম্মিলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারসাজিতে দুর্দশাগ্রস্ত ও অর্ধভুক্ত ক্ষেতমজুর, বেগার শ্রমিক ও মজুর মধ্যবিত্ত অংশের বেকার যুব সমাজ এমনই ক্ষয়শীল ও বিচ্ছিন্ন যে সেই ফাঁক ভরানোর জন্যে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী অপসংস্কৃতি একই সঙ্গে নানা ভঙ্গিতে যোগান দেওয়া হচ্ছে। আজও হরিজনদের লিঞ্চিং হচ্ছে, ধর্ম সম্প্রদায় ও ভাষা নিয়ে মারামারি হচ্ছে, শনি মনসাপূজোর চাঁদা না দিলে বোমা পড়ছে ও ছুরি চলছে এবং 'ভোলে বাবা পার করেগা'ওয়ালাদের জন্য দিশি মদ আর নারীদেহের ব্যবসা বেড়ে গেছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এদের চটি বা চাকিগুলোর পাশাপাশি দিশি মদের দোকান থাকছে আর জুলি-জগন্নুর গান লাউড স্পীকার ফাটাচ্ছে।

পশ্চিমের অবক্ষয়ী সমাজে যখন অপসংস্কৃতির চাষ হচ্ছে তখন বুঝতে হবে

সংশোধনবাদের জমি তৈরী হচ্ছে ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ঠেকানোর ব্যবস্থা হচ্ছে ; কারণ, সামন্ততান্ত্রিক ভিত, ও তার উপরিথাক সাধারণভাবে উচ্ছেদ হয়েছে ; অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আমরা চলেছি অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে, সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পটভূমিকায় সম্পন্ন করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়ে ; এই স্তর জনগণতান্ত্রিক-বিপ্লবের স্তর। এখানে শুধুই মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়, এখানে খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা সহ নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের বিকল্প হিসাবে অপসংস্কৃতিকে কাজে লাগাতে দেশ ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থের চক্র তৎপর হয়ে উঠেছে। এখানে সত্তর শতাংশ নিরক্ষর ও অর্ধভুক্ত জনগণকে অবিরাম হরি-সংকীর্তন কিংবা শনি মনসার নেশায় আচ্ছন্ন রাখার জন্য জমিদার-জোতদাররা তো বটেই, সেই সঙ্গে মার্কিনী সংস্থা-গুলিও অঢেল টাকা ছড়ায় ; বৈষ্ণবী হিপিচক্র ও সাঁইবাবা তো এদেরই অবদান ! সবচেয়ে মারাত্মক খেলা চলেছে বেকার যুবকদের নিয়ে, কখনো তাদের হাতে মদের বোতল আর পিস্তল তুলে দিয়ে 'রাজনীতি' করাচ্ছে এবং বলছে—তোরাই হলি 'জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক' ; কখনও বা পাড়ায় পাড়ায় সার্বজনীন পূজায় টাকা ঢেলে এদের দিয়ে 'হাজার বছরের ধর্ম' জাগিয়ে তুলছে।

আর একটি ব্যাপার ঘটে চলেছে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে গত তিরিশ বছরের উত্তর সাধনায় অর্থাৎ সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় জাতীয় ইতিহাসের বিকৃত সাধন ; উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা আর ব্যক্তিপূজার মাল-মশলায় বানানো হয়েছে এই সব ইতিহাস। স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানকে এমনভাবে শেখানো হচ্ছে, যাতে সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কে কোন মৌলিক বোধ না জাগে ; তাই বিজ্ঞানের ছাত্ররাও কাঁধে বাঁক নিয়ে ছোটে ; এমন কি শিক্ষক-অধ্যাপকরা পর্যন্ত সাঁইবাবার কিংবা সন্তোষী মা'র শিষ্য হয়ে যায়।

চার

যোশেফ স্তালিন তাঁর 'মার্কসবাদ ও ভাষা সমস্যা' বইতে বলেছেন : "সামাজিক ভিত হল সমাজ বিকাশের কোন এক স্তরে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ; আর উপরিথাক হল সেই সমাজে রাজনৈতিক, আইনী, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। প্রতি ভিতেরই নিজস্ব উপরিথাক তৈরী হয়। সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর গড়ে উঠেছে তারই নিজস্ব উপরিথাক, নিজস্ব রাজনৈতিক, আইনী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং তারই সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। পুঁজিবাদী ভিতেরও নিজস্ব উপরিথাক আছে ; তেমনি সমাজতান্ত্রিক

ভিতেরও তা রয়েছে। যদি ভিত বদলে যায় বা তাকে উৎখাত করা হয়, তবে তার পিছনে পিছনে তার উপরিথাকও বদলে যায় এবং আগের গুলিকে উচ্ছেদ করা হয়।" অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এই নিয়ম যান্ত্রিকভাবে চলে। উপরিথাক ভিত-নির্ভর বলেই যে ঠুঁটো জগন্নাথ, তা নয়। সেগুলি তার অর্থ-ব্যবস্থা ও শ্রেণীসম্পর্কের ব্যাপারে আদৌ উদাসীন থাকে না, নিষ্ক্রিয় থাকে না। উন্মেষের পর ক্রমে এই উপরিথাক সমগ্রভাবে একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয় এবং তার মধ্যেকার ইতি-নেতির লড়াই বাধে; তখন এক অংশ স্থিতাবস্থা রাখতে, অপর অংশ সমাজবিকাশের পরবর্তী স্তরের মাল-মশলার যোগান দিতে কোমর বেঁধে লাগে। স্তালিনেরই ভাষায় এই 'নতুন ভিত গড়ার সাংস্কৃতিক ইন্ধন' যোগানোর সংগ্রামে আমাদের বামপন্থী ও প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট সচেতন ও সংগঠিতভাবে কাজ করে চলেছেন। সেই সঙ্গে যাঁরা মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে কাজে স্বৈরতন্ত্রের পূজা করছেন ও শ্রমিক-শ্রেণীর গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙছেন, সেই সব ভণ্ড সমাজতন্ত্রী বা চোরা বামপন্থীদের সম্পর্কেও জনগণকে সচেতন করার কর্মসূচী নিয়েছেন।

আমাদের দেশের সাম্প্রতিক অপসংস্কৃতি হল অবক্ষয়ী একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও আধাসামন্ততান্ত্রিক ভিতের উপরিথাক। এগুলি প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে।

কাজেই এই ভয়ংকর ও শিকড়সঞ্চারী অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামটা কি ভাবে চলছে ও চলবে? প্রধানতঃ দুই ধারায় তা চালানো দরকার: একটি সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা আলোচনা, মিছিল-পথসভা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে অপসংস্কৃতিকে চিনিয়ে বুঝিয়ে তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের কাজ, ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ; এবং অপরটি হল, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ সৃজনশীল রচনা ও শিল্পে ব্যাপকভাবে প্রচারের কাজ। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রেরও একচেটিয়া পুঁজির অর্থনীতি আজ অবক্ষয়ের সংস্কৃতি ছাড়া কিছুই দেবে না ও দিতে পারে না। শুধু তাই নয়; সকল রকম সুস্থ, জীবনমুখী ও সক্রিয় স্বপ্ন-কল্পনার শিল্প-সংস্কৃতিকে দাবিয়ে রাখতে ও হটিয়ে দিতেও উদ্যত। কাজেই বাগানে আগাছায় ভরে গেছে বলে শুধুই চিৎকার জুড়লে কিছু হবে না; সেই সঙ্গে ভাল ভাল গাছ লাগাতে হবে, সবাই মিলে চাষে নামতে হবে; আগাছা তাতেও কমে যাবে অনেকটা।

বলা বাহুল্য, এ কাজে সাংস্কৃতিক কর্মীদের জনগণের দুঃখ-বেদনার গায়ে কেবল

হাত বুলোলেই চলবে না, তাঁদের সমস্যা ও সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ হতে হবে এবং তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে সৃজনশীল সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

আজ যখন আমরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা বলি, তখন শিল্প-সাহিত্যে গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের কথাই বলি। মানবসংস্কৃতির অতীত যুগ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে সব মহৎ গুণ ও মূল্যবোধ মানুষ আজ পর্যন্ত বহে এনেছেন তাকে আজকের এই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে পরিচালিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে সঠিকভাবে উন্নত ও প্রসারিত করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও উত্তরণের সংস্কৃতিই আজকের প্রকৃত সংস্কৃতি।

অপসংস্কৃতি রোধে নারীসমাজের দায়িত্ব

কনক মুখোপাধ্যায়

এক

আজকাল সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নিয়ে চারিদিকে খুব আলোচনা চলছে। চলবেই। কারণ বহু প্রাচীনকাল থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে আমাদের দেশের। এ দেশের গণজীবনে শিল্পসংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। গভীর সংবেদনশীল, ভাবপ্রবণ এ দেশের প্রকৃতি ও মানুষ। বস্তুর চেয়ে ভাবকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা, কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা। ভাবজীবনের অনুশীলনে অভ্যস্ত আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশের গ্রাম-প্রধান, শিল্পে অনগ্রসর সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে শাসিত মানুষ। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই শিল্পসংস্কৃতির গভীর প্রেরণা রয়েছে। তাই এখানে সম্প্রতি সংস্কৃতি জগতে যে সংকট দেখা গিয়েছে, তাতে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন সুস্থরুচিসম্পন্ন সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষ। দেখতে দেখতে বিগত কয়েকটি বছরের মধ্যে গ্রাম শহরের ব্যাপক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে নানা রকম অশ্লীল দেওয়াল পোস্টার থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের সিনেমা, নাটক, বটতলার নভেল, যৌনবিকৃতিসূচক বিজ্ঞাপন, নাচগান, রুচিহীন পোশাক-আশাক ইত্যাদি। এগুলি সব অপসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক। অবশ্য অপসংস্কৃতি যে শুধু এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই নয়। সংস্কৃতির মধ্যে সভ্যতার রূপটি বিধৃত হয়। আর যা কিছু আমাদের মনকে নীচে টেনে নামায়, সমাজের স্বার্থবিরোধী কাজে প্রবৃত্ত করে, সমাজ-প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাকেই আমরা অপসংস্কৃতি বলতে পারি। চোরাকারবারী মুনাফাখোরীর কাজ, খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কাজ, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করার কাজ, জনগণের উপর শোষণ পীড়নের কাজও ব্যাপক অর্থে অপসংস্কৃতির পরিচায়ক। কিন্তু আমরা এখানে সীমিত অর্থে 'সংস্কৃতি', অর্থাৎ 'কালচার' বলতে ব্যবহারিক অর্থে যা বোঝায়, সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছি।

এই অপসংস্কৃতিই এখন আমাদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের একাংশের উপর এর প্রভাব পড়েছে মারাত্মকভাবে। তাদের কাছে মিথ্যাচার, জাল জুয়াচুরি থেকে পরীক্ষায় টুকে পাস করা, নানা রকম সমাজবিরোধী কাজে প্রবৃত্ত হওয়াটা যেন একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে

গেছে। স্বাধীন প্রেমের নামে তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে নৈতিক অধঃপতন বা যৌনবিকৃতি ঘটছে। ছায়াছবি ও রঙ্গমঞ্চে নগ্ন নারীর নৃত্য, নারী-দেহের কদর্য বিজ্ঞাপন, গান-বাজনায় অসভ্য কুরুচিপূর্ণ যৌন জীবনের প্রচার, গল্প উপন্যাস সাহিত্যে নাটকে সমাজবিরোধী, ভ্রষ্ট দুরাচারদের নায়ক-নায়িকা করে তুলে ধরে তাদের প্রতি মোহ সৃষ্টি করা প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিল্পপ্রধান দেশের বিশেষ করে মার্কিনী 'সভ্যতা'র অনুকরণে এ সব জিনিস বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে ছেয়ে গেছে। এমন কি অনেক তরুণী মেয়েরা পর্যন্ত চুরি, চোরাকারবারি, দেহ ব্যবসার মত হীন কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এ সব অনিবার্যভাবেই হয়েছে ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণীর আনুকূল্যে ও প্রশ্রয়ে। বিগত বৎসরগুলিতে ক্ষয়িষ্ণু ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেসী শাসক-গোষ্ঠী নিজেদের অবক্ষয়ী অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য মরিয়া হয়ে যে সব জন-বিরোধী দুর্নীতির পথ গ্রহণ করেছে, অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা তার মধ্যে অন্যতম। তাদেরই প্রয়োজনে ও পরোক্ষ প্রশ্রয়ে শিক্ষা কৃষ্টি জীবিকার স্বাভাবিক ভদ্র উপায় থেকে বঞ্চিত অগণিত তরুণ-তরুণীর দল ভীড় করেছে অশ্লীল ছায়া-ছবির লাইনে, ওয়াগন ভাঙার চক্রান্তে, চোরা চালানের কারবারে, বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের উপর আক্রমণ করার, লুঠতরাজ, রাহাজানির কাজে। এই অপসংস্কৃতি রাজনৈতিক সামাজিক সংকটেরই একটি দিক।

অপসংস্কৃতির সামাজিক কারণগুলি আমাদের অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। দেখা দরকার এর কেন্দ্রগুলি কোথায়, আর কোন্ বিষয়গুলির মধ্যে অপসংস্কৃতি প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করে। তাহলেই আমরা দেখতে পাব যে নারীদের নিয়ে যৌনবিকৃতির একটা নরক সৃষ্টি করা অপসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বিষয়। নারীকে যখন কেবলমাত্র পুরুষের যৌনকামনা চরিতার্থ করার উপায় হিসাবে দেখা যায়, নরনারীর দৈহিক মিলনের রসকেই যখন একটা সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়, তখন অপসংস্কৃতি চরমে ওঠে। চিত্রশিল্পে, ছায়াছবিতে, সাহিত্যে কাব্যে ক্লেদাক্ত তলানিগুলি ভেসে ভেসে ওঠে। নারী-পুরুষের মধ্যে কী সম্বন্ধ? নারী কি পুরুষের দাসী? ভোগলালসার সামগ্রী? কেনা গোলাম বা সম্পত্তি? না, ব্যবসায়ের পণ্য? না, সমমর্যাদার কর্মসঙ্গিনী? না, দেবী, না কি? এসব প্রশ্ন রয়েছে শিল্প সংস্কৃতির রূপের মধ্যে। নারীদের নিয়ে ব্যবসা, ভ্রষ্টা নারীদের কাহিনী, বিকৃত 'মুক্ত' যৌনজীবনের প্রলোভন, নারী-দেহকে বাজারের পণ্যের সম্ভার করে রঙচঙে করে সাজিয়ে ব্যবসা করা—এগুলি পাশ্চাত্যের সবচেয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির—ইউরোপ আমেরিকার

দেশগুলির বৈশিষ্ট্য। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একদিক থেকে যেমন উপর উপর আনুষ্ঠানিকভাবে নারীর সমানাধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে, অন্যদিক থেকে নারীদেহকে পূর্ববর্তী যে কোনো সমাজব্যবস্থার চেয়ে আরো উৎকটভাবে লেনদেনের পণ্যে পরিণত করা হয়। বেশ্যাবৃত্তি, নগ্ননারীর নৃত্য, প্রকাশ্যে উলঙ্গ নরনারীর যৌনমিলনের বিজ্ঞাপন ও প্রচার—মদ্যপ, দুর্নীতিগ্রস্ত বিকৃতরুচি সম্পন্ন বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুচরদের কাছে স্বাভাবিক সামাজিক প্রয়োজন। নারীর চরম অপমান, হীন অবমাননা ছাড়া কোন দেশে অপ-সংস্কৃতি দানা বাঁধতে পারে না। এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই দেখতে পাই। আন্তর্জাতিক সাহিত্য শিল্পের আলোচনা করলেও আমরা এ সত্যটি দেখতে পাব। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষকে অধঃপতনে নিয়ে যাবার জন্য মূলতঃ যে দুটি প্রলোভনের কথা সকলেই জানে তা হল 'অর্থ' ও 'নারী'। এদের দিয়ে সমাজকে দূষিত, ব্যাধিগ্রস্ত করে যুবকদের সংগ্রামবিমুখ, সমাজ-বিরোধী করে পুষ্ট করা অবক্ষয়ী বুর্জোয়া শাসকদের হাতে ক্ষমতায় টিকে থাকার অস্ত্রবিশেষ। অপসংস্কৃতি রোধে নারীসমাজের দায়িত্বের কথা আলোচনা করতে গেলে এই গোড়ার কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার।

দুই

এখন দেখা যাক কোন্ সমাজ নারীদের কী দৃষ্টি দিয়ে দেখে। নরনারীর সম্বন্ধ বিষয়ে বিভিন্ন সমাজের কী ধারণা। সেই ধারণাই তো মানুষের বাস্তব জীবনে, চিন্তায়, আবেগে অনুভূতিতে প্রকাশিত হয়েছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ও মানসিক অভ্যাসের মধ্যে গেঁথে গেছে। আর সেই ধ্যান-ধারণাই ফুটে উঠেছে সমসাময়িক শিল্পসাহিত্যের মধ্যে

পুরুষশাসিত, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীদের পুরুষের তুলনায় হীন ধরে নিয়েই স্ত্রীস্বাধীনতা বা নারীর অধিকারের কথা বলা হয়ে থাকে। তাই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিল্প-সংস্কৃতি যতই প্রগতিশীল হোক নারীদের সম্বন্ধে ধারণা সীমাবদ্ধই থেকে যায়। নারী-পুরুষের মধ্যে এই তারতম্য যে একটা প্রকৃতির নিয়মে কোন শাশ্বত জিনিস নয়, এটা যে মানুষের সৃষ্ট, সমাজের মূল অর্থ-নৈতিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই বৈশিষ্ট্য, সে কথা সর্বপ্রথম মার্কসবাদই ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করেছে। মার্কসবাদী বিশ্লেষণ অনুযায়ী মানবসমাজে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে যে শ্রেণীভেদ হয়েছে, তার থেকেই নারীজাতির অবমাননা, নারীর

পারিবারিক দাসত্ব, বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেমের ভিতরকার শঠতা, নারীর পতিতাবৃত্তি—সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেছেন: "...নারীর মুক্তিলাভের প্রথম সর্তই হল এই যে, সমগ্র নারীজাতিকে আবার সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করতে হবে।..." ("...That the first premise for the emancipation of women is the reintroduction of the entire female sex into public industry"—Engels: Origin of Family, Private Property and State) কিন্তু বলা বাহুল্য যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, যেখানে গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আধিপত্য থাকে, সেখানে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত সর্বস্তরের শোষিত জনগণের মধ্যে দিনে দিনে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলে, সেখানে ব্যাপক নারীসমাজের কর্মসংস্থান বা তাদের সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে টেনে আনার প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে, শ্রেণী শোষণের অবসানের পরই নারীদের পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন সম্ভব, এবং সামাজিক মুক্তিও সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সেই শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হলে, উপরিকাঠামোতেও পরিবর্তন আসতে পারে। নারী পুরুষ প্রকৃত সমান অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রমশঃ মানুষের ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন আসে। তার প্রতিফলন পড়ে শিল্পসংস্কৃতির উপর।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীসমাজের অবস্থার তারতম্য হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপক নারীসমাজ মূলতঃ পুরুষের অধীনেই থেকে গেছে। দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ—সর্বপ্রকার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মূল কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীশোষণ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণী সংগ্রাম বিদ্যমান। কিন্তু ইতিহাস ক্রমশঃ সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। অতীতের দাসযুগ বা সামন্তযুগের চেয়ে ধনতন্ত্রের যুগ অনেক বিষয়ে উন্নত। সেখান থেকেই আমরা এগিয়ে চলেছি সমাজতন্ত্রের পথে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বুর্জোয়া নবজাগরণের জোয়ার ইউরোপের সীমানা ছাড়িয়ে এশিয়ার পরাধীন পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। নবজাগরণের যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই নারীর অধিকার, নারীশিক্ষা প্রভৃতির প্রশ্নগুলি সামনে এসে পড়ল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নটিও সামনে এসেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের উপরও প্রচণ্ড আঘাত এসেছে। মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছে স্বাধীন সত্তা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা,

নারীমুক্তির পথে এ একটি বিশেষ পর্যায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নারীর সমান অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সমান অধিকার মেলেনি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, নারীরা চেষ্টা করেছে শিক্ষায়, কর্মে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে। সামাজিক মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছে। যুগ যুগ ধরে বুকের উপর চাপানো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জগদ্দল পাথরটা নড়ে উঠেছে, কিন্তু সরে যায়নি একেবারে। নারী-পুরুষের বিবাহ ও পারিবারিক সম্বন্ধের উপর আলোকপাত হয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। নারী-পুরুষের স্বাধীন প্রেম ও বিবাহকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে, সন্তানের উপরও পিতামাতার সমান অধিকার ও দায়িত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপক নারীসমাজ সে সব অধিকারকে কাজে লাগাতে পারেনি। কারণ, তারা অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। নবজাগরণের আলোকে নারীসমাজের মধ্যেও জেগে উঠেছে নতুন চেতনা। বেড়ে উঠেছে সামাজিক পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা। সচেতন নারীদের একাংশের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রে পুরুষের কাছে দীন বশ্যতার বিরুদ্ধে জেগেছে বিদ্রোহ। নারীপ্রগতির এই প্রগতিশীল ধারা ফুটে উঠেছে এ যুগের শিল্প সাহিত্যের মধ্যে।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সীমাবদ্ধতা ও যান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের বিদ্রোহ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে সমাজতন্ত্রের দিকে। অবশেষে সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তী স্তর, সমাজতন্ত্রে এসে শোষিত মানুষের মুক্তির প্রশ্নটির সমাধান হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাধান হয়েছে নারীমুক্তির প্রশ্নটিরও।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরই আমরা সর্বপ্রথম নারী-মুক্তির পূর্ণ রূপটি দেখতে পাই। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথা ও শ্রেণী-শোষণের অবসানের পরই সম্ভব হয়েছে সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে ব্যাপক জনগণকে টেনে আনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীসমাজকেও টেনে আনা। নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তির প্রথম ও প্রধান সর্তটিই পূরণ হয়েছে আর তারপরই সম্ভব হয়েছে সামাজিক রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। তাই আমরা দেখতে পাই আজ রাশিয়া চীন সহ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রকৃতই মুক্তি হয়েছে। পৃথিবীর যে কোন্ দেশে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের, এমন কি ইউরোপ আমেরিকায় সবচেয়ে উন্নত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক

সমাজের নারীদের অবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের নারীদের অবস্থার মূলগত ও গুণগত পার্থক্য রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব হয়েছে নারীপুরুষের সমান অধিকার বাস্তবে রূপায়িত করা, সম্ভব হয়েছে তাদের সমমর্যাদার ভিত্তিতে স্বাধীন প্রেম, দাসত্ববন্ধনমুক্ত সুখী দাম্পত্যজীবন প্রতিষ্ঠিত করা। বাস্তব অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হতে শুরু করেছে উপরিকাঠামোর বা superstructure-এর, বদলে গেছে সামাজিক চেতনার রূপ, বদলে গেছে নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। নারী আর সেখানে পুরুষের দাসী নয়, সম্পত্তি নয়। নারী সেখানে শোষণমুক্ত স্বাধীন সামাজিক দায়িত্বশীল পূর্ণ মানুষ, সম্মানিত মা ভগ্নী, স্বাধীন নাগরিক, সমাজে সংসারে পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাই সেখানে নারীকে কেন্দ্র করে 'অপসংস্কৃতি'র ভিত্তিই আর নেই।

তিন

"প্রত্যেক যুগের প্রধান ধ্যান-ধারণাই হল সেই যুগের শাসকশ্রেণীর ধ্যানধারণা।" ("The ruling ideas of each age has ever been the ideas of its ruling class.") —(Marx-Engels: Communist Manifesto)

মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শিল্পসংস্কৃতিরও কোন শাশ্বত নন্দনমূল্য নেই। মানবসমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসংস্কৃতিরও বিবর্তন হয়, বিবর্তন হয় মানুষের চিন্তার, ধ্যানধারণার, অনুভূতিরও। অন্যান্য বিষয়ের মত শিল্পসংস্কৃতিও একটি সামাজিক বিষয়। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর গড়ে ওঠে—শিল্পসংস্কৃতির উপরিকাঠামো। সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে যে শ্রেণী শাসকের ভূমিকায় থাকে তাদেরই স্বার্থ অনুযায়ী যেমন আইনকানুন, রাজনীতি, সামাজিক রীতি-নীতি তৈরী হয়ে থাকে, তেমনি সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে মানুষের ধ্যানধারণা। সমাজের 'প্রভুরা' শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রভুত্ব করতে থাকে। তাই দেখি শিল্পসংস্কৃতির মধ্যে দাসযুগে যেমন প্রভুদের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, সামন্তযুগে রাজারাজড়ার কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, আবার বুর্জোয়া সমাজেও তেমনি অভিজাত শ্রেণীকেই সমাজের শ্রেষ্ঠ বলে তুলে ধরা হয়েছে গতানুগতিক শিল্পসংস্কৃতির মধ্যে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে সমাজের ন্যায় নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধের। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে চেতনার

জগতে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে মানুষের চেতনা বয়ে চলে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। বাস্তবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তার হুবহু পরিবর্তন আসে না। ক্রমশঃ পরিবর্তন আসে। মানুষের মনে বর্তমানের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে থাকে অতীতের রেশ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। আবার এই চেতনার জগতের প্রভাব পড়ে বাস্তবের উপর। তাই বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য শিল্প-সংস্কৃতির সক্রিয় ভূমিকা আছে। শিল্পসংস্কৃতি আমাদের মনে কর্মের প্রেরণা যোগায়। মহৎ কাব্য সঙ্গীত আমাদের মনে উচ্চভাব জাগায়। দেশাত্মবোধক গান গেয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে যাই। নাটক উপন্যাসের মহৎ ট্র্যাজিডি আজকের চেতনাকে পরিশীলিত করে উচ্চস্তরে পৌঁছে দেয়। নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের কাহিনী আমাদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজের অগ্রগতি হয় ধাপে ধাপে শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে। শাসকশ্রেণী যেমন সর্বক্ষেত্রে কর্ণধার হয়ে তাদের শ্রেণীশোষণ বজায় রাখার জন্য সমাজের উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করে, তেমনি শোষিত শ্রেণীর ধ্যানধারণা তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতি-ক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা অগ্রসর হতে থাকে। সমাজের কাঠামো ও উপরিকাঠামোর মধ্যে ফেটে পড়ে শ্রেণীদ্বন্দ্ব। শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম, তাদের জীবনদর্শন ফুটে ওঠে নতুন ভাবধারা, শিল্পসংস্কৃতির মধ্যে। শাসকশ্রেণী প্রভাবিত তথাকথিত প্রচলিত ভাবধারার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় শোষিত শ্রেণীর পাল্টা ভাবধারা, সংগ্রামী মানুষের মধ্যে যোগায় এগিয়ে চলার বৈপ্লবিক প্রেরণা। যেমন রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কাব্যসঙ্গীত আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে যেতে। 'নীলদর্পণ' আমাদের মধ্যে তীব্র ঘৃণা জাগিয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, প্রেরণা যুগিয়েছে সর্বশক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। গোর্কির 'মা' উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের বৈপ্লবিক চেতনাকে। সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র ও অবক্ষয়ী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে আমাদের দেশের নতুন গণ-সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে গতানুগতিক সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবযুক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবধারাকে, অভ্যুর্থনা জানিয়েছে জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে। সেই সময়ই আমরা পেয়েছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্তর মত সমাজ-সচেতন শিল্পীদের। বিগত তিন দশক ধরে, স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও তেমনি ধনিক

শ্রেণীর স্বার্থবাহী কংগ্রেসী সরকারের আমলে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে বাস্তবে ও সংস্কৃতির জগতেও। শিল্পসংস্কৃতির প্রগতিশীল শিবির বলতে আমরা তাই কায়েমী স্বার্থবিরোধী ভাবধারার শিবিরের কথাই বুঝি। শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শোষিত খেটে খাওয়া মানুষের সুখদুঃখের অনুভূতি, তাদের জীবনসংগ্রাম, তাদের অগ্রগতির সহায়ক সংস্কৃতির কথাই বুঝি। আর যে ভাবধারা অভিজাত শ্রেণীর, কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হয়, তাকেই আমরা বলে থাকি প্রতিক্রিয়াশীল। সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরেই চলে এই ভাবধারা বা সংস্কৃতির সংগ্রাম। এ হল সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী সংগ্রামেরই অংশবিশেষ। কায়েমী স্বার্থ বা বর্তমান সমাজের বুর্জোয়া ভাবধারাই প্রচার করে থাকে 'শিল্পের জন্য শিল্প' বা 'Art for Art's Sake' তত্ত্ব। অর্থাৎ তারা বলে থাকে যে উচ্চস্তরের শিল্পসংস্কৃতি হল বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, চিত্তাবনোদনের জন্য। প্রকৃতপক্ষে কোন শিল্পসংস্কৃতিই বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাস্তবেরই কোন না কোন দিকের প্রতিচ্ছবি থাকে সব রকম শিল্পের মধ্যে। ভাববাদী শিল্পেরও একটা নির্দিষ্ট দর্শন আছে, সে দর্শন উচ্চস্তরের শিল্পের নামে অনেক সময়ই অনেক বাস্তব বিষয়ের মধ্যে—যেমন নরনারীর যৌন সম্বন্ধের মধ্যে—একটা অলৌকিক রহস্য সৃষ্টি করে, শ্রেণীশোষণ থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির উপর ধূম্রজাল বিস্তার করে মানুষকে বিভ্রান্ত, সংগ্রাম-বিমুখী, আত্মবিলীনকারী আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করে তোলে। অথবা স্পষ্টতই শিল্পসংস্কৃতির নামে সামাজিক দুর্নীতি, নরনারীর মধ্যে বিকৃত যৌন সম্পর্ক ইত্যাদির প্রচারে প্রশ্রয় দিয়ে জনগণকে বিপথে পরিচালিত করে। ব্যাপক অর্থে এই উভয়প্রকার 'সংস্কৃতি'ই হল 'অপসংস্কৃতি'। অর্থাৎ যে সংস্কৃতি সমাজের সমসাময়িক স্তরের শোষিত জনগণকে সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজকে পরবর্তী উন্নত স্তরে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে বা করেছে তা সবই এক ধরনের অপসংস্কৃতি। সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল, প্রগতি জিনিসটিও তেমনি আপেক্ষিক। তাই সমাজের এক স্তরে যে সংস্কৃতি প্রগতিশীল, অন্য স্তরে সময়বিশেষে তা প্রগতির পথে বাধাও সৃষ্টি করতে পারে।

আজকের দুনিয়ায়, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিস্তারের যুগে, বুর্জোয়াদের আর কোন প্রগতিশীল ভূমিকা নেই। ভাববাদী শিল্পসংস্কৃতির কদরও কমে গেছে, তাই তাদের শ্রেণী শোষণ বজায় রাখবার জন্য শোষিত, বঞ্চিত, বিক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে দুর্নীতিমূলক, বিকৃত যৌন সম্বন্ধের প্রচারকারী অপসংস্কৃতির প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিশেষ করে। প্রয়োজন হয়ে

পড়েছে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অপসংস্কৃতির মাদকতা ছড়ানোর। অবক্ষয়ী, পরাজয়ভীত, সন্ত্রস্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে অপসংস্কৃতি হল একটি বিশেষ রাজনৈতিক অস্ত্র, তাদের এক ধরনের রক্ষাকবচ। আর সেই ক্ষয়িষ্ণু শাসক গোষ্ঠীর পাশে এসে দাঁড়ায় তথাকথিত 'অভিজাত' 'বুদ্ধিজীবীর' দল। এদেরই সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন: "জনগণের 'বুদ্ধিজীবী শক্তিগুলি'র সঙ্গে 'বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী'দের গুলিয়ে ফেলা ভুল হবে" ("It is wrong to confuse the 'intellectual forces' of the people with the forces of 'bourgeois intellectuals'"—Lenin : Letter to Maxim Gorky, Sept. 15,1919).

এই 'বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী'রাই ইউরোপ আমেরিকার ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অপসংস্কৃতির স্রষ্টা ও প্রচারক। আর তাদেরই প্রভাবে আমাদের দেশের তথাকথিত 'অভিজাত' বুদ্ধিজীবীরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বের গুণগ্রাহী, আর প্রকারান্তরে অপসংস্কৃতির 'উচ্চস্তরে'র স্রষ্টা ও প্রচারক, আবার তাদেরই হীনতর অনুকরণ করছে জনগণের মধ্যেকার বিপথগামী অংশ। তাই আজ কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনে, তাদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক দুর্নীতি, অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ছে। এর বিরুদ্ধেই আজ প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মী, লেখক শিল্পী কলাকুশলী, সংস্কৃতি অনুরাগী জনগণের সংগ্রামী অভিযান চলছে। নারীসমাজের উপরও এসে পড়েছে তার বিশেষ দায়িত্ব।

চার

অপসংস্কৃতি রোধে নারীসমাজের দায়িত্ব কী? আর কেমন করেই বা আমরা তা পূরণ করব?

আমরা দেখেছি যে অপসংস্কৃতি শুধু জনগণের মধ্যেই রুচির বিকার ঘটায় না, সামগ্রিকভাবে জনগণের প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের অগ্রগতিকে রোধ করে, সংগ্রামের পথ থেকে শোষিত জনগণকে বিপথে চালিত করে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার প্রচার করে। তাই অপসংস্কৃতি রোধ করা সমস্ত শোষিত জনগণেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শোষিত জনগণের শ্রেণীসংগ্রামের অংশ হিসাবেই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং সুস্থ সুন্দর গণসংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম করতে হবে। শোষক শ্রেণীর সংস্কৃতি কখনো শোষিত শ্রেণীর মানুষকে মর্যাদার চোখে দেখতে পারে না। তাদের দাসত্ব, হীনমন্যতা, আত্মদানকে তুলে ধরে, কখনো বা ভাববাদী দর্শনের গোলকধাঁধার মধ্যে ফেলে এসব জিনিসকে অলৌকিক মহিমাও দান করে থাকে। যেমন

করেই হোক, জনগণকে সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত করে বা বিপথে পরিচালিত করে। এই শোষিত জনগণের অংশ হিসাবেই নারীসমাজ হয়ে থাকে অপসংস্কৃতির সব চেয়ে বড় শিকার। তাই অপসংস্কৃতি রোধে নারীসমাজের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অপসংস্কৃতি রোধের কাজে অগ্রসর হতে হলে আমাদের আশু লক্ষ্য ও শেষ লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। আশু লক্ষ্য হল সব রকমের সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক সম্মিলিত অভিযান চালানো, 'মুক্ত সংস্কৃতি'র নামে যে যৌন বিকৃতির প্রচার চলছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। নারীদেহকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতির প্রচার চলছে, সে যে সমগ্র নারীসমাজের পক্ষে কত বড় অপমান, কত বড় লজ্জা, কতদূর অবমাননা সে সম্বন্ধে সমগ্র নারীসমাজকে সচেতন করে তুলতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে পুরুষ শাসিত সমাজে দাসত্ব করতে করতে নারীদের মধ্যেও সেই দাসত্বের অবস্থাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে তাদের আত্মসম্মান বোধ। তাই নগ্ন নারীদেহের বিজ্ঞাপন দেখলে বা তরুণী মেয়েদের নগ্ন নৃত্য একটা পয়সা উপার্জনের উপায় হিসাবে চলছে জানলেও অনেকের মধ্যেই তার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। নারীর বেশ্যাবৃত্তিও যেন সমাজের একটা স্বাভাবিক জিনিস বলে গা-সওয়া হয়ে গেছে। এ হল বুর্জোয়া সভ্যতার অভিশাপ। গরীব নারীরা দেহ বিক্রি করবে, লম্পট মালিকের ঔরসে জাত শ্রমিক নারীর অবৈধ সন্তানকে গলা টিপে মারবে, দেশবিদেশে ধান পাট তুলো যন্ত্রপাতি চালানের মত নারী চালান দেওয়ার ব্যবসা চলবে—তারপর কোন পতিতা নারীর করুণ আত্মকাহিনী নিয়ে রচিত রোমাঞ্চকর ছবির মাধ্যমে তরুণদের মনে বিকৃত যৌন আবেগ উদ্রেক করা হবে—এ সব হল বুর্জোয়া অভিজাতদের অপকীর্তি। এর বিরুদ্ধে নারী সমাজকে বিদ্রোহ করতে হবে। তাদের আত্মসম্মানবোধকে জাগাতে হবে। ছায়াছবি, নাটক নভেল, বিজ্ঞাপন পোস্টারের মাধ্যমে নারীর অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ কাজ সমস্ত সচেতন মানুষের। কিন্তু সমাজসচেতন নারীদের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যে নগ্ন নারীদেহের বিজ্ঞাপন বা যে নারীর বিকৃত যৌনজীবনের প্রচারের মাধ্যমে অপসংস্কৃতি ছড়ানো হচ্ছে, সে যে সমগ্র অবমানিত নারীসমাজেরই প্রতীক, তার মাধ্যমেই যে সমাজে নারীজাতির স্থান, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত হচ্ছে—সমগ্র সুস্থ সচেতন নারীসমাজের বিবেক যেন সেই বোধে, ঘৃণায়, জ্বালায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীর অপমানকে রোধ করার কাজের মধ্যে

দিয়ে আমরা বাস্তব সমাজের ক্ষেত্রেও নারীর সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অগ্রসর হতে পারব। শিল্পসংস্কৃতির মধ্যে নারীদের নিয়ে যেভাবে পণ্য হিসাবে ব্যবসা চলে, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের বেদনা, ক্ষোভ, বিদ্রোহের আগুনকে ছড়িয়ে দিতে হবে সকলের মধ্যে। সমাজসচেতন মানুষ হিসাবেই এ আমাদের কাজ, নারী হিসাবে তো বটেই।

সমাজে নারীদের মাতৃজাতি হিসাবেও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা দাসীর নয়, জননীর। মায়েরা শুধু সন্তানদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষই করেন না, তাদের মানসিক গঠনও তৈরী করেন। আমাদের মায়েরা কত দুঃখকষ্টে, কি অপরিমেয় স্নেহে ও আত্মত্যাগের মধ্যে সন্তানদের লালনপালন করে তোলেন। তারপর তারা যদি বৃহত্তর সমাজজীবনে গিয়ে পরীক্ষার খাতায় টুকে পাস করে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্ত হয়ে যায়, সহায়সম্বলহীন, ভবিষ্যতের আশাহীন, বেকার বেপরোয়া জীবনযাপন করতে থাকে, আর শাসক শ্রেণীর কালো হাতে ছড়ানো অপসংস্কৃতির জালে জড়িয়ে পড়ে—নারী ও সুরাকে একই অর্থে ব্যবহার করে, তবে সে দুঃখ, সে অপমান, সে লজ্জা আমরা কোথায় রাখব? ছেলে-মেয়েদের উপর মায়েদের সেই প্রভাব ফেলতে হবে যা তাদের সুস্থ জীবনবোধ জাগাতে পারে, মানবিক মূল্যবোধ শেখাতে পারে, অপসংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে শুধু আশু লক্ষ্য নিয়ে চললেই হবে না। শেষ লক্ষ্যের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। তা হল অপসংস্কৃতির গোড়ার কথা, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অপসংস্কৃতির মূল উৎস হচ্ছে সমাজের শ্রেণী শোষণ। তার থেকেই সংস্কৃতি জগতে হেয় করা হয়ে থাকে শোষিত জনগণকে, হেয় করে রাখা হয় নারীসমাজকে। সুস্থ গণসংস্কৃতির মধ্যে শোষিত মানুষের অবমাননা থাকতে পারে না। সমাজে যতক্ষণ না নারী-পুরুষের প্রকৃত সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যতক্ষণ না নারীর পূর্ণ সামাজিক মুক্তি হচ্ছে, ততক্ষণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন চাই। শ্রেণী-শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষিত জনগণের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসংস্কৃতিরও শোষকশ্রেণীর দাসত্ব থেকে মুক্তি আসবে, গড়ে উঠবে নতুন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমাজ কাঠামোর উপর সুস্থ সুন্দর দাসত্বের কলুষমুক্ত শিল্প সংস্কৃতি। তাই এই কায়েমী স্বার্থসেবী শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে আছে

অপসংস্কৃতি রোধের সংগ্রাম। সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণা, শ্রেণী-সংগ্রামের বৈপ্লবিক চেতনাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে উন্নত প্রগতিশীল শিল্প সংস্কৃতির সৃষ্টি ও প্রসারের কাজে, অপসংস্কৃতি রোধের কাজে। এই গোড়ার কথাটা আমাদের মনে রেখেই অপসংস্কৃতি রোধের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। শোষিত জনগণের প্রতিটি অংশকেই অগ্রসর হয়ে আসতে হবে এই সংগ্রামের মধ্যে। আর সমাজের অর্ধাংশ হিসাবে, শোষিত জনগণের অংশ হিসাবে, মা বোন হিসাবে—ব্যাপক নারীসমাজকে সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে অপসংস্কৃতিরোধের এই সংগ্রামের মধ্যে।

যাত্রাপালায় অপসংস্কৃতি

কল্পতরু সেনগুপ্ত

কৃষিবাংলার গণরঙ্গমঞ্চ যাত্রা। উৎসব-আনন্দের দিনে বিশেষ করে শারদ উৎসবের সময় গ্রামের মানুষের প্রধান উপভোগ্য যাত্রাগান। প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবে যাত্রাগানের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। অতীতে যাত্রাগান কথাটা প্রচলিত ছিল না, নাটগীত নামে পরিচিত ছিল। নাটগীত অর্থ নাচ ও গান। এই গান ছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ে, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা পালায় প্রধান স্থান গ্রহণ করে। নাটগানের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কৃষ্ণলীলা। তখন থেকে নাটগীত কথাটির পরিবর্তে যাত্রাগান কথাটি প্রচলিত হতে থাকে। যাত্রাগান কথাটি কিভাবে এল এ নিয়ে নানারকমের কথা আছে। কেউ বলেন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'যাত্রা' কথাটি চালু হয়েছে, কেউ বলেন সূর্যপূজাকে অবলম্বন করে—কক্ষপথে সূর্যের যাত্রাকে নিয়ে উৎসবের সঙ্গে যুক্ত বলে এই নাম হয়েছে। প্রাচীনকালে কৃষিজীবী মানুষ সূর্যপূজা করত এবং সূর্যের যাত্রাকে কল্পনা করে উৎসব করা হত। সূর্যের যাত্রার সঙ্গে এই অনুষ্ঠান যুক্ত বলে এই নাচগানের অনুষ্ঠান যাত্রাগান নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এখানে নামের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। সেটা গবেষণার বিষয়। একথা অবতারণার উদ্দেশ্য যাত্রাগানের সূচনা কৃষিবাংলায় অর্থাৎ গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে, এবং সূচনাতে লোকশিক্ষার ভূমিকা রয়েছে। অশিক্ষিতপ্রধান জনপদে সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিশিক্ষার ভূমিকা নিয়ে যাত্রাগান এক আনন্দমাধ্যমের রূপ লাভ করেছে; এবং সূচনাকাল থেকে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছে।

তারপরে একসময় যাত্রায় পালা বা নাটকীয় আখ্যান রচিত হতে থাকে পৌরাণিক, মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যকাহিনী ইত্যাদি নিয়ে। এ সময় গানেও পরিবর্তন আসে, শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের সুর প্রধান অবলম্বন হয় গানে। পরবর্তীকালে কীর্তনগানের প্রসারে যাত্রায় কীর্তনের প্রভাব দেখা গিয়েছিল। শাস্ত্রীয় সুরের সঙ্গে কীর্তনের সুর মিশে যায়, এবং এসময় যাত্রাগানের বৈশিষ্ট্য ছিল জুরীর গান। উনিশ শতকের গোড়া থেকে যাত্রাগানে আখড়াই গান, খেমটাগানের হালকা সুর সন্নিবেশিত হতে শুরু করে। জমিদার এবং কলকাতার 'বাবুরা' তখন যাত্রাগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এঁরা ছিলেন কোম্পানীর সাহেবদের

সহযোগী, সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। দালালী করে ও ইংরেজের সহযোগিতা করে এরা প্রচুর টাকা কামাত। এই টাকা অঢেল স্ফূর্তিতে ওড়ানো ওদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। হুতুম পেঁচার নক্সায় দেশ ও সমাজবোধহীন এই লোকগুলোর চরিত্র এবং সেই কালটাকে বোঝা যায়। এদের বিকৃত রসবোধ ও ফরমায়েশ মেটাতে যাত্রাদলগুলিকে নেমে আসতে হয়, এবং এই 'বাবু'দের পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রায় খেমটানাচ, ডুয়েট নাচ ও 'রসের গান' ইত্যাদি অনুপ্রবেশ করে। এসময় যাত্রাগান এত হালকা হয়ে ওঠে যে, পরবর্তীকালে এ নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুক করা হত। যাত্রা যদিও কৃষিজীবনভিত্তিক আনন্দমাধ্যম এবং গ্রামের মানুষের সমর্থনে বিকাশ লাভ করেছিল, কিন্তু যেকালে 'বাবু'দের মনস্তুষ্টির দিকে ঝুঁকল তখনই চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে স্থূল রঙ্গরসে পরিণত হয়ে অপসংস্কৃতিতে কলুষিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এবং আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করতে থাকে। "বাবু কালচার"-এর অন্ধকার ভেদ করে জাতীয়চেতনার প্রভাব দেখা গেল যাত্রায়। কেবল পালায় নয়, যাত্রার আঙ্গিক রীতিতে। পালায় এল ঐতিহাসিক বিষয়, এমন ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী যার বক্তব্য ধর্মের জয়—অধর্মের পরাজয়, সত্যে অবিচল থাকার শিক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা, ইত্যাদি। এসময় ধ্রুব, শুম্ভ-নিশুম্ভ, সাবিত্রী-সত্যবান, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কংস ইত্যাদি মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে মাথা তুলে দাঁড়াবার। এসময় যাত্রারীতিতে নতুন যে সংযোজন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিবেকের চরিত্র ও গান। যাত্রায় বিবেক আসায় জুড়িগান বিদায় নেয় এবং যাত্রা একঘেয়েমিমুক্ত হয়। বিবেকের চরিত্র দর্শকমনে বিশেষ রেখাপাত করে। তার কারণ বিবেক হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক এবং জোরালো কণ্ঠে রাগভিত্তিক সুরে বক্তব্য প্রকাশ। যখন কোন অবিচার, ভুল বা অন্যায় হয় সেই মুহূর্তে বিবেকের আবির্ভাব। যদিও কাল্পনিক তথাপি দর্শকরা এই চরিত্রটিকে ভালবাসত। এসময় যাত্রায় মাত্রাতিরিক্ত গান কমে গিয়ে সংলাপধর্মিতা আসে। থিয়েটারের রীতিতে সংলাপ প্রবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনে যাত্রা নতুন রূপ লাভ করে। যদিও হালকা রসের ডুয়েটগান ও নাচ থেকে গেল কিন্তু নতুন প্রবর্তিত হল ইওরোপীয় অপেরার প্রভাবে সমবেত নৃত্য, যা সখীর নাচ বলে পরিচিত ছিল। এই পরিবর্তনে পূর্ববঙ্গের মথুরা সাহার বিশেষ অবদান উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তু এবং অভিনয়রীতিতে পরিবর্তন এনে তিনি যাত্রাকে আরো জনপ্রিয় করেন। এসময় যাত্রা কেবল জমিদারবাড়ির আঙিনায় সীমাবদ্ধ না থেকে

চা-বাগান কয়লাখনি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পূজামণ্ডপের বাইরে গ্রামসভার উদ্যোগে বারোয়ারি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ছোঁয়ায় যাত্রার দলগুলি সাধারণ মানুষের পাশে স্থান খুঁজে নেবার চেষ্টা করে, স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। একালে মুকুন্দদাসের স্বদেশীযাত্রা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এবং যাত্রা-জগৎকে মর্যাদা দান করে।

দেশভাগের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কিছুকাল যাত্রার দলগুলি ঝিমিয়ে পড়ে। তার কারণ কৃষিভিত্তিক পূর্ববঙ্গে যাত্রার প্রচলন বেশি ছিল। যাত্রার শিল্পীরা দেশভাগের দুঃস্বপ্নের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে, উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়, মনোবল ভেঙে পড়ে এবং শূন্যতার শিকার। এই অবস্থার মধ্যে রবীন্দ্র সরণিতে যাত্রাদলগুলি পুনর্গঠিত হয় এবং নতুন কিছু দলও গড়ে ওঠে। থিয়েটার ও সিনেমার পাশাপাশি প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছিল বলে যাত্রাকে আধুনিক করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাত্রাদলের পরিচালকদের তেমন কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না। তবে তাঁরা একথা বুঝতে পারছিলেন যে, স্বাধীনতার পরে জমিদার-জোতদার-নির্ভর হয়ে থাকলে চলবে না,মেহনতি মানুষের উপর নির্ভর করতে হবে। গণনাট্য সঙ্ঘের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জগতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যে এক রূপান্তর ঘটায়। এই সঙ্গে শিল্পীর ভূমিকাকে তাঁরা সমাজের অগ্রগামী মানুষের সারিতে নিয়ে এসেছিলেন। গণনাট্য সঙ্ঘ যাত্রার জগতেও রূপান্তরের পথ দেখালেন, দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় যাত্রার ভূমিকা কি হওয়া উচিত তার পথনির্দেশ জানালেন 'রাহুমুক্ত' যাত্রাভিনয় করে। তারপরে তাঁরা 'নীলদর্পণ' নাটককে যাত্রারীতিতে অভিনয় করলেন। আরো পরে ম্যাক্সিম গর্কীর 'বেঈমানের মা' গল্প অবলম্বনে যাত্রার আঙ্গিকে অভিনয় করলেন। গণনাট্যের সাম্প্রতিক যাত্রাপালা 'ফুলওয়ালী' একটি চমৎকার সৃষ্টি। যাত্রাপালায় নারীর ভূমিকায় মহিলা শিল্পীদের অভিনয়ে গণনাট্য সঙ্ঘ পথ দেখিয়েছে। 'স্বাধীনতা' দৈনিক পত্রিকাটিও যাত্রার সমস্যা ও নবরূপায়ণ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে লিখে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'স্বাধীনতা'র লেখালেখিতে যাত্রা শিল্পীরা আবার জনসমক্ষে সম্মানের সঙ্গে ফিরে এলেন। কিন্তু আজকাল 'যাত্রাদরদী'রা তাঁদের কাগজে যখন যাত্রা সম্পর্কে লেখেন তখন গণনাট্য সঙ্ঘ ও 'স্বাধীনতা'র নামও উল্লেখ করেন না।

যাত্রার পুনর্গঠনের এই পর্যায়ে আঙ্গিক ও অভিনয়রীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল, যা স্বাভাবিক ছিল। এতকাল নারীচরিত্রে অভিনয় করতেন পুরুষ শিল্পী, এই পর্যায়ে দেখা গেল নারীশিল্পীরা স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সখীর দলে

বালকদের সঙ্গে মেয়েরা। জুড়িগানকে বিদায় দিয়ে যে বিবেকের চরিত্র সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিবেক গেরুয়া ও পাগড়ি ছেড়ে অন্য চরিত্রগুলির সঙ্গে মিশে গেছে, কিন্তু ভূমিকাটি রয়েছে। আসর সঙ্গীতে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন সত্ত্বেও যাত্রা আর থিয়েটারের তফাত বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কৃত্রিম দৃশ্যের সাহায্য গ্রহণ না করে কেবল অভিনয় ও সঙ্গীতে পরিবেশ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ঠিকই থাকে। দর্শক ও অভিনেতারা পরস্পর কাছাকাছি থেকে বিষয়টিকে সহজ করে তোলে। এসময় একদিকে যেমন সামাজিক সমস্যার বিষয় আসে পালায়, সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় ঘটনা ও সাম্প্রদায়িকতার দোষও দেখা গিয়েছিল। দেশভাগের কারণ রাজনৈতিকভাবে বুঝতে না পারায় হতাশা থেকে এই বিচ্যুতি ঘটেছিল। এসময় আর একবার অপসংস্কৃতির কালোছায়া দেখা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে তখন ছিল কংগ্রেসের সরকার। সেই সরকারের যাত্রা বা কৃষিবাংলার সংস্কৃতির প্রতি নজর ছিল না. বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার কোন কর্মসূচী ছিল না।

ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা দেয়। কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতা এবং মানুষের দুরবস্থার পরিবর্তনের আশায় মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে পরপর দুবার নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট জয়যুক্ত হয়। এই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে যাত্রাদলেও। যাত্রাপালায় স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কদের ও রক্তঝরা মুহূর্তগুলিকে তুলে ধরা হয়। যাতে মানুষ বুঝতে পারে কত দুঃখ, ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আর সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে কিছু স্বার্থপর লোক, একটি দল। যাত্রাদলের ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত যখন বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, নেতাজী সুভাষ, সূর্যসেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাইকেল মধুসূদন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইত্যাদি জীবনী নাটকের পাশে কার্ল মার্কস; লেনিন, মাও-সে-তুঙ, হো চি মিন-এর মত আন্তর্জাতিক মনীষীদের জীবনী নিয়ে যাত্রাপালা অভিনীত হয়েছে। এরই পাশে বাঁশের কেল্লা, জালিয়ানওয়ালাবাগ, আন্দোলন, রাইফেল, বারুদ, পদধ্বনি, ফাঁসির মঞ্চে ইত্যাদিতে বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্মৃতি তুলে ধরা হয়। যাত্রার ইতিহাসে এ ছিল এক নতুন পদক্ষেপ, এক অভিনন্দনীয় উদ্যোগ। যা দেখে মনে হত যাত্রাদল মেহনতি মানুষের সংগ্রামের শরিক।

কিন্তু গণতন্ত্রের পথে সাধারণ মানুষের অভিযান, জীবনধর্মী সংস্কৃতির জন্য শিল্পীদের আগ্রহ প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস শাসকদের সহ্য হল না। তারা

যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বাতিল করে দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করল এবং সন্ত্রাসের দ্বারা গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে সংস্কৃতিকেও হত্যা করতে উদ্যত হল। স্বাধীন চিন্তা ও সংস্কৃতির পথে বাধা সৃষ্টি করল বোমা পাইপগান ছোরা দিয়ে, সৃষ্টি করল সমাজবিরোধী বাহিনী। এই সমাজবিরোধী বাহিনীর হাতে সংস্কৃতিকর্মীরা হল নির্যাতিত, এমন কি নিহত। প্রতিক্রিয়াশীলরা সংস্কৃতিকে ভয়ের চোখে দেখে, যেমন ফ্যাসিস্ট গোয়েবল বলত সংস্কৃতি কথাটা শুনলে রিভলবারে হাত দিতে ইচ্ছা হয়। ওদের ভয়ের কারণ সংস্কৃতি মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত করে এবং সুন্দর জীবনের আশা জাগায়। প্রতিক্রিয়াশীলরা জানে বন্দুকবাজী করে সন্ত্রাসের দ্বারা প্রগতির পথ রুদ্ধ করা যায় না, চিন্তাকে থামানো যায় না। তার জন্য চাই অপসংস্কৃতি। যা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করবে, চিন্তাকে বিপথে চালিত করবে, যুবকরা যৌন চিন্তায় নিস্তেজ হয়ে থাকবে। অপসংস্কৃতির নোংরা পরিবেশে বিপ্লবের চিন্তা থাকবে না, সততার প্রেরণা থাকবে না। মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে উঠবে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস যেমন এক চরম আঘাত, তেমনি অপসংস্কৃতি আর একদিক থেকে আক্রমণের অস্ত্র। অপসংস্কৃতি কেবল সাহিত্যে, নাটকে, সিনেমায় বিকৃতি ঘটায় না, তার সঙ্গে যুবসমাজকে কলুষিত করে। এল. এস. ডি জাতীয় মাদক, মদ, চরস ও যৌনব্যাধিতে সর্বনাশ ঘটায়। পোশাকে-আশাকে বিদেশের অনুকরণ করে অসভ্যতার পরিচয় দেয়, জাতীয়তাবোধ হারিয়ে ফেলে। এ পরিস্থিতিতে সংস্কৃতি জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত যাত্রায়ও অপসংস্কৃতির দৈত্যটির ছায়া পড়ে। যাঁরা লেনিন, কার্ল মার্কস যাত্রাভিনয় করতেন সেসব দলের শিল্পীরা সমাজবিরোধীদের হাতে লাঞ্ছিত হল, দলের জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হল, বায়না করে নিয়ে টাকা না দিয়ে তাড়িয়ে দিল। টু শব্দ করার উপায় থাকল না, কারণ ওদের হাতে পাইপগান। যেসব যাত্রাদল প্রগতিশীল নাটক অভিনয় করত সেসব দলে কমিউনিস্ট আছে কিনা খোঁজ খবর নিয়ে ভীতি সঞ্চার করেছে। অবস্থা এমন বিপজ্জনক হয়েছিল যে, যাত্রাদলগুলিকে মহাকরণে নালিশ জানাতে হয়েছিল। সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে, কলকাতার বাইরে অভিনয় করতে যাবে না। এমন পর্যুদস্ত অবস্থায় তদানীন্তন রাজ্যসরকার এগিয়ে এল যাত্রা উৎসব ও পুরস্কারের টোপ নিয়ে। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যেমন কর্মীদের মেরে তাড়িয়ে ইউনিয়ন দখল হয়েছে, এখানেও সন্ত্রাসের পরিবেশে জনপ্রিয় পালাগুলির অভিনয় বন্ধ করে দিয়ে রাজ্যসরকার পুরস্কার দিল প্রগতির গন্ধহীন যাত্রাপালাকে। উৎসাহ দিল ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও যৌনতার

প্রাধান্যমূলক যাত্রাপালাকে। লেনিনকে বিদায় দিয়ে আনা হল 'বাবা তারকনাথ', 'সন্তোষী মা'দের। রাইফেল ও বাঁশের কেল্লাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে যাত্রায় নতুন সংযোজন হল ক্যাবারে নাচের, এল দেহ প্রদর্শনের জন্য অশালীন পোশাকে নর্তকী, যাত্রাপালায় দেশপ্রেমিকদের আত্মদানের কথা চাপা দিয়ে খুন ও খুনীদের বিভীষিকা জাগানো হল। জেলায় জেলায় মস্তানরা ছিল এসব যাত্রার উৎসাহী সংগঠক। তার সঙ্গে আনারকলি, হেলেন অব্ ট্রয়, নগরবধূ-বারবধূর মত যাত্রাপালার উৎসাহী রসিক। তারা এধরনের যাত্রাপালার বায়না করত, ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন অভিনয় করাত, এবং তার জন্য মানুষের কাছ থেকে জোর জুলুম করে চাঁদা তুলত। এই টাকার বড় অংশ নিজেরা ভোগ করত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন যে, শহরে পেশাদার থিয়েটারগুলি যেভাবে অপসংস্কৃতির ফেরিওয়ালা হয়েছিল, যাত্রার সকল দল সেভাবে আত্মসমর্পণ করেনি। সন্ত্রাসের দিনে অপসংস্কৃতির শিকার না হয়ে কয়েকটি দল সাময়িক-ভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষ অপসংস্কৃতির পালা গ্রহণ করেনি। শোনা গেছে যাত্রায় ক্যাবারে নাচে আপত্তি জানিয়েছে, কোথাও বাধা দিয়েছে। তাই আজ গর্ব করে বলা চলে যে, অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতি বাধা পেয়েছে। গ্রামের মানুষ অপসংস্কৃতিকে বরদাস্ত করতে পারেনি। কারণ গ্রামের মানুষের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক গভীর। সমাজ ও পরিবারের বন্ধন অনেক বেশি। সংস্কৃতির নামে তাঁরা এমন কিছু উপভোগ করতে চান না যা মা-বোনকে নিয়ে দেখা যায় না। যা মানবিকতার পরিবর্তে দুর্বল দিকগুলিকে প্রধান করে রিপুতাড়িত জীব হিসাবে মানুষকে চিত্রিত করে, মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায়। তাই দেখা গেছে এমন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের সময় টুসু, সাঁওতালীগান, কবিগান অপসংস্কৃতি মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে—অবশ্য সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের অঞ্চলগুলিতে এটা সম্ভব হয়েছে।

সন্ত্রাসের মাধ্যমে আসে ফ্যাসিজম, সন্ত্রাস জন্ম দেয় অপসংস্কৃতির। ফ্যাসিজম আর অপসংস্কৃতি পাশাপাশি চলে। সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাস আর অপসংস্কৃতি একে অপরের সহায় হিসাবে চলেছে এক স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। ইতিহাস থেকে জানা যায় ত্রিশের দশকে যখন ইউরোপের কয়েকটি দেশ ফ্যাসিজমের রাহুগ্রাসে পড়ে তখন এভাবেই অপসংস্কৃতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। অপসংস্কৃতি যে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির খেলা, জগতের সবদেশের মানুষ এ সত্যটি জেনেছে। আমরাও চরম ক্ষতির বিনিময়ে জানলাম। ষাটের দশকে ঔপনিবেশিক বন্ধনমুক্তির জন্য দেশে দেশে দুর্বার মুক্তি-সংগ্রাম শুরু

হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গীবাদীদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ তখন নানা পরিকল্পনা করেছিল অপসংস্কৃতি বিস্তারের জন্য—যাতে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের নৈতিকবোধ ভোঁতা করে দেওয়া যায়। সি আই এ-র চক্রান্তের কথা ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয় সাংবাদিক সম্মেলনে বিশদ আলোচনা হয়েছিল। আমাদের দেশে সত্তর দশকে যে সন্ত্রাস চলেছে তার পেছনে ইন্দিরার বিশেষ এক গোয়েন্দা সংস্থার চক্রান্ত ছিল। এই গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে এমন লোক ছিল যারা সাইগনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তালিম পেয়েছে। এই অভিযোগ লোকসভায় উঠেছিল। এ থেকে বোঝা যায় সন্ত্রাসের দোসর হিসাবে অপসংস্কৃতির বেনোজল ঢুকিয়েছে তারাই—সি আই এ-র শিক্ষায়।

কিন্তু মানুষের ধর্ম জয়ের ধর্ম, মানবতাকে কখনো বিধ্বস্ত করা যায় না। মানবতাকে যারা লাঞ্ছিত করেছে দেখা গেছে তারা নিজেদের কলঙ্কে ধিকৃত হয়েছে। এই দশকে সন্ত্রাস ও অপসংস্কৃতির যারা নায়ক তারা আজ নিন্দিত এবং জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত। সন্ত্রাসের পরাজয়ে গণতন্ত্রের পতাকা আবার উত্তোলিত হয়েছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সঙ্গে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। যাত্রাদলগুলিতে আবার সাহস ফিরে এসেছে। আবার লেনিন, কার্লমার্কস, হো চি মিন, মাও-সে-তুঙ গ্রামে গ্রামে অভিনীত হচ্ছে। নতুন করে সংযোজিত হয়েছে 'মুক্তিদীক্ষা' 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা' এবং 'স্তালিন'। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী যাত্রাদলগুলি আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বাস রাখি সত্তর দর্শকের অপশিক্ষায় যাত্রাদলগুলি আর বিভ্রান্ত হবে না। অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযানে সমবেত হয়ে বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতিকে উন্নত করে তুলবে। দেশপ্রেম ও সততা-বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে এমন নাটক অভিনয় করবে যা মানুষকে জীবনসংগ্রামে উদ্দীপ্ত করে, মানুষের মধ্যে আশা জাগায়। এমন আঙ্গিক রচনা করবে যা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। যাঁরা যাত্রাপালা প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন তাঁদের বুঝতে হবে জনগণের শ্রেয়তর জীবনরচনার প্রয়াসের সঙ্গে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক মহত্তর বোধ উদ্বুদ্ধ করাও তাঁদের কাজ। মানুষ যখন উন্নতজীবন লাভের জন্য সংগ্রাম করছে তার সঙ্গে সমপদক্ষেপে তাঁদেরও উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে গ্রামবাংলার কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে তাঁদের জীবনীশক্তি।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাংলা নাটক—যুগে যুগে

হীরেন ভট্টাচার্য

এক

অপসংস্কৃতির রাহু বিভিন্নকালে বাংলা নাটককে কীভাবে গ্রাস করেছে এবং কীভাবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার রাহুমুক্তি ঘটেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্ধারণই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইতিহাস খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে—অপসংস্কৃতির প্রশ্নটা আজকের নতুন নয়। উদয়লগ্নে যে সমাজ স্বকৃতির আলো দেখায়, অস্তলগ্নে সেই সমাজেরই নির্বাপিত আলোকশিখা অজস্র ধূম-উদ্‌গিরণে এক অপচ্ছায়ার সৃষ্টি করে। এমনি অপচ্ছায়ার বিকৃত রুচির আধোঅন্ধকারে একদিন নূতন আলোকবর্তিকা হাতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল মৌলিক বাংলা নাটক। এখানে বাংলা নাটকের সেই জন্মলগ্ন থেকেই আলোচনাটা শুরু করতে চাই।

কিন্তু শুরুতেই 'সংস্কৃতি' 'অপসংস্কৃতি' শব্দগুলি মূর্তিমান অন্তরায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। গোড়াতেই এর একটা ফয়সালা হওয়া চাই, নইলে কোন আলোচনাতেই প্রবেশ করা যাবে না। অথচ ফয়সালা করাটা সোজা কথা নয়, কেন না, নীচুতলায় তো বটেই, এমন কি উঁচুতলার বিদগ্ধ মহলেও দেখছি সংস্কৃতি কথাটার মানে সকলের কাছে এক নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরোধী। যেমন, শেষের কবিতায় অমিত রায়ের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"কমলহীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার।" আবার দেখি Mathew Arnold বলছেন: Culture is "to know the best that has been said and thought in the world." (Literature and Dogma)। অর্থাৎ knowledge বা বিদ্যেটা সংস্কৃতি কিনা এ বিষয়ে দুই দিক্‌পাল রীতিমত ভিন্নমত পোষণ করেন। সুতরাং এর ফয়সালা করা খুব সহজও নয়, আর সংক্ষেপে সারার ব্যাপারও নয়।

কিন্তু বর্তমান আলোচনার জন্য সংজ্ঞা একটি আমাদের বেছে নিতেই হবে। কাজেই এখানে প্রচলিত পরস্পরবিরোধী মতগুলি থেকেই এমন একটিকে বেছে নিচ্ছি যা প্রথমতঃ নিজের সামান্য বুদ্ধিতে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি এবং দ্বিতীয়তঃ যা বর্তমান আলোচনার পক্ষে সহায়ক হবে বলে ভেবেছি।

ইতিহাসবিদ্ পণ্ডিত ডি. ডি. কোশাম্বী বলেছেন: "Culture must be··· understood also in the sense of the ethnographer, to describe the

essential ways of life of the whole people." ('The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline') এই বক্তব্য যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে এইজন্য যে, এর মধ্যে সংস্কৃতির একটি মূর্ত বৈজ্ঞানিক রূপের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যার সাহায্যে ইতিহাস রচনা সম্ভব। আর, সামগ্রিকভাবে জনগণের "ways of life"-কেই তার সংস্কৃতি বলে ধরে নিলে বর্তমান আলোচনারও সুবিধে।

দুই

অর্থনৈতিক কারণে যখনই আমাদের "ways of life" অবনমিত হয়েছে তখনই নাট্য সাহিত্যে এবং নাট্য উপস্থাপনায় সেই অবনমনের প্রতিফলন ঘটেছে। উনিশ শতকব্যাপী এদেশে যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ভূকম্পন ঘটেছে তার মধ্যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদপুষ্ট বৃটিশ বুর্জোয়া ইতিহাসের অচেতন অস্ত্ররূপে এদেশের পুরাতন সমাজের ভিত্তিতে আঘাত করেছে; প্রাক্-সামন্ত ও সামন্তযুগীয় বাঁধা গৎ সমাজকে নানাদিক থেকে ভেঙে দিয়েছে। নূতন শিক্ষার আলোকে এদেশের নবোত্থিত বুর্জোয়ার মনে আশার অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়েছে। এইটে ইতিবাচক দিক। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও ঠিক যে তারা সামন্তবাদকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করেনি। (নিজের দেশেও বৃটিশ বুর্জোয়া একটি স্তর সামন্ত-বিরোধী বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে, তারপরেই জনজাগরণের ভয়ে আবার সেই সামন্ত-বাদের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে আপন ভূমিকার দিক্‌স্থিতি পরিবর্তিত করেছে।) এদেশেও সামন্তবাদের উপর ধনবাদ চাপিয়ে এক আধা-সামন্ততন্ত্র ও আধা-ধনতন্ত্রের এক নৃসিংহ মূর্তি তৈরী করেছে। সেই সঙ্গে শোষণ লুণ্ঠন অত্যাচার ও দুর্নীতির দ্বারা এ দেশটাকে করেছে বিধ্বস্ত এবং সেইসঙ্গে নিজেকেও করেছে অপমানিত। এইটি তার নেতিবাচক দিক। বাংলা নাটকে যাত্রায়, পাঁচালীতে এই ইতি ও নেতিবাচক দুই দিকেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

রাজা-উজির-জমিদারের প্রভাবিত পুরাতন সমাজটা ইতিমধ্যেই পচে উঠেছিল। এই সময়ে ঘটেছিল সংস্কৃতির অপলাপ। সমাজটা কেমন ছিল? মুসলমান রাজত্বের নবাবী আমলের পতনের অধ্যায়ে "…ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাসিনীদিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয় এবং সেটা যেন একপ্রকার সম্ভ্রমের চিহ্ন এই ভাবটা মুসলমান নবাবদিগের সংস্রবে হিন্দুদিগের মনে আসিয়াছিল। দ্বিতীয়ত পুরুষদিগের দুশ্চরিত্রতা।

ইহা যেন প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও কৃতকার্য হইত সেই যেন বাহাদুর বলিয়া গণ্য হইত।…

"দেশীয় ধনীগণ তোষামোদ আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশায় অপর সকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে লোকে মিথ্যা কহিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা পাইত না।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।)

এই সামাজিক অবস্থা শিল্পসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন: "এই কারণেই দেখিতে পাই মুসলমান অধিকার কালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য রচিত হইয়াছে তাহার রুচি বিকৃত।"

সমাজে এই অবস্থার উপর বৃটিশ অধিকারের নেতিবাচক দিকটি যখন এসে উপর থেকে চেপে বসল তখন সমাজ যে চেহারা ধরল তা আরো চমৎকার! তাও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায় বর্ণনা করি। তিনি লিখেছেন: "তার পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরেজদিগের রাজস্ব আদায়ের প্রণালী, আইন ও আদালত স্থাপিত হইয়া তাহাও অন্তর্হিত হইল। লোকে দেখিল সত্য নির্ধারণ ইংরাজের আইন বা আদালতের লক্ষ্য নহে, সত্য প্রমাণিত হইল কিনা তাহা দেখাই উদ্দেশ্য। সুতরাং লোকে জানিল যে যত মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহারই জয়ের আশা তত অধিক। এইরূপে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যা সাক্ষ্য ও প্রবঞ্চনাদির প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়াইল। লোকে জাল জুয়াচুরি দ্বারা কৃতকার্য হইয়া স্পর্ধা করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদির দ্বারা ধনলাভ করিয়া সমাজমধ্যে গৌরব লাভ করিতে লাগিল। …দেশের সাধারণ নীতির এই দুর্গতি হওয়াতে সর্বত্রই লোকের প্রতিদিনের আলাপ আচরণ তদনুরূপ হইয়া গিয়াছিল।……পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল।…যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয়ে লোকে পূর্ণ থাকিত।…লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন। এ সকল বিবরণ উদ্ধৃত

করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু লজ্জা বোধ করিয়া প্রকৃত অবস্থার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি হইবে।" (ঐ)

এই যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, এই যখন "ways of life" তখন নাট্যশিল্প কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তখন বর্তমান আকারে নাটক ছিল না। ছিল পাঁচালী ও যাত্রা।

পাঁচালীগান—"খেমটা ও কবিগান-পদ্ধতির প্রভাবও অনেক পড়িয়াছিল। পাঁচালা হইতেই যাত্রার উদ্ভব হয়।...প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালীয়দমন কাহিনী।...তাহার পর আসিল বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। ক্রমে অপর কাহিনী যাত্রাপালার মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রায় থিয়েটারী ঢঙের আমদানি হয়।...পূর্বেকার পাঁচালী গানের অশ্লীলতা কবিগানের অপেক্ষা বড় কিছু কম ছিল না।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন)। এখানে বলা হয়েছে যাত্রার মূল বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, পরে বিদ্যাসুন্দর। এই কৃষ্ণলীলার স্বরূপ যাত্রায় কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল? ৬ই আষাঢ় ১২৭৮/৩১ সংখ্যা সোমপ্রকাশ পত্রিকার একখানি "যাত্রাগানের পুস্তক"-এর আলোচনা দেখলেই তা বোঝা যাবে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'বিচিত্র বিলাস' যাত্রাপালা সম্পর্কে বলা হয়েছে: "...ইহাতে অশ্লীলতা দোষ বিলক্ষণ আছে। সত্য বটে, কৃষ্ণলীলাই অশ্লীলতা পূর্ণ কিন্তু এই যাত্রার কতকগুলি গানে অশ্লীল ভাব ও অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি যেরূপ স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় অন্য কোন যাত্রার গানে তদ্রূপ নহে।" (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড—বিনয় ঘোষ)

আর 'বিদ্যাসুন্দর'?

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, বিষয়বস্তু নাটক বিচারে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য হলেও, নাটকের উপস্থাপনার দিকটাও এই বিচারে সমান গুরুত্বপূর্ণ। পঠনযোগ্য কাব্য উপন্যাস গল্প প্রভৃতির আঙ্গিকের আলোচনার সঙ্গে উপস্থাপনার আলোচনাকে এক করে দেখা বা গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়, কেননা নাটক দৃশ্যকাব্য এবং উপস্থাপক লিখিত নাটককে প্রয়োগের দৃশ্যমাণ ভাষায় দ্বিতীয়বার মঞ্চে সৃজন করেন। এই দ্বিতীয় সৃজনে অনেক সময় ভগবান ভূত এবং ভূত ভগবান রূপে পরিবর্তিত হয়।

এদিক থেকে 'বিদ্যাসুন্দরে'র বিচারও করতে হবে। অপৌরাণিক আখ্যান কাব্য "কালিকামঙ্গল" হিসাবে এর বিষয়বস্তু যাই হোক, কিংবা এর শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচারে "Classic Value"-র বিতর্ক যতই থাক না কেন, নাটক বা

যাত্রা হিসাবে এর বিচার করতে গেলে উপস্থাপনা পর্বে দ্বিতীয় সৃজনে তা দর্শকের কাছে কীভাবে উপস্থিত হল তার বিচারটাই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে খেউড়ের যুগে বিদ্যাসুন্দর কীভাবে সৃজিত হয়েছিল তার খবরও পাওয়া যাচ্ছে সেকালের সোমপ্রকাশের পাতায়ই। ৮ই পৌষ শনিবার ১২৭৩-এ আগরপাড়া নাট্যশালায় বিদ্যাসুন্দর অভিনয় সম্পর্কে সেকালের সোমপ্রকাশ পত্রিকা লিখেছেন: "নাট্যোক্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রঘটিত অনেক দোষ ছিল। বিদ্যার বস্ত্র খেমটাওয়ালীদিগের ন্যায় হয় এবং যে রূপে বক্ষস্থলের গঠন হয় তাহা অস্বাভাবিক এবং সামান্য বেশ্যারাও এই প্রকারে স্তন প্রদর্শন করিতে পারে না।"

এই হল পাঁচালীর যাত্রার অবস্থা। শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণিত সমাজচিত্রের এই হল সংস্কৃতিগত প্রতিফলন। পচা ডোবা থেকে পূতিগন্ধই সৃষ্টি হবে এইটেই স্বাভাবিক। তৎকালে নামকরা নাট্যকার যাঁদের কলমে জোর ছিল—তাঁরাও অনেকে যেহেতু এই অপসংস্কৃতির ভূমিতেই তাঁদের লেখক সত্তার শিক্ষাপর্ব সমাধা করেছেন সেইহেতু পরবর্তীকালে রুচি সম্বন্ধে সচেতন হয়েও বহু ক্ষেত্রেই তাদের অজানিতে পদস্খলন ঘটেছে। যেমন নাট্যকার মনোমোহন বসু। যখন "ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্রসমাজের দ্রুত রুচি পরিবর্তন" ঘটছে এবং "ভাষার অসংযম এবং ভাবের গ্রাম্যতার ফলে উনবিংশ শতাব্দী পূর্ণ হইবার বহু পূর্বেই হাফ-আখড়াই পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল" (ডঃ সুকুমার সেন) তখন নাট্যকার মনোমোহন বসু সঙ্গীত রচনায় আবার হাফ-আখড়াইকে পুর্ণজীবন দানে সচেষ্ট হলেন।

আবার অপসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত উপস্থাপকের "গুণে" কেমন করে ভগবানও সে যুগে ভূত হয়ে সৎসমালোচকের আতঙ্কের কারণ হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাই পূর্বোক্ত সোমপ্রকাশে (২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, ২৬ সংখ্যা), জনৈক সমালোচকের কথায়, সেখানে বলা হয়েছে—"নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগের চরিত্র যেমন কলঙ্কিত, রুচিও তেমনি বিকৃত। এখন প্রায়ই নিতান্ত দুর্গন্ধ হয়। দুর্নীতি-পরিপূর্ণ, জঘন্য হাস্যরসোদ্দীপক সামান্য সমান্য পুস্তক অভিনীত হইতেছে যথা—কামিনীকুঞ্জ, পারুলকুঞ্জ, ডাক্তারবাবু, চক্ষুদান, উভয় সঙ্কট, চোরের উপর বাটপাড়ি ইত্যাদি। নিয়ত সুরাপানে ও বেশ্যাসংসর্গে যাদের স্বভাব পশু অপেক্ষাও নীচ ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহারা এরূপ কদর্য চিত্র দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপনীত করিবে তাহাতে আশ্চর্য কি?"

সমালোচনার শেষে সমালোচক উম্মাসহকারে উক্ত নাটকগুলি সম্পর্কে মাইকেলের ভাষায় বলেছেন—

"চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহারে
ভস্মরাশি করি ফেল কর্মনাশা জলে।"
(সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ খণ্ড)

এখানে চাঁড়ালের হাতে যে নাট্যগ্রন্থগুলি তুলে দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 'চক্ষুদান' এবং 'উভয় সঙ্কট' নামে দুখানি নাটকের নাম দেখা যাচ্ছে। এগুলি রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত নাটক। রামনারায়ণের নাটক চাঁড়ালের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাবে স্বতঃই আমাদের বিস্ময় জাগে। রামনারায়ণ প্রগতিশীল নাট্যকার। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি আজিও সগৌরবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাজ করিতেছেন।"

ডঃ অজিত ঘোষের মতে—"ব্যঙ্গের হুল এবং শ্লেষের যে খোঁচা সমাজ-মন শোধন করিতে তত্ত্বোপদেশের গদাঘাত অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকর রামনারায়ণের প্রহসন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।" এগুলি একালের মূল্যায়ন। কিন্তু সেকালেও ১৯শে জানুয়ারী ১৮৮৬ তারিখে রামনারায়ণের মৃত্যু উপলক্ষে লিখতে গিয়ে ঐ সোমপ্রকাশ পত্রিকাতেই লেখা হয়েছে: "'নবনাটক' 'ধর্মবিজয়' 'বেণীসংহার' 'চক্ষুদান' প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই তাঁহার নাম এবং মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে।" (রামনারায়ণ তর্করত্ন—ব্রজেন্দ্রনাথ)। এহেন রামনারায়ণের প্রহসন কি কারণে পূর্বোক্ত সমালোচককে এত ক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে? তার সমালোচনায় "নাট্যকলার অংক্ষদিগের" কলুষিত চরিত্র ও বিকৃত রুচির কথা পড়ে মনে হয়—নাটক নয়—নাট্য উপস্থাপনাই এই উত্তেজনার কারণ। সে যুগে উপস্থাপনার মধ্যেও সমাজজাত অপসংস্কৃতির ঘুণ ধরেছিল। নাট্যক্ষেত্রকে তাও কলুষিত করেছিল। এই সামান্য আলোচনাতে বোধকরি একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সময়ের কলুষিত অর্থ ও সমাজনীতি যে অপসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল বাংলা নাটক তার আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। বিভিন্ন অখ্যাত "অলীক কুনাট্য"-র বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে এ আলোচনা আরো বিস্তারিত করা যেতে পারে, কিন্তু সামান্য দু-এক কথায় যদি কাজ হয় তো অযথা অপসংস্কৃতির কাদা ঘাঁটিতে কে চায়। সুতরাং অলমিতিবিস্তরেণ।

তিন

এখন বড় কথা হল অতীতে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে বোধহয় অপসংস্কৃতির প্রভাবটাই বড় কথা নয়। বড় এবং গৌরবের কথা এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ

প্রগতিশীল সংস্কৃতির সফল সংগ্রামের কথাটাই। পুরাতন সমাজ পচে উঠেছিল এটা সত্য, বৃটিশ বুর্জোয়া এদেশে এসে অত্যাচার-অবিচারের শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল একথাও সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বোধ হয় বড় দ্বান্দ্বিক সত্য এই যে, এই শোষিত-অত্যাচারিত-পচা-গলা সমাজের গর্ভে এক নূতন সুস্থ সংস্কৃতির অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখা দিচ্ছিল। বৃটিশ বুর্জোয়ার হাতে শুধু অত্যাচারের অস্ত্রই ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল বাষ্পশক্তি এবং কণ্ঠে ছিল অবাধ বাণিজ্যের ঘোষণা। এসব এদেশে প্রাচীন গ্রামভিত্তিক অনড় সমাজের মূলে আঘাত করল, মার্কস-বর্ণিত ভারতের বদ্ধজলাভূমিতে জাগল রূপান্তরের স্পন্দন। বৃটিশ বুর্জোয়া তার নতুন অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে এনেছিল ব্যক্তিবাদ-ভিত্তিক নতুন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, যার আলোকে এদেশেও ভাবী বুর্জোয়া সমাজের কুঁড়িগুলি ফুটতে শুরু করল—জাগরণ ঘটল রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ প্রতিভার। রাজনৈতিক স্বার্থেই রাজা রামমোহন ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। এক পত্রে রামমোহন হিন্দুদের সম্পর্কে বলেছেন: "আমার মনে হয় অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা ও সামাজিক স্বস্তি ও আরামের জন্য তাদের ধর্মে কিছুটা পরিবর্তন ঘটা উচিত।"

রামমোহন এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার। ইতিমধ্যে সমাজক্ষেত্রেও সবেগে অভ্যুত্থিত হলেন বিদ্যাসাগর। প্রাচীন গলিত সমাজটার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা উড্ডীন হল। প্রাচীন সমাজের প্রাক্-সামন্ত এবং সামন্তবাদী নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলো। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের সপক্ষে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হল।

পুরাতনের গর্ভে নূতন সমাজের এই বিপ্লবী অঙ্কুরোদ্গমের প্রতিফলন ঘটেছিল বাংলা নাটকে। বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সমাজে উপস্থিত হয়েছিল ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৭-এর মধ্যে রচিত প্রায় এগারখানি নাটকে তার প্রতিফলন ঘটে। এই এগারখানি নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রামনারায়ণ তর্করত্নের তিনখানি নাটক—কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৬) এবং (পূর্বোক্ত চাঁড়ালের হাতে সমর্পিত নাটক) উভয় সঙ্কট (১৮৬৯), আর উল্লেখযোগ্য দীনবন্ধু মিত্রের বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ও জামাই বারিক (১৮৭২)।

কুলীনকুলসর্বস্ব প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক। কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ নাটকে তীব্র ব্যঙ্গের শানিত অস্ত্র ঝলসে উঠেছে। বহুবিবাহের কুফল দেখানো হয়েছে এ নাটকে। উভয় সঙ্কট একটি ছোট প্রহসন। এতে সপত্নী

সমস্যাকে কৌতুকরসে সিক্ত করে উপস্থিত করা হয়েছে। দুই সতীনের আদরের প্রতিযোগিতায় নাসাগ্রতপ্রাণ স্বামীর "ওরে ছেড়ে দে" আর্তনাদ ধ্বনি শেষ পর্যন্ত বহুবিবাহ প্রথার মর্মমূলে ব্যঙ্গের আঘাত করেছে। বিয়ে পাগলা বুড়ো এবং জামাই বারিক নাটক দুখানিতে নারীর প্রতি পুরুষপ্রধান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীকে আক্রমণ করা হয়েছে।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রতিফলিত হয়েছিল ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত সময়ে লিখিত প্রায় বারখানি নাটকে। উমেশচন্দ্র মিত্র এর পথিকৃৎ।

অনেকে এই সব নাটকের নাটকত্ব সম্পর্কে নানা বিতর্ক তুলে এর অনেক-গুলিকে বাতিল করে দিতে চান। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত বলে মনে করি যে, সেকালের অনুবাদ অনুকরণের জলরাশির মধ্যে এগুলিই প্রথম জেগে ওঠা মৌলিক সামাজিক নাটকের ডাঙা। ডঃ অজিত ঘোষের মতে "...ইহারা সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজ প্রগতির অবিসংবাদী সাক্ষী। আজিকার প্রগতি সাহিত্যের মূল ইহাদের মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে।"

সমাজে গণিকাবৃত্তির প্রসার, সুরাপান এবং তজ্জাত চারিত্রিক পতনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার দুটো দিক ছিল। পুরাতন সমাজের রাজা জমিদার আমলা গোমস্তা সমাজ—বাঈজী, খেমটা ও সুরার মধ্যে তার অবক্ষয়ী রুচি নিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুরাতনের বিরুদ্ধে যে নূতন তরুণ শক্তি বিদ্রোহ করেছিল সুরা ইত্যাদির স্রোত তাদের মধ্যেও বয়ে গিয়েছিল অন্যভাবে। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "...সামাজিক সকল প্রকার বিপ্লবেরই একটা ঘাত-প্রতিঘাত আছে। প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ একদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণও অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রায় গিয়াছিলেন। প্রাচীন সকলি মন্দ এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।"—সুতরাং সুরা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দুটি স্রোতেই সমাজ তৎকালে অবগাহন করেছিল। এই উভয়দিকের বিরুদ্ধেই বাংলা নাটক সেদিন সংগ্রাম ঘোষণা করেছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৮-র মধ্যে রচিত প্রায় সাতখানি নাটক এই সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করছে। এ সংগ্রামের প্রধান পুরুষ মাইকেল, দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' উল্লেখযোগ্য। আর মাইকেল গ্রহণ করেছিলেন দুই হাতে দুই অস্ত্র। পুরাতন সমাজের জমিদারী ব্যভিচারের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছিল 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), নূতন সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছিল 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' (১৮৬০)

সংস্কৃতি বিকার যে শুধু সুরা গণিকা তথাকথিত চরিত্রহীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। সংস্কৃতি বলতে যদি "Essential ways of life of the whole people" বুঝি তবে রাজনৈতিক ব্যভিচার অত্যাচারও সংস্কৃতির অপলাপ বলেই ধরতে হবে। সেদিক থেকে বৃটিশ বণিকগোষ্ঠীর শোষণ-অত্যাচার ও লুণ্ঠন নীলকরদের হাতে এমন এক সংকটময় পরিণতি লাভ করেছিল যেখানে তার বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেই কৃষক বিদ্রোহের অগ্নিময় প্রতিফলন ঘটেছিল দীনবন্ধুর বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত মিলিয়েই সমাজের সামগ্রিক বাস্তবতা। কাজেই বলা যায়—"নীলদর্পণ সধবার একাদশী এই দুয়ে মিলিয়ে তখনকার জীবনের "টোটাল রিয়ালিটি" অর্থাৎ সমগ্রতার ছবি এবং দীনবন্ধু তার শিল্পী।" (বিনয় ঘোষ, বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাঙ্গালী সমাজ—গণনাট্য পত্রিকা)

এর সঙ্গে যুক্ত হল সুস্থ উপস্থাপনা। বাঙালীর নাট্যশালা স্থাপন ও বাগবাজার অ্যামেচার Elite-গোষ্ঠী এই সময়ে উপস্থাপনার মাধ্যমে পুরাতন বিকৃত রুচির মোড় ঘুরিয়ে দিল।

নাট্যশালা ও নাট্যোপস্থাপনার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় সব দেশেই সংস্কৃতির অপলাপের যুগে অপসংস্কৃতির হাত ধরে নেমে আসে নাটকের উপর আক্রমণ। শ্রেণীনির্ভর সমাজের যুগসন্ধিক্ষণের এটা যেন অপরিহার্য লক্ষণ। জীবননিষ্ঠ বাস্তবতার নাটক নীলদর্পণ উপস্থাপনার সময় কিভাবে ইংরাজরা তার উপর সশস্ত্র হামলা চালায় তার বিবরণ আছে নটী বিনোদিনীর আত্ম-কথায়। লক্ষ্ণৌয়ে কিভাবে "কতকগুলো লালমুখো গোরা তরওয়াল খুলে স্টেজের উপর লাফিয়ে পড়তে এলো" বিনোদিনী তার জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু এ তো গেল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির আক্রমণ। পরে এরা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সাহায্যে নাটক বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শুধু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ নয়, স্বদেশী জমিদার শ্রেণীও যেন-তেন-প্রকারে অপছন্দ নাটক বন্ধ করার জন্য নানা বিকৃত পথ অবলম্বন করেছিলেন। পাইকপাড়ার রাজারা কীভাবে মাইকেলের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা অভিনয় বন্ধ করেছিলেন তার ইতিহাস সকলেরই জানা আছে।

অপর দিকে অবশ্য ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একাংশও এমনি চক্রান্ত করেই মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকের অভিনয় বন্ধ করেছিলেন। (ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা নাট্যনিয়ন্ত্রণের ইতিহাস', ৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

চার

কিন্তু যতই আক্রমণ ঘটুক স্বদেশী বা বিদেশী কোন প্রতিক্রিয়াচক্রই সেকালে সুস্থ নাটকের বিকাশ ও উপস্থাপনাকে বন্ধ করতে পারেনি। জীবননিষ্ঠ নাটককে সেকালে ন্যাশনাল থিয়েটার তুলে ধরেছিল সকল বিরুদ্ধ অবস্থাকে উপেক্ষা করেই।

কিন্তু আরো একবার অতি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতির অপলাপ ঘটেছিল এবং বাংলা নাটক তার শিকার হয়েছিল। বৃটিশ বুর্জোয়া যখন এদেশে প্রথম পদার্পণ করে তখন (মার্কসের কথায়) "ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিল।" বুর্জোয়ার এই বিপ্লবী ভূমিকা তার ফিউডাল-বিরোধিতার পটভূমিকায়ই দেখতে হবে।

এদেশে নবোত্থিত বুর্জোয়া সমাজের যে সামন্ত-বিরোধী বিপ্লবী ভূমিকা দেখা গিয়েছিল তা ঐ বৃটিশ বুর্জোয়ারই প্রভাবে। কিন্তু নিজের বিপ্লবী ভূমিকাকে বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সূত্র ধরে যখন ব্যাপক গণজাগরণ এবং বিশেষভাবে কৃষক অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে লাগল তখন ভীত বুর্জোয়া শ্রেণী আপন স্বার্থে আবার সামন্তবাদের সঙ্গে হাত মিলায়। খোদ বৃটেনেই তখন এইভাবে দিকৃস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কাজেই যে বিপ্লবী বুর্জোয়ার প্রভাবে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের অভ্যুদয় ঘটেছিল তার নিজের চরিত্র স্খলিত হওয়ার সঙ্গে এদেশেও রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের সাংস্কৃতিক দিকৃস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। আবার এই পরিবর্তিত বৃটিশ বুর্জোয়ার প্রভাবও এদেশে পুনরুত্থানবাদের জন্মের কারণ হল। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক মতবাদে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। এই মতবাদের ধারা ধরেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের পরিবর্তে আসে নব-হিন্দুধর্মের জোয়ার। এই মতবাদ বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রগতিশীল আন্দোলনেও বিরোধিতা করে।

এর প্রভাব পড়ল বাংলা নাট্যসাহিত্যে। বাংলা নাট্যক্ষেত্রে গিরিশ-চন্দ্রের সকল অবদান স্বীকার করেও বলতে হয় তাঁর প্রভাব শেষ পর্যন্ত বাংলা নাটকের পক্ষে শুভ হয়নি। তেমনি অমৃতলালের প্রভাবও। এ সম্পর্কে বাংলা নাটকের ইতিহাসকার ডঃ অজিতকুমার ঘোষের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তিনি লিখেছেন: "উনিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজে··প্রগতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগেই প্রগতি পরাগতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যে বিধবা বিবাহের সমর্থনে এককালে বহু গ্রন্থাদি রচিত হইতে দেখিয়াছি সেই

বিধবার প্রণয় ও পরিণয় কঠোরভাবে নিন্দিত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গিরিশচন্দ্রের নাটকে। যে নারীকে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল করিয়া মাইকেল ও দীনবন্ধু সূর্যালোকিত মুক্ত জগতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাকেই আবার শাস্ত্রের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া অসূর্যম্পশ্যা গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল নিশ্চিন্ত হইলেন। শুধু তাহাই নহে পৌরাণিক আদর্শপ্রাপ্ত সতীত্ব ও স্বামীভক্তির এক ধন্বন্তরি সুধা খাওয়াইয়া তাহাকে নিস্তেজ ও সম্মোহিত করিয়া রাখিলেন।" আরো বড় কথা, গিরিশচন্দ্র নীলদর্পণের বাস্তবনিষ্ঠ মাটির সংগ্রামের ধারাকে পৌরাণিক ভক্তিরসের স্রোতে ভরিয়ে দিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধারাও নূতন সংগ্রামের সম্মুখীন হল। এ সংগ্রাম ক্ষুদ্রের সঙ্গে মহতের। সুস্থ সংস্কৃতির দিকে নাটকের মোড় ফেরালেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নাটকে বিশ্ব বুর্জোয়ার ইতিবাচক ভূমিকাটি উদারতার সংলাপে আবার কথা বলল। তাঁর নাটকে পূর্ব যুগের নানা অপসংস্কৃতিভিত্তিক বক্তব্যের উত্তর ধ্বনিত হল। মাইকেল যে নারীকে তার দেবীত্ব ঘুচিয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল করেছিলেন—সেই নারী গিরিশ-অমৃতের যুগে আবার দেবীত্ব অর্জন করে রাহুগ্রস্ত হয়েছিলেন। সেই রাহু-গ্রাস থেকে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ আবার তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং মানবীর মর্যাদা দান করলেন। তাঁর চিত্রাঙ্গদার মুখে শোনা গেল পূর্ব যুগের সিদ্ধান্তের জবাব—

> "আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।
> দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
> পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে, সেও আমি নহি।"

তেমনি সে যুগের অনেক প্রশ্নের উত্তর ধ্বনিত হয়েছে অচলায়তন প্রভৃতি নাটকে।

পাঁচ

এর পরের অধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

গোটা মানবজাতির পক্ষেই এ যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এ যুদ্ধের তাৎপর্যের দুটি দিক্ রয়েছে। প্রথমতঃ এর ক্ষয়ক্ষতির দিক্ যা সমাজের পুরাতন অনেক মূল্যবোধের মূলে আঘাত করেছে। দ্বিতীয়তঃ

এর বিশ্ব-পরিস্থিতি পরিবর্তনকারী ভূমিকা, যার ফলে একদিকে ধনতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদ—এই উভয়েরই ভবিষ্যৎ সন্দেহাতীতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল। কোন বিশেষ দেশের নয়, গোটা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক জগতেই এই দুদিকের বস্তুগত পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েটের বিজয়ে একদিক থেকে সারা বিশ্বের নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিগন্ত দেখা দিল এবং তাদের মানস-উজ্জীবন ঘটল। তেমনি নিপীড়ক শোষক শ্রেণীগুলি এবং তাদের 'স্যাটালাইট'দের সামনে নিশ্চিতভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভবিষ্যৎ দেখা দিল; আর এই ভবিতব্যের ইঙ্গিতে তাদের মানস ক্ষেত্রে দেখা দিল হতাশা ও টিকে থাকার শেষ লড়াইয়ের হিংস্রতা। উভয় দিকের এই মানসিকতা,—এই জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামের দ্বারাই বিশ্বসংস্কৃতির সন্ধিক্ষণ চিহ্নিত হল।

এর প্রতিফলন ঘটল বিশ্ব-নাট্য জগতেও। এ যুদ্ধের ফলে যে শ্রেণীগুলির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, তাদের কাছে জগৎ হয়ে দাঁড়ালো অর্থহীন, শূন্য, 'অ্যাবসার্ড'। এই শূন্যতা, এই 'অ্যাবসার্ডিটি'র নাট্যপুরোহিত হলেন প্রবীণ নাট্যকার ইউজিন আয়োনেস্কো। তাঁর নাটকের প্রভাব সারা বিশ্বের হতাশাগ্রস্তদের মধ্যে অনুভূত হল। অন্যপক্ষে যে শ্রেণীগুলির সামনে মুক্তির দিগন্ত উন্মোচিত হল তাদের থিয়েটার 'পিপল্স থিয়েটার' আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করল। দুই পক্ষের আদর্শগত সংঘাতও নাট্য ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হল। আয়োনেস্কো একদিকে "hunting presence of death"-এর ছবি আঁকলেন তাঁর নাটকে অন্যদিকে আক্রমণ করলেন 'পিপলস্ থিয়েটার'কে। তাঁর এই আক্রমণকে মার্টিন এলসিন "reply to the attack...from committed leftwing realities" বলে দাবী করেছেন। এই দীর্ঘশ্বাস ও তিক্ততায় নাট্যাকাশ যখন পরিপূর্ণ তখন বাংলা নাট্যক্ষেত্রে ঘটল অন্য ঘটনা। এখানে ঐ দীর্ঘশ্বাসের নাটক তেমন প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হল না। কারণ তখন বাংলা সাহিত্যের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ এখানে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আবার এই ঘটনার কিছুদিন আগেই (১৯৩২ সালে) তিনি 'রথের রশি' নাটিকা লিখে শোষিত মেহনতী শ্রেণীর প্রতি তাঁর প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন:—"ওরাই আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ। স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন। এবার থেকে মনে রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।" (রথের রশি)

১৯৪১-এ যুদ্ধ সঙ্কটবিন্দুতে উপনীত হবার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন

'সভ্যতার সঙ্কট'। তাতে রবীন্দ্রজীবনের বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের শেষ আর্তনাদ ধ্বনিত হল একদিকে, অন্যদিকে সোভিয়েটের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড মানুষের প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা রেখে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

যুদ্ধ এযুগের সমাজে ঘটিয়েছিল সংস্কৃতির অপলাপ, কিন্তু নাট্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহ্য রেখে গেলেন তাতে বাংলা নাটকে তৎকালে আয়োনেস্‌কোর নেতিবাদ বা 'অ্যাবসার্ডিজম্' প্রাধান্য লাভ করতে পারল না। বরং এই ঐতিহ্যকেই আরো এগিয়ে নিয়ে গেল তৎকালে উদ্ভূত গণনাট্য আন্দোলন। "...যুদ্ধের ফলাফল জনজীবনে বিপর্যয় নিয়ে এলো, বৃটিশসাম্রাজ্যবাদ, কালোবাজারী এবং খাদ্যমজুতদার মিলে বাংলাদেশে এক মহা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করল। সমগ্র দেশ এ অবস্থার মোকাবিলায় প্রস্তুত হল এবং বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুক্তিলাভের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ("পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট", গণনাট্য সঙ্ঘের ৩য় রাজ্য সম্মেলন।)

"এই পরিস্থিতিতে নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যে যে প্রগতিশীল লক্ষণগুলি আত্ম-প্রকাশ করেছিল তাকে সুসংহত, শক্তিশালী করার জন্য ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ গঠিত হয়।" (১৯৪২, গণনাট্য সঙ্ঘের বম্বে সম্মেলনের রিপোর্ট।)

এই যুগেই যুদ্ধজনিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির নাটক হল 'হোমিওপ্যাথি', 'লেবরেটারী' 'জবানবন্দী' এবং বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটক যা সেদিন নাট্যজগতের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

ছয়

এর পরের অধ্যায়ে বাংলা নাটকের উপর অপসংস্কৃতির আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল ষাট-সত্তরের দশকে। এই সময়ে সামাজিক অবস্থার মধ্যে দেখা যায় একটি দ্বৈততা। একদিকে শাসক শ্রেণীর শোষণ-পীড়ন, দুর্নীতিপরায়ণতা, হিংস্রতা যেমন তুঙ্গে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে শোষিত মেহনতী শ্রেণীর সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠেছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রথম পরাজয় ঘটে এবং বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এতে শোষক শ্রেণীগুলি আতঙ্কিত হয়ে চক্রান্ত করে এবং অতি হীন অগণতান্ত্রিক পন্থায় জনপ্রিয় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটায়। এই পতনের পর রাজ্যের বামপন্থীদের উপর চলে প্রতিশোধমূলক অকথ্য নিপীড়ন। কিন্তু ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮তে অবশেষে জনগণের প্রতিরোধে এই নিপীড়নকারী (কুখ্যাত প্রফুল্ল ঘোষ) সরকারেরও পতন ঘটে এবং ১৯৬৯-এ আবার যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে—তেরো মাস পরে শাসক

শ্রেণীর চক্রান্তে তারও পতন—ইত্যাদি। এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী জনগণের শিবির যতই শক্তিশালী হয়েছে ততই ভীত শোষক-শাসক শ্রেণীর হিংস্র আক্রমণ বেড়েছে। অবশেষে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, সন্ত্রাস, গুণ্ডামী ও পরিকল্পিত হত্যার রক্তস্রোতে সমাজের সুকুমার সত্তাকে ডুবিয়ে দেবার উন্মাদ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে চলল সংগ্রামমুখী সমাজমানসকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেবার অপসংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র।

শাসক শ্রেণীর এই অপসংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র যে বাংলা নাট্য ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হয়েছে তা প্রথম নগ্নভাবে ধরা পড়ে ১৯৬৭ সালে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নামে বুদ্ধদেব বসু ইতিপূর্বে একখানি নাট্যরচনা করেন। এই নাটক সম্পর্কে (১৯৬৭ সালে) 'নন্দন' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয় রচনায় মন্তব্য করেন: "যৌন রচনার এমন নগ্ন প্রকাশ একমাত্র যৌনবিকারগ্রস্ত মানুষের পক্ষেই সম্ভব—কোন সৎ সাহিত্যে এ ধরনের অকুণ্ঠ অশালীন প্রকাশ বিরল।"

হঠাৎ দেখা গেল এহেন নাটক বেতারে প্রচার করা হল। এতেই শেষ নয়, আশ্চর্যের বিষয় দেশে অনেক সৎ সুস্থ বুদ্ধির নাট্যকার থাকতেও (১৯৬৭ সালে) ঐ নোংরা নাটকখানিই কেন্দ্রীয় সরকার চিমটে দিয়ে বেছে তুললেন এবং তাকে প্রদান করলেন—আকাদেমি পুরস্কার !! আর্টের দোহাই পাড়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের বুঝতে আর বাকী রইল না শাসকরা কী উদ্দেশ্যে কী করতে চান। তার কিছুদিনের মধ্যে চলল সৎ নাটকের অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেবার তথা-কথিত 'আইনী' এবং তৎসহ গুণ্ডা মারফত বেআইনী হামলা। এই হামলার "গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ায়" রঙ্গমঞ্চ দখল করল—অপসংস্কৃতির 'বারবধূ' ও "সায়গনে"র দল। এ সব নাটকের বিস্তারিত আলোচনা করে লাভ নেই। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে 'বারবধূ' নিয়ে ইদানীং কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। 'বারবধূ'র সপক্ষের উকীলরা এর বিষয়বস্তুর কথা তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এ নাটকে কোন অশালীনতা নেই, বরং এর মাধ্যমে বর্তমান যন্ত্রণাবিদ্ধ সমাজের নীরব একটি মহান সমস্যাই পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে! এত সহজ সরলীকৃত যুক্তিতে এ নাটক পার পেতে পারে না। কারণ "ভালবাসার ব্লো-হটে"র 'হিট' দিয়ে গরম করে কোন সমস্যা উপস্থিত করলেই নাটক সৎ হয়ে যায় না। এই সমস্যাই বর্তমান সমাজের প্রকৃত জ্বলন্ত সমস্যা কি না? সমস্যাটা কোন্ অসুস্থ ইঙ্গিত নিয়ে রচনার কোন্ প্রবণতাকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করেছে, লেখক সমস্যার মূল ভিত্তিটাকে সঠিকভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছেন কিনা, তার সুস্থ সমাধানের কোন ইঙ্গিত দিয়েছেন

কিনা, রচনার সামগ্রিক ফলশ্রুতি পাঠকের উপর কী—এসব অনেক কিছু বিচার করার আছে। এসব প্রশ্নের বিচার বর্তমান প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু এইটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে—একদা রামনারায়ণের নাটকও যে কারণে চাঁড়ালের হাত দিয়ে পোড়াবার প্রস্তাব এসেছিল সেই কারণটা এখানেও উপস্থিত এবং অনেক বড় আকারেই উপস্থিত। 'বিষয়বস্তু'র তর্কের আড়াল দিয়ে নাট্য উপস্থাপনাটা লুকিয়ে সরে পড়তে পারে না।

যাই হোক, এইভাবে নাট্য নোংরামি একালে আর শুধুমাত্র স্থূপারস্ট্রাকচারের হাওয়াতেই ভাসমান রইল না—তা গণনাট্য কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলার বাস্তবরূপ ধারণ করল। সে রূপের রক্তরঞ্জিত ছুরিকা প্রবীরের হত্যা পর্যন্ত প্রসারিত।

কিন্তু—এত করেও বাংলা নাটকের সংগ্রামী গতিকে শোষক শ্রেণী বন্ধ তো করতে পারেইনি বরং তারই পতাকা বিজয় গৌরবে উড়ছে—গণনাট্য এবং অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারের মুক্ত মঞ্চের শিখরে শিখরে। আজকের নাট্যজগতের দিকে তাকিয়ে দেখলে তার প্রমাণে নাটকের তালিকা দেবার প্রয়োজন হয় না নিশ্চয়ই। অপসংস্কৃতি হচ্ছে—মৃত্যুমুখী একটা অপ-সমাজের মরণকালীন আক্ষেপ, তার আপাতদাপট যতই বিধ্বংসী হোক না কেন, তার সামনে মৃত্যুর মহাশ্মশান হা হা করছে। এ ভবিতব্যকে সে এড়াতে পারে না। কিছু গরল মাত্র উদ্গীরণ করে সাময়িক কিছু বৈক্লব্য সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সুস্থ নাট্য আন্দোলন যার সামনে মুক্তির দিগন্ত, উজ্জ্বল ভবিতব্য, সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে, সমস্ত গরলের বিষকে সে মুছে দেবে। বিষাক্ত বাষ্প কেটে গিয়ে উজ্জ্বল নীল নাট্যাকাশে প্রগতির বিজয়সূর্যের উদয়লগ্ন সমাসন্ন—এইটেই অন্তর থেকে বিশ্বাস করি।

চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতি

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের সাদা পর্দা যদি সত্যই তার সত্যকে প্রকাশ করত, আজ বিশ্বে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিতে পারত। কিন্তু আপাততঃ আমরা সুখে নিদ্রা যেতে পারি, কেননা চলচ্চিত্রকে বেশ করে আফিং খাইয়ে শেকল পরিয়ে রাখা হয়েছে।

—লুই বুনুয়েল (১৯৬০)

"ফটোগ্রাফি হচ্ছে সত্য—এবং চলচ্চিত্র হচ্ছে সেকেণ্ডে চব্বিশ বার করে সত্য", বলেছেন জ্যাঁলুক গোদারের একটি ছবির নায়ক*—জ্যাঁলুক গোদার, যিনি বর্তমান কালের বিশ্বচলচ্চিত্রের বিপ্লবের পুরোধা। কথাটা তীব্র ব্যঙ্গাত্মক, কেননা কোন কিছুই সেকেণ্ডে ২৪ বার করে এবং শুধুমাত্র ২৪ বার করেই সত্য হতে পারে না। অথচ চলচ্চিত্রের ভাববাদী নন্দনতাত্ত্বিকরা ফটোগ্রাফিকে 'সত্য' বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর—তাঁদের যুক্তি যেহেতু ফটোগ্রাফিতে বাস্তবতার ছবি তুলে আনা হয় 'ক্যামেরা' নামক এক বৈজ্ঞানিক নিপুণ যন্ত্রের মাধ্যমে যা কিনা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, তাই তার ব্যক্তিনিরপেক্ষতাই সত্যের প্রমাণ। আর তা যদি সত্য হয়, তবে চলচ্চিত্র তো সেকেণ্ডে ২৪ বার করে সত্য হবেই, কেননা সেকেণ্ডে ২৪টি স্থির ফটোগ্রাফ পর্দায় প্রতিফলিত হয় বলেই ছবি চলমান (চলৎচিত্র) হয়।

ওপরের এই ছোট্ট ব্যঙ্গাত্মক কথাটির মধ্যে চলচ্চিত্র মাধ্যমের অনেক সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র মাধ্যম নিয়ে যে কোন আলোচনার সময় সেই সত্যকে জানা দরকার। চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে এমন কতগুলি অন্তর্নিহিত গুণ আছে যা প্রচণ্ড বৈপ্লবিক সুপ্ত ক্ষমতার অধিকারী, আবার এমন গুণও আছে (অনেক ক্ষেত্রে একই গুণকে ব্যবহারের ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রযুক্ত করা যায়) যা শাসকশ্রেণী কর্তৃক স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখা ও অপসংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জরুরি। গোদার প্রমুখ মার্কসবাদী চলচ্চিত্র স্রষ্টা ও তত্ত্ববিদরা দেখিয়েছেন শ্রেণীস্বার্থে বুর্জোয়া শাসক গোষ্ঠী সারা বিশ্বে কিভাবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে কয়েকটি মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে এসেছে ও আসছে। একটি মিথ্যা হল (১) বাস্তবতা হচ্ছে দৃশ্যমান। অর্থাৎ আমাদের যে একটি ধারণা

---

*গোদারের 'ল্য লীটল সোলজার' ছবির নায়ক ব্রুনো।

আছে যা দেখি তাকেই সত্য বলে বুঝে ফেলি—এটি সঠিক ধারণা। বস্তুতঃ ইংরিজি সহ অনেকগুলি ভাষায় আমরা 'বুঝছি' (আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড) বলতে বলি 'দেখছি' ('আই সী')। দ্বিতীয় মিথ্যাটি হল (২) ক্যামেরা যা তুলে আনে তা সত্য, কেননা ক্যামেরা ব্যক্তিনিরপেক্ষ এক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র । প্রধানতঃ এই দুটি মিথ্যার জোরে হলিউডের এবং আমাদের সর্বভারতীয় হিন্দী ছবির শতকরা নব্বই ভাগ ছবি এক ভয়ংকর বিকৃত মিথ্যা বাস্তবতাকে সত্য বলে দেখিয়ে কোটি কোটি মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। বুর্জোয়া চলচ্চিত্রের এই যাদু-মন্ত্রগুলি আজ মার্কসবাদী চলচ্চিত্রবিদরা ফাঁস করে দিচ্ছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন ক্যামেরা মোটেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় বরং পরিচালকের সত্য বা মিথ্যা মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত একটি হাতিয়ার মাত্র, ঠিক লেখকের কলমের মতই। এবং দৃশ্যমান বস্তুমাত্রই বাস্তব নয়, তা কি অর্থে মণ্ডিত—তার ওপরই বাস্তবতার সত্যতা নির্ভরশীল। এবং যেহেতু চলচ্চিত্রের নির্মাণের সমস্ত ব্যাপারটাই, যথা অর্থের জোগান, উৎপাদন, ছবির পরিবেশনা, সেনসরশিপ এবং ছবির সমালোচনা —এ সবই (ব্যতিক্রম ছাড়া) নিয়ন্ত্রিত হয় শাসকশ্রেণীর মতাদর্শ দ্বারা—তাই পর্দায় প্রতিফলিত বাস্তবতার অর্থ-মণ্ডিত করার ব্যাপারটাও একইভাবে শাসকশ্রেণীর মিথ্যা মতাদর্শে বিকৃত করা হয়। অর্থাৎ এমনভাবে বাস্তবতাকে দেখানো হয় যে তার মধ্যে শুধু একটাই অর্থের ব্যঞ্জনা বের হয়ে আসে যা শাসক-শ্রেণীর মতাদর্শে জারিত।

তীব্র কঠিন রাজনৈতিক লড়াই ছাড়া চলচ্চিত্রে জনগণ সুখী হবারস্বপ্ন সম্ভাবনাকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। অথচ চলচ্চিত্রের সত্যকে রাহুমুক্ত না করতে পারলে সর্বনাশ। চলচ্চিত্র সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম বলে, এবং মানুষকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে গূঢ় যাদুমন্ত্রগুলি তার করায়ত্ত বলে, সামাজিক সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় চলচ্চিত্রকে নিয়েই বেশি ভাবনার কথা, এমন আর কোন শিল্প-মাধ্যম নিয়ে নয়। অপসংস্কৃতির আফিং খাওয়ানোর ব্যাপারে একটি বিকৃত উপন্যাস বা নাটকের চেয়েও একটি বিকৃত ছবি অনেক শতগুণ মানুষের ক্ষতি করে—বিশেষতঃ গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষের, যারা এদেশের সত্তর শতাংশ।

চলচ্চিত্রের যে যাদুমন্ত্রগুলিকে অপসংস্কৃতির কাজে ব্যবহার করা হয়, সেগুলির কয়েকটির রহস্য আমাদের জানা উচিত। এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে সংক্ষিপ্ততর আলোচনা করা হচ্ছে।

চলচ্চিত্রের যাদুমন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে যেটি ক্ষমতাশালী সেটি হচ্ছে,

চলচ্চিত্রের মধ্যে যে বাস্তবতার ছবি দেখি, চলচ্চিত্র তার প্রতি আমাদের গভীরতর বিশ্বাস অর্জন করিয়ে দিতে পারে। সৎভাবে প্রযুক্ত হলে এর সুফল যেমন বিপুল, অসৎভাবে প্রযুক্ত হলে এর চেয়ে ক্ষতিকর কিছু নেই। এবং দ্বিতীয়টিই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। জোরিস ইভান্স-এর ভিয়েৎনামের ওপর তোলা তথ্যচিত্র, যে-কোন মহৎ সাংবাদিকের লিখিত রিপোর্টের চেয়েও বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, কেননা প্রথমটির ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় আমরা বাস্তবতাকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম। কিন্তু তেমনি জন ফোর্ডের মত বিপুল শক্তিমান পরিচালক যখন কোরিয়ার ওপর তথ্যচিত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালী করেন, তখন সেই ছবি দেখে বিশ্বাস করলে আমরা কিরকম ক্ষতিগ্রস্ত হই তা ভেবে দেখার—কার্যতঃ যা ঘটেছিল সহস্র সহস্র আমেরিকার নাগরিকদের ক্ষেত্রে। এই যাদুর উৎস আছে দর্শকের মনস্তত্ত্বের মধ্যে—চাক্ষুষ কিছু দেখলে তাকে বিশ্বাস করে নেওয়ার বৃত্তি—হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যও সত্যাসত্য বিচারের প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়। দু-একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন মানুষকে বাদ দিলে অসংখ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা সত্য। প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্রের মতানুসারে সেই পরিচালককে দক্ষ বলা হয় যিনি দর্শকের মধ্যে যে অবিশ্বাস করার বৃত্তি আছে তাকে নিরুদ্ধ করে রাখতে পারেন—যাকে বলা হয় 'সাসপেনসন অফ ডিসবীলিফ'। এটাও বুর্জোয়া চলচ্চিত্রের একটি যাদুমন্ত্র। এবং এটি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে ভালভাবে সম্ভব। সাহিত্যে নয়, যাত্রা বা থিয়েটারেও নয়। তার কারণ সাহিত্যে 'বাস্তবতা' কখনোই সশরীরে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয় না, হয় সাহিত্যের ভাষার মাধ্যমে—যে ভাষা হচ্ছে কতকগুলি 'চিহ্ন'সমষ্টি। একমাত্র যে সেই ভাষার 'চিহ্ন' পাঠ করার শিক্ষায় শিক্ষিত সেই পারে তার মধ্যে নিহিত বাস্তবতার চিত্রকে উপলব্ধি করতে—এবং তাও নিজের কল্পনাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা (এবং এটা একটা মস্ত বড় ব্যাপার, যেজন্য সাহিত্যের পাঠককে একেবারে অনচেতনভাবে প্রভাবিত করা তুলনামূলক-ভাবে দুরূহ)। চলচ্চিত্রে 'বাস্তবতা'(তা সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন) দর্শকের সামনে সশরীরে উপস্থিত, এবং এই বাস্তবতার 'ইমেজ' বা 'চিত্রপ্রতিমা'ই চলচ্চিত্রের ভাষা। যদিও উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিত্রপ্রতিমার পাঠোদ্ধারের সমস্যা সর্বদাই থাকে, কিন্তু এমন চলচ্চিত্র সম্ভব যার মধ্যে পাঠোদ্ধারের জটিলতা থাকে না, দর্শকের নিজের বিচারবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন আদৌ জরুরি নয়। এক্ষেত্রে পর্দায় প্রতিফলিত সত্য বা মিথ্যা বাস্তবতা একেবারে সশরীরে এসে দর্শককে প্রভাবিত করে চলে যায়। সুতরাং নিরক্ষর সরল দর্শকদের বোকা

বানাবার দিক থেকে চলচ্চিত্রের মত যাদুকরী ক্ষমতা অন্য কোন শিল্পমাধ্যমের নেই। থিয়েটারে বা যাত্রায় বাস্তবতা কখনোই নিখুঁত হয় না, সুতরাং তার প্রভাব চলচ্চিত্রের মত হতে পারে না।

এই প্রভাব আরো তীব্র হয় চলচ্চিত্রের আর একটি ক্ষমতার জন্য—স্বপ্ন দেখানোর ক্ষমতা। যেজন্য ধনতন্ত্রী চলচ্চিত্রের স্বর্গ হলিউডকে বলা হয়েছে "স্বপ্ননির্মাণের কারখানা" (ড্রীম ফ্যাক্টরি)। বাস্তবতঃ কোন চিত্রগৃহে ছবি শুরু হবার আগে যেভাবে হলের আলো মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে নিবে আসে ও নিবে যায়—তা আমাদের তন্দ্রার সময় ধীরে ধীরে চোখ বোজার মতই। অর্থাৎ যেন আমাদের সত্যকার বাস্তবতার জগতের আলো তন্দ্রার মধ্যে নিবে গেল, এবং নিদ্রার মধ্যে যেভাবে স্বপ্নের জগতের পর্দা খুলে যায় তেমনি হলে উপবিষ্ট দর্শকের সামনে চলচ্চিত্রের পর্দার ওপরে ঢাকনা যায় উঠে—এবং শুরু হয় চলচ্চিত্রের স্বপ্ন দেখানো। ইউরোপের একাধিক মনস্তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন একটি জমাটি আকর্ষণকারী ছবি (যেমন হিচককের ছবি) দেখার সময় অনেক দর্শকের প্রতিক্রিয়া অনেকাংশে স্বপ্নদেখাকালীন নিদ্রিত ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মেলে। বিশ্ব-চলচ্চিত্রের একজন মহৎ স্রষ্টা লুই বুনুয়েলও একই মত প্রকাশ করেছেন।*

এরপর ভাবুন স্বপ্নে অমরা 'যে-বাস্তবতা'কে দেখি তা আমাদের কী রকম তীব্রভাবে প্রভাবিত করে নিদ্রাবস্থায়। স্বপ্নের অবচেতনায় আমাদের ঘটে 'অবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি' (টোটাল সাসপেনসন অফ ডিস্‌বীলিফ)—সেই মুহূর্তে যত অকল্পনীয়ই হোক সব কিছুকে মনে হয় ভীষণ রকম সত্য—বা রীয়াল। স্বপ্নের সুখের দৃশ্যে হই পুলকিত, দুঃখের দৃশ্যে বেদনাহত, শোকের দৃশ্যে কাতর, ভয়ের দৃশ্যে আঁতকে উঠি—চিৎকারও করে উঠতে পারি। অবশ্যই চিত্রগৃহে উপবিষ্ট দর্শক নিদ্রাভিভূত স্বপ্নদেখা মানুষের মত অতটা অবচেতন স্তরে থাকেন না, কিন্তু চলচ্চিত্র যে স্বপ্নদেখা মানসিক অবস্থার প্রক্রিয়া অনেকটা সৃষ্টি করতে পারে তা প্রমাণিত সত্য। এবং এর তীব্রতা নির্ভর করে দর্শকের চেতনার স্তরের ওপর। দর্শক যত সরল, যত যুক্তি বুদ্ধি ব্যবহারের দিক থেকে অসচেতন ও অনভ্যস্ত হন, ততই তার ওপর চলচ্চিত্রের স্বপ্নের প্রক্রিয়া তীব্র হবে। এবং অপসংস্কৃতির চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় শিকার তো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নয়, গ্রামাঞ্চলের আত্মরক্ষায় অক্ষম অসংগঠিত সরল নিরক্ষর কৃষকশ্রেণী, যাদের এই

* বুনুয়েল লিখিত Cinema: An Instrument of Poetry প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এবং Film Culture পত্রিকা, ২১তম সংখ্যা, ১৯৬০।

"স্বপ্নে"র হাত থেকে নিষ্ক্রমণের কোন উপায় নেই। এবং তারাই ভারতীয় জীবনের মেরুদণ্ড।

চলচ্চিত্র মাধ্যমের আর একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যকে অপসংস্কৃতির বাহকরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে লক্ষণীয়। এই ব্যাপারটি নিয়ে কেউ এদেশে বিশ্লেষণ করেন না, কিন্তু আজ করা জরুরি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—চলচ্চিত্রের 'ভাষা' ঠিক সাহিত্যের ভাষার মত নয়। চলচ্চিত্র কথা বলে তার চিত্রপ্রতিমার সাহায্যে, কিন্তু তার মধ্যে নিহিত কয়েকটি 'কোড' (code) বা সাব-কোড-এর মাধ্যমে। এই 'কোড'গুলি চিত্রপ্রতিমাকে গভীর অর্থ মণ্ডিত করে।* বহুবিধ 'কোড' ও 'সাব-কোড' আছে। শুধু একটি 'কোড'-এর আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক —তা হচ্ছে 'কালচারাল কোড'—'সাংস্কৃতিক কোড'। দুটি সরল উদাহরণ : একটি মার্কিন ছবিতে দেখানো হলো হৃতসর্বস্ব একটা মানুষ ঘর ছেড়ে চলে গেল, অনেকদিন পরে দেখানো হলো সে দামী পোশাক পরে একটি ক্যাডিলাক গাড়ি চড়ে ফিরছে। পশ্চিমী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল দর্শকের এই দৃশ্যের অর্থ এটুকুতেই পরিষ্কার—লোকটি যেভাবেই হোক ধনী হয়ে ফিরেছে। যে জানে ক্যাডিল্যাক গাড়ি হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর গাড়ি—সে বুঝে নেবে এর অর্থ। অথবা আমাদের 'পথের পাঁচালী'র প্রথম দৃশ্যে দেখানো হল সেজঠাকরুণ ছাতে কাজ করছেন, তাঁর পরনে লাল বা কালো চওড়া পাড়ের শাড়ি। কিছু পরের দৃশ্যে যখন আবার তাঁকে দেখলাম, দেখি তাঁর পরনে সাদা থান। পরিচালক একটিও সংলাপ রাখেননি, কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি লোকাচার সম্পর্কে অভিজ্ঞ দর্শকদের বুঝতে দেরি হয় না যে সেজঠাকরুণ বিধবা হয়ে গেছেন। স্পষ্টতঃ এই সব 'কালচারাল কোড'-এর মধ্যে আমাদের সামাজিক অভ্যাস, লোকাচার সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত—এবং এগুলি 'ভাষা'রূপে কাজ করে ও চলচ্চিত্রের বাস্তবতাকে অর্থ-মণ্ডিত করে। এ পর্যন্ত সব কিছু আমরা জানি—কিন্তু যেটা আমরা খেয়াল করি না সেটা হচ্ছে : চলচ্চিত্র যদি একটি সঠিক 'কালচারাল কোড'-এর দ্বারা একটি বিশেষ বাস্তবতাকে অর্থমণ্ডিত করে, তখন কতকগুলি বিকৃত ও ভ্রান্ত 'কালচারাল কোড'কে যদি পূর্বোক্ত স্বপ্ন দেখানোর প্রক্রিয়ায় মাসের পর মাস বছরের পর বছর দর্শকের মগজে ঢুকিয়ে দেয় তবে একটা বিকৃত মিথ্যা বাস্তবতাকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে পারে কিনা—এবং সেই সঙ্গে একটা অপসংস্কৃতিকে

* Christian Metz-এর "Film Language : A Semioties of Cinema" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। অথবা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত "Major Film Theories-এর পৃষ্ঠা ২২৩-৩০ দ্রষ্টব্য।

বাস্তব সৎ সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিতে পারে কিনা? পারে এবং মূলতঃ আমরা খেয়াল না করলেও এইভাবে সারা বিশ্বে বুর্জোয়া চলচ্চিত্র তার মিথ্যা বাস্তবতাকে সত্য বলে চালিয়ে চলেছে। শৈশব থেকে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনের সংস্কৃতির (এগুলিও যে সর্বত্র আদর্শস্থানীয় তা নয়, কিন্তু এগুলি বাস্তব) থেকে তার সাংস্কৃতিক 'কোড'গুলি সম্পর্কে পরিচিত হই—এবং সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি চলচ্চিত্রের সেই সব 'কোড'গুলি পড়তে পারায় চলচ্চিত্রটির বাস্তবতাকে বুঝতে পারি। তেমনি বিপরীত দিক থেকে শৈশব থেকে বদ্ চলচ্চিত্রের ভ্রান্ত 'কালচারাল কোড'গুলি দেখে দেখে তার ভ্রান্ত অর্থগুলি বিশ্বাস করে করে সত্যকার বাস্তব জগতের সংস্কৃতির রূপ ('ফর্ম')-গুলি ভুল বুঝে অসচেতনভাবে পাল্টে ফেলতে পারি। প্রথমটি চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্বের বিষয়ীভূত—তাই ফিল্ম তাত্ত্বিকরা আলোচনা করেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি হচ্ছে—চলচ্চিত্র যেখানে বাস্তব জীবনকে স্পর্শ করেছে, তাকে পাল্টাচ্ছে, অর্থাৎ চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্বঘটিত দিকটি 'বিশুদ্ধ' ফিল্ম তাত্ত্বিকরা ভাবতে চান না। যদিও এটাই বেশি করে ভাববার। এবং যা ঘটনা, তা ঠিক ঘটে চলে। একজন সবল কৃষক বা শ্রমিক দর্শক মাসের পর মাস বছরের পর বছর পর্দায় দেখছে সরল গ্রামীণ তরুণ-তরুণীরা উচ্চশিক্ষার্থে শহরে যাচ্ছে, ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসার পর তাদের বেশবাস পাল্টাচ্ছে, চালচলন বদলাচ্ছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার বাসনা, উৎকট ও অশালীন ভাষা, বাহুবলের ওপর আস্থা, মেয়েদের ক্ষেত্রে বুকখোলা জামা, যৌনাত্মক অঙ্গভঙ্গী, ধনী হওয়াই জীবনের মোক্ষ, খাওদাও স্ফূর্তি কর মতবাদ—এসব হচ্ছে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবর্তনের 'কালচারাল কোড'। এবং সরল গ্রাম্য দর্শকের কাছে যেহেতু উচ্চশিক্ষা একটা মহৎ ব্যাপার, তাই তারই আনুষঙ্গিক এই সব 'কালচারাল কোড'গুলিও মহৎ না হলেও স্বাভাবিক—এ ধারণা তার হতে পারে।

এটি শুধু একটি সরল উদাহরণ। শুধু গ্রামীণ সরল দর্শকই নন, মধ্যবিত্ত জীবনেও গত বিশ বছর ধরে সর্বভারতীয় হিন্দি অপসংস্কৃতির চলচ্চিত্র—যারে নাম দেওয়া যেতে পারে 'আফিং চলচ্চিত্র'—কি ভয়ংকর প্রভাব ফেলেছে ঠিক এই প্রক্রিয়ায়—লক্ষ্য করুন। এই আফিং চলচ্চিত্রের বেপরোয়া সমাজের আওতায় পড়ে এমন শহরাঞ্চলের হিন্দিভাষী মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত পরিবার আপনি কম পাবেন যেখানে সন্তান বাবাকে 'পিতাজী' বা মাকে 'মা' বা 'মাতাজী' বলে—তারা সব এখন 'ড্যাডি' ও 'মাম্মি' হয়ে গেছেন। পিতার মৃত্যু হলে 'ড্যাডি ডেড্' হয়ে যান। ভেবে দেখুন সমস্ত হিন্দি ভাষাটাকে পর্যন্ত কিরকম

কিম্ভূত ভাষায় বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। বর্তমানে বোম্বে শহরে আধুনিক বা 'মডার্ন' হবার সাংস্কৃতিক 'কোড' হচ্ছে পাছা দুলিয়ে হোটেলে নয়তো বসার ঘরে উৎকট পপ বাজনা বাজিয়ে নাচা। এটা কখনো পাশ্চাত্য সভ্যতা নয়, সেখানে তো মোৎজার্ট বীটোফেন আছে—এ হচ্ছে এক বেজন্মা সভ্যতা, না দেশী, না বিদেশী। প্রেম মানে হচ্ছে মেয়েদের প্রতি অশোভন আচরণ। এবং অনেক তরুণী এটাই মেনে নিচ্ছে, কেননা হিন্দি রঙিন ছবির সাংস্কৃতিক 'কোড' তাকে শিখিয়েছে তরুণদের প্রেম নাকি এভাবেই শুরু হওয়ার রীতি—এটাই আধুনিকভাবে বাস্তব। এক বিকারগ্রস্ত চলচ্চিত্রের অন্তর্নিহিত বিকারগ্রস্ত 'কালচারাল কোড'গুলি বাস্তবজীবনের সংস্কৃতির চেহারা পর্যন্ত দিচ্ছে পাল্টে। এ যে একটা জাতির পক্ষে কী ভয়ানক সর্বনাশ তা নিয়ে আমরা কজন ভাবি? অবশ্য ভাগ্যের কথা, পশ্চিমবাংলায় এই আফিং চলচ্চিত্রের অপসংস্কৃতি এখনো সেইভাবে অনুপ্রবেশ করেনি। তার কারণ আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও বাংলা চলচ্চিত্রের নিজের একটা সুস্থতর ধারা। কিন্তু ঝোঁক সর্বনাশের দিকেই, বিশেষতঃ যেহেতু বাংলার চলচ্চিত্রের ইণ্ডাস্ট্রিই আজ ভেঙে পড়ার মুখে।

বেশির ভাগ চলচ্চিত্রের ভূমিকা জনগণবিরোধী কেন—আফিং চলচ্চিত্রই বেশির ভাগ অ-সমাজতান্ত্রিক দেশে কেন বেশি ক্ষমতাশালী? এর উত্তর নিহিত আছে চলচ্চিত্রের ইতিহাসের মধ্যে। যেহেতু সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্র উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরেই ক্ষমতাবান শ্রেণীর হস্তক্ষেপ আছে, গল্প বাছাই থেকে সেন্সর এমনকি চলচ্চিত্র সমালোচনা সর্বত্র—তাই চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক ঝোঁক পুঁজিবাদের সমর্থক হওয়ার। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য—যা প্রায়শঃই আমরা খেয়াল করি না। চলচ্চিত্র সাহিত্য বা সংগীতের মত শুধুমাত্র 'আর্ট' নয়, সেই সঙ্গে 'ইণ্ডাস্ট্রি'—এবং পুঁজিবাদী দেশে সব ইণ্ডাস্ট্রির মতই এই ইণ্ডাস্ট্রি পুঁজিবাদের করতলগত। এবং এটা রাজনৈতিক ঘটনা। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক। অথচ আমরা যারা সুস্থ চলচ্চিত্রের বিকাশ চাই তারা অনেকেই ভাবতে চাই না এর থেকে মুক্তি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছাড়া কি ভাবে সম্ভব?

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের ভূমিকা চোদ্দ আনা অশুভ, মাত্র দু আনা শুভ। এই শুভ অংশটিকে বিকশিত করার জন্য একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন এদেশে আছে, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন। কিন্তু গত পনেরো বছরের এই আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এই আন্দোলনের দুটি গুরুতর

সীমাবদ্ধতা আছে। এক, এটি শুধুমাত্র শহুরে মধ্যবিত্তভিত্তিক। দুই, সাধারণভাবে এই আন্দোলনের আছে এক ধরনের সৌখিন রাজনীতি-বিরোধিতা, যেন রাজনীতিকে এড়িয়ে চলা সম্ভব, যখন গোদার প্রমুখরা বারবার দেখিয়েছেন চলচ্চিত্রের ইতিহাসটাই একটা রাজনৈতিক ব্যাপার।* চলচ্চিত্র কেন, যে-কোন শিল্পই একেবারে রাজনীতিশূন্য হতে পারে না। এঁরা হয়তো শুনে চমকে উঠবেন, পাশ্চাত্য ক্লাসিক সংগীত ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল, ইউরোপীয় 'এনলাইটন্‌মেণ্ট' সৃষ্টি করেছে মোৎজার্টকে এবং ফরাসী বিপ্লব বীঠোফেনকে।†

চলচ্চিত্রে রাজনীতি আরো গভীরভাবে নিহিত, কেননা চলচ্চিত্র গণমাধ্যম। প্রধানতঃ উক্ত দুটি সীমাবদ্ধতা থাকায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন—যা একটি স্তরে অবশ্য কার্যকরী—তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় আফিং চলচ্চিত্র নামক বিশাল ইন্‌স্টিটিউশনের মোকাবিলা করার—ভারতবর্ষের কয়েক সহস্র চিত্রগৃহগুলি সেই বিরাট ক্ষমতাশালী ইন্‌স্টিটিউশনের শিক্ষায়তন। শহরে গ্রামে গঞ্জে প্রত্যহ তিনবার করে সেখানে মানুষকে বোকা বানাবার খেলা চলছে। এর দুর্বার গতি রোধিবে কে? কি ভাবে? সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান নিয়েই বোঝা যায়, একমাত্র রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষেই তা সম্ভব। এবং তাও রাষ্ট্রক্ষমতার যুক্তিসঙ্গত প্রয়োগের দ্বারা। এবং সেই প্রয়োগ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং গভীরভাবে ভাবলে বুঝতে পারব চলচ্চিত্রকে নিয়ে সত্যকার লড়াই রাজনৈতিক হতে বাধ্য।

আমরা রাজনীতিকে যতই পাশ কাটাই, রাজনীতি আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। ব্রেজিলের একজন চিত্রপরিচালক কলকাতায় ১৯৭৫ সালে এসে বলেছিলেন "হলিউডের ছবি ও তোমাদের হিন্দি ছবি সবই রাজনৈতিক—পুঁজিবাদের প্রচারমাত্র।" এদের চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকরা নামকরণ করেছেন "রাজনৈতিক ছবি—মীথিক।" অর্থাৎ বাস্তবতার নামে এরা একটা 'মীথ' সৃষ্টি করে চলেছে আপাতনিরীহ গল্প শোনাবার নাম করে। গোদার তাঁর বিখ্যাত 'উইণ্ড ফ্রম দ্য ইস্ট' ছবিতে দেখিয়েছেন বুর্জোয়া সিনেমা বুর্জোয়া স্বপ্নগুলিকে 'বাস্তব সত্য' বলে চালায়, এমনভাবে যেন বাস্তবকে মনে

---

* O. U. Press প্রকাশিত Major Film Theories—পৃঃ ২৩৭-৩৮। অথবা Godard on Godard গ্রন্থ।

† পাশ্চাত্য সংগীতের যে কোন প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ। যেমন 'The Pelican History of Music.' 3rd Vol. পৃঃ ১১ ও ৭৫-৯৫।

হয় বাস্তবের চেয়ে বাস্তব। গোদার বলেছেন, আমাদের মধ্যে কোন দৃশ্য বা চরিত্র দেখলে তার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করার যে বৃত্তি আছে—তাকেই এই সব ছবি এমন কৌশলে কাজে লাগায় যে আমরা অজানতে, মুগ্ধ হয়ে, অসচেতনভাবে বুর্জোয়া সিনেমার সেই স্বপ্নে অংশগ্রহণ করে ফেলি, এমনকি আমাদের পকেটের পয়সা খসিয়ে।* তারা তাদের মতাদর্শকেই শুধু জয়ী করে রাখে না, উপরন্তু এই স্বপ্নগুলিকে বাজারজাত করে লুণ্ঠন করে অজস্র মুনাফা—এমনই শক্তিমান এই বুর্জোয়া সিনেমার ইনস্টিটিউশন!

ভারতবর্ষে এই খেলা চলছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। এগুলি কোনটাই 'বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক' নয়। এগুলি যদি রাজনৈতিক খেলা না হয় তবে রাজনীতি কাকে বলে?

চলচ্চিত্র শিল্পের অপরিমেয় শক্তিমান যাদুমন্ত্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে আফিং চলচ্চিত্র যে সব অপসংস্কৃতির বীজস্বরূপ অসুস্থ ও বিকৃত চিন্তাধারা ছড়িয়ে চলছে তার মাত্র কয়েকটির অতিসংক্ষিপ্ত সাধারণ বিবরণ দেওয়া হল। বেশির ভাগই হিন্দি ছবির, কিন্তু কিছু বাংলা, তেলেগু, মালয়ালম ইত্যাদি আঞ্চলিক ছবির বক্তব্যও এক।

(১) যৌনতা—যা সর্বকালে সর্বদেশে মানুষের চেতনাকে ভোঁতা করার মহৌষধ। আফিং চলচ্চিত্রের এই যৌনতা, এবং তাকে নিয়ে সরকারী সেন্সর বোর্ডের কাঁচির চালাকি (অবশ্য কংগ্রেসী যুগের, নূতন সরকার কী করেন দেখার অপেক্ষায়) একটা সর্বজনবিদিত কুৎসিত ঘটনা।

(২) অর্থসম্পদের প্রতি, আরামের রঙিন জীবনের প্রতি ও লাস্যময়ী নারীর প্রতি তীব্র লোভের উদ্রেক।

(৩) উৎকট এক বিজাতীয় সংস্কৃতিকে দেশীয় সংস্কৃতির জায়গায় চালানোর চেষ্টা।

(৪) আমাদের চারিদিকের রূঢ় বাস্তবতাকে ভুলিয়ে দিয়ে এক স্বপ্নসম মিথ্যা বাস্তবতাকে সত্য বলে ভাবান—যাতে দুঃসহ বাস্তবতা থেকে উত্থিত ক্রোধ ও সমাজকে পাল্টানোর স্পৃহা লুপ্ত হয়ে সবাই স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়।

(৫) গরীব নিরক্ষর সরল মানুষকে বোঝান যে ধনিক শ্রেণী তার পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে ধনী ও গরীব পূর্বজন্মের পাপের ফলে গরীব। ('ইয়ে হ্যায় জিন্দেগী')

---

* Jean Luce Godard: Weekend / Wind from the East, Lorrimar প্রকাশিত। পৃঃ ১১১-১২, এবং ১৫৬-৬৬।

(৬) মানুষের রাজনীতি অর্থনীতি নয় একমাত্র ঈশ্বরই সব কিছুর নিয়ন্তা —সমাজ পরিবর্তন নয় ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই গরীবের ব্যক্তিক মুক্তির পথ। ('বাবা তারকনাথ', 'সন্তোষী মা')

(৭) পুঁজিপতিরা কেউ কেউ খারাপ, সবাই নয়। অর্থাৎ মানুষকে শ্রেণী হিসেবে নয়, ব্যক্তি মানুষ হিসেবে দেখা বিধেয়। একটি স্মাগলারেরও হৃদয় পরিবর্তন করা সহজ (বিশেষ করে সে যদি হয় নায়িকার পিতা)।

(৮) সমাজ ব্যক্তির, শ্রেণীর নয়। শ্রেণীসংগ্রাম ধারণাটাই আজগুবি। শুধু খারাপ পুঁজিপতির শাস্তিই যথেষ্ট।

(৯) সামন্ত প্রভুরা কদাচিৎ খারাপ। ভারতীয় চলচ্চিত্রে সামন্ত যুগ শ্রদ্ধেয়। রায় বাহাদুর, রায় সাহেব খেতাবগুলি শ্রদ্ধেয়। ব্রাহ্মণ জোতদার 'ঠাকুর' সম্প্রদায় সর্বদাই পূজ্য।

(১০) পুলিস অফিসাররা সর্বদা কর্তব্যনিষ্ঠ, আত্মত্যাগী ও দেশভক্ত।

(১১) অবস্থার পরিবর্তন সহজ, এবং উপায় বাহুবল।

(১২) নারী যৌবনে ভোগ্যবস্তু, পরে সেবিকা মাত্র। স্বামীর পদাঘাতে বিতাড়িত রমণীর উচিত স্বামীর পদতলের মাটি কপালে ঠেকানো ('চাচা ভাতিজা' ছবির একটি দৃশ্য)। ডক্টর রশ্মি ময়ূর তাঁর একটি 'সার্ভে' দ্বারা দেখিয়েছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রে শতকরা ৮২ ভাগ ছবিতে নারী পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট জীব, শতকরা ১৭ ভাগ ছবিতে সমকক্ষ ও মাত্র শতকরা এক ভাগ ছবিতে নারীর স্থান উঁচুতে।*

(১৩) গরীব তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শহীদ হলে তা অবশ্য চোখের জল ফেলার মত ঘটনা। কিন্তু কোন ধনীর পুত্র যদি তার জন্য শাস্তি মাথা পেতে নেয়—তা আরো গৌরবের।

হৃষিকেশ মুখার্জির 'নামকহারাম' ছবিতে এইভাবে ধনীর পুত্রকে (অমিতাভ বচ্চন) এমন গৌরবান্বিত করা হয়েছে যে, গরীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ নায়ক রাজেশ খান্না সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন, তার চরিত্রকে করুণার পাত্র করে অন্যায়ভাবে অমিতাভর চরিত্রকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে— যে-অভিযোগ সর্বাংশে সত্য—এবং এটাই আফিং চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য।

(১৪) মানুষ সমাজবিরোধী হয় যতটা সমাজ ব্যবস্থার জন্য, তার চেয়ে বেশি বংশের রক্তের দোষে। (যেমন 'ধরম-করম' ছবিতে)

এই হচ্ছে মাত্র কয়েকটি নমুনা। যৌনতা, সম্পদের প্রতি তীব্র লোভ ও

* 'Sunday' সাপ্তাহিক পত্রিকা, Films : A New Policy নিবন্ধ, পৃঃ ৮।

ধর্ম—এই সব জনগণের আফিংয়ের মৌতাতে ভরে সুমধুর রঙ ও সংগীতে ভরপুর হয়ে চলচ্চিত্রের ম্যাজিক লণ্ঠনের স্বপ্নের মোহসৃষ্টিকারী ক্ষমতায় এই সব অপসংস্কৃতির বীজ ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামে, শহরে, ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে—বাড়িয়ে চলেছে তার আফিং সাম্রাজ্য—বাড়িয়ে চলেছে প্রতিদিন তিনবার করে, তিনটেয় ছটায় ও নটায়। এবং আমরা নিদ্রা যাচ্ছি।

আমাদের কি করা উচিত? এতবড় সমস্যার কোন একটিমাত্র উত্তর নেই। এর জন্য বিশদ চিন্তার দরকার।

তবে একটা কথা নিশ্চিত, পুনশ্চ বলা দরকার চলচ্চিত্রের অপসংস্কৃতির সমস্ত প্রশ্নটি গভীরতর স্তরে রাজনৈতিক। এবং একমাত্র সঠিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দ্বারাই এর মোকাবিলা করা সম্ভব।

যাঁরা এটা বোঝেন না তাঁরা আজও মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। সমগ্র ভারতীয় জনগণের সংস্কৃতির সর্বনাশের জন্য একদিন তাঁরা দায়ী হবেন।

অপসংস্কৃতি ও আধুনিক গান

পরেশ ধর

প্রস্তরবিহীন পর্বত, তরঙ্গবিহীন সমুদ্র, জ্যোৎস্নাবিহীন চন্দ্র আর উত্তাপবিহীন সূর্যের কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক জীবনাভাসবিহীন আধুনিক গান নামে একটা কুৎসিত কিম্ভূতকিমাকার শ্রুতিকটু পদার্থের অস্তিত্ব আছে! রেডিওয়, রেকর্ডে, সিনেমায়, পূজো প্যাণ্ডালে আর পাড়ার ফাংশানে সারা বছর জুড়ে এই সব গানের কুরুচিকর উৎপাত সুস্থ লোকের স্বস্তি বিঘ্নিত করলেও কিছু বলার উপায় নেই, কেননা যুবসম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ এই সব তথাকথিত আধুনিক গান ভালবাসে, শোনে, শেখে এবং গায়। এই গানে তারা উন্মত্ত। এই গানের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে তারা টুইস্ট নাচে। এই সব গানগুলি বর্তমান যুগে অপসংস্কৃতির এক শক্তিশালী স্তম্ভস্বরূপ। এদের ভাষা সীমাহীন কদর্যতায় পঙ্কিল। এরা প্রকৃত সমাজ-সত্যকে আড়াল করে যুব-সম্প্রদায়কে কদর্য উত্তেজনায় মুগ্ধ করে রাখে। এরা গণ-বিরোধী স্থিতাবস্থার সহায়ক। এইসব গানের প্রকাশভঙ্গী ও বিষয়বস্তু যে কত রুচি-বিগর্হিত তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বেশি নয়, ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত—এই পাঁচ বছরে যে-সব গান জনপ্রিয় হয়েছে তার থেকে বাছাই-করা কিছু গানের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে: (১) চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি/তোমায় দেখে ফেলেছি/কোন জ্যোছনায় বেশি আলো/সেই দোটানায় পড়েছি। (২) অপবাদ হোক্ না আরো বয়েই গেল/নয় লোক জানাজানি হয়েই গেল/প্রেম কি তাতে কমে/বরং আরো বেড়েই গেল। (৩) তুমি ছাড়া কিছু আর বুঝব না/আর কারো ঠিকানা খুঁজব না/যাবে যেখানে/আমিও সেখানে/তোমারই পাশে যে দাঁড়াব। (৪) তোমাকে যে ভালবাসি অনেকেরই মত নেই/চুরি করে প্রেম করা ছাড়া কোন পথ নেই। (৫) তারে আমি চোখে দেখিনি/তার অনেক গল্প শুনেছি/গল্প শুনে তারে আমি/অল্প অল্প ভালবেসেছি। (৬) প্রিয়তম/কি লিখি তোমায়/তুমি ছাড়া আর কোন কিছু/ভাল লাগে না আমার। (৭) প্রেম করা যে কি সমস্যা/আজ পূর্ণিমা, কাল অমাবস্যা। (৮) বেশ করেছি প্রেম করেছি করবইত/রাধার মত মরতে হলে মরবইত। (৯) এবার ম'রে সুতো হব/তাঁতীর ঘরে জন্ম লব/পাছা-পেড়ে শাড়ি হয়ে/ঝুলবো তোমার কোমরে। (১০) শোন মন বলি

তোমায়/সব কোরো প্রেম কোরো না/প্রেম যে কাঁঠালের আঠা/লাগলে পরে ছাড়ে না। (১১) বদনাম হবে জেনেও/তবু ভালবেসেছিলাম,/চাঁদ মুখ দেখে কলংক/হোক না তাও এসেছিলাম। (১২) কি দারুণ দেখতে/চোখ দু'টো টানা টানা/যেন শুধু কাছে বলে আসতে।

দৃষ্টান্ত আর বাড়ানো নিরর্থক। শিক্ষা দীক্ষা, সামাজিক জ্ঞান, শিল্প চেতনা আর জীবনবোধের দিক থেকে এই সব গীতিকারেরা যে কত রিক্ত, কত দেউলিয়া, এদের গানের প্রকাশভঙ্গী আর বিষয়বস্তু যে কত নিকৃষ্ট, কত নিম্ন মানের, তা গানগুলির ছত্রে ছত্রে অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকট। গানগুলির একমাত্র বক্তব্য বিষয় হল প্রেমের নামে যুবক-যুবতীর মধ্যে রুগ্ন যৌন বিকার, অশ্লীল ন্যাকামি আর উদগ্র এবং নির্লজ্জ দেহ-লোলুপতা। এ কথা আজ অনেকেই বলে থাকেন যে, জঘন্য রুচিবিকৃতি যার ঘটেনি সেরকম কোন সুস্থ ব্যক্তি এই ধরনের গান লিখতে বা সুর করতে বা গাইতে পারে না। প্রত্যেক আধুনিক সৎ শিল্পে আধুনিক জীবন-সত্য প্রতিফলিত হয়। এটাই নিয়ম। কিন্তু উপরিউক্ত গানগুলিতে আধুনিক জীবন-সত্য প্রতিফলিত হয়েছে কি? গানগুলির ভাষায় মনে হয় আমাদের গোটা জীবন একটা স্থূল আর অশোভন ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় পর্যবসিত হয়েছে। শুধুমাত্র অসুস্থ দেহ-বিলাস ছাড়া জীবনে আর যেন কোন কাজ নেই।

তথাকথিত আধুনিক বাংলা গানের সুর সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, বাণীর দিক থেকে এই সব গান যেমন দেউলিয়া, সুরের দিক থেকেও ঠিক তাই। ইয়েনান ভাষণে সাহিত্য সম্পর্কে মাও-সে-তুঙ যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে একটা সুন্দর কথা আছে। তিনি বলেছেন, বিরাট ব্যাপক বিচিত্র মানবজীবনই হল সাহিত্যের মূল উৎস। সেখান থেকে উপাদান আহরণ করেই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সমাজে ইতিপূর্বে যে সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেটা নতুন সাহিত্য সৃষ্টির মূল উৎস নয়। অথচ এমনও দেখা যায়, অনেক গল্প অনেক উপন্যাস পড়ে জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই কোন ব্যক্তি কিছু গল্প উপন্যাস লিখে ফেললেন। কিন্তু তাঁর সে সব রচনা সার্থক হবে না, কেননা তিনি সাহিত্যের মূল উৎসে ডুব দিতে পারেননি। সুরের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে। একটি জাতির যত সুর ও সংগীত, তার সবটাই সৃষ্টি করেছেন জনগণ—অর্থাৎ গণ সংগীতই হল সুর সৃষ্টির মূল উৎস। রুশ দেশের বিখ্যাত সুরকার গ্লিংকা (Glinka) বলেছেন, "All music is created by the people. We composers only arrange it." (সমস্ত সংগীতের স্রষ্টা হলেন জনগণ। আমরা সুরকাররা সেগুলি শুধুমাত্র নতুন করে সাজাই।) অতএব, সার্থক সুর সৃষ্টি

করতে হলে গণ-সংগীত রূপ মূল উৎসে যেতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিম-বঙ্গে আজ যাঁরা রেকর্ড ও ছায়াছবির জগতে খ্যাতিমান সুরকার, তাঁদের প্রায় কারোরই গণ-সংগীতের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই। তাঁরা সুর করেন পাশ্চাত্য pop song-এর অনুকরণে কিংবা হারমোনিয়মের পর্দা খুঁজে খুঁজে কৃত্রিম উপায়ে। তাই তাঁদের সৃষ্ট সুরের মধ্যে আমরা মাটির স্বাদ পাই না, তাতে ফুটে ওঠে না দেশজ ব্যঞ্জনা। কৃত্রিম একটা সুরের মধ্য দিয়ে কৃত্রিম ও অসামাজিক কতগুলো কথা উচ্চারিত হয় মাত্র। অধিকাংশ গানেই শোনা যায় স্বর বিন্যাসের সূক্ষ্ম পরম্পরা ব্যাহত হয়েছে, অস্থায়ী থেকে অন্তরায় যাবার সময় দুটি অংশের অন্তর্নিহিত লজিক বা সুর-সংযোগ হয়েছে ছিন্ন। ফলে, সুরের কেন্দ্রানুগতা সৃষ্টি হয়নি। সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে কতগুলো এলোমেলো স্বরের যুক্তিহীন সমষ্টি— ইংরেজীতে যাকে বলে ক্যাকোফোনী (cacophony)। অবশ্য আধুনিক বাংলা গানের যে কুৎসিত ভাষা, তাতে বলিষ্ঠ দেশজ সুর আরোপ করলেও ভাল একটা কিছু হত না; বরং সৃষ্টি হত একটা বিদ্‌ঘুটে বস্তু। সুতরাং দেউলিয়া কথার সঙ্গে দেউলিয়া সুরের যোগ্য মিলনই ঘটেছে।

অথচ প্রকৃত জীবন কত বিরাট, কত ব্যাপক, কত বৈচিত্র্যময় আর কত সমস্যাসংকুল। আমরা যে তৃতীয় বিশ্বের বাসিন্দা, সেই বিশ্বের দিকে একবার তাকানো যাক। ভারতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় নয়া দিল্লী থেকে "সোভিয়েত ল্যাণ্ড" নামে একখানি ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে। এই পত্রিকার ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ওয়াই-বোগদানভ রচিত একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটির শিরোনাম হল "একটি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অপরিহার্য"। প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফটি এই রকম: "আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন অ্যামেরিকায় প্রতিদিন দশ হাজার নরনারী ও শিশু ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করে। এই সব দেশের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যত, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ছেলেমেয়ে দারিদ্র্যের ফলে স্কুলে যেতে পারে না। তৃতীয় বিশ্বের ২৫০ কোটি লোকের মধ্যে ১০০ কোটি লোক নিয়মিত অপুষ্টিতে ভোগে। ৮০ কোটি লোক নিরক্ষর। ৯০ কোটি লোকের মাথাপিছু দৈনিক আয় ৩ টাকারও কম।"

এই হল আমাদের সামগ্রিক জীবনের মোটামুটি একটা চিত্র। ভারতের দিকে ভাল করে তাকালে চিত্রটা আরো পরিষ্কার হবে। আমাদের দেশে সরকার পরিচালিত যতগুলি কর্মনিয়োগ সংস্থা রয়েছে তাদের মোট হিসেব থেকে জানা যায়, ভারতে বেকারের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ কোটির মতো।

কর্মনিয়োগ সংস্থাগুলি সবই শহরে অবস্থিত; আর সেখানে যারা নাম লিখিয়েছে তারা সকলেই শিক্ষিত। কিন্তু ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ লোক এখনও অশিক্ষিত, এবং তারা নাম সই পর্যন্ত করতে জানে না। আর তারা অধিকাংশই থাকে গ্রামাঞ্চলে। তাদের মধ্যে রয়েছে এক বিশাল বেকার বাহিনী। কিন্তু কোন কর্মনিয়োগ সংস্থা থেকেই তাদের কোন হিসেব পাওয়া যায় না। অনেক পরিসংখ্যানবিদের মতে ভারতে বেকারের সংখ্যা ৫ কোটিরও বেশি। গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জোতদার, মহাজন এবং পুলিসের যোগসাজসে কৃষকদের ওপর অত্যাচার বিশেষ কিছু কমেনি। ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধপেটা খেয়ে আর না খেয়ে কৃষকেরা ক্রমশই পরিণত হচ্ছে ভিখিরিতে। ভারতের ৭০ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। শহরাঞ্চলে শ্রমিক শোষণও কম ভয়াবহ নয়। তারা দিনের পর দিন গরিব থেকে আরো গরিব হচ্ছে। অথচ বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা—১০/১২ বছর আগেও যাদের পুঁজির পরিমাণ ছিল ২০০/২৫০ কোটি টাকার মতো—তাদের পুঁজির পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৬০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থাও শোচনীয়। সারা ভারতে মধ্যবিত্তদের ৪৬ শতাংশের দেনার পরিমাণ ২৪৯ কোটি টাকা। এই সমীক্ষায় ২০০ টাকা থেকে ৭৫০ টাকা মাইনের ব্যক্তিদের ধরা হয়েছে। সমগ্র ঋণের শতকরা ৭৫ ভাগ এদের ঘাড়ে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সমীক্ষাটি গ্রহণ করেছিল ১৯৭০ সালে। তখন টাকার মূল্য ছিল ৫৫ পয়সা। বর্তমানে টাকার মূল্য ২৫ পয়সা। সুতরাং ঋণের পরিমাণ এখন ৫০০ কোটি টাকারও বেশি হবে। এর ওপর আছে নির্মম সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। এই হল আমাদের জীবন। এই জীবনের কোনরকম ছায়াপাত হয়েছে কি আমাদের তথাকথিত আধুনিক গানে? এগুলির মধ্যে আছে শুধু একটা রুগ্ন জৈব কামনার ক্লেদ। তাই এগুলি আধুনিকও নয় আর গানও নয়।

আমাদের জীবনের আছে আরো বিভিন্ন রূপ। ভারতে কংগ্রেস শাসক ছিল সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস। তাদেরই স্বার্থ রক্ষার জন্যে সরকার দেশের মধ্যে ভয়ঙ্কর স্বৈরতন্ত্রী শাসন প্রবর্তন করে। জনগণের ওপর নেমে আসে অত্যাচারের খড়্গ। লুপ্ত হয় মৌল অধিকার। বিরোধী ব্যক্তিদের কারারুদ্ধ করা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে হত্যা করা হয় নির্বিচারে। কিন্তু তথাপি ভারতের গণশক্তি পরাভূত হয়নি। জনগণ সংগ্রাম চালিয়ে গেছে এবং আবার তারা ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। শ্রমিক,

কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা হচ্ছে সংঘবদ্ধ। বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছে। মুক্তির জন্য এই সংগ্রামের মধ্যে ফুটে উঠেছে মানুষের এক মহান্ রূপ। কিন্তু আশ্চর্য, তথাকথিত আধুনিক গানের মধ্যে মানুষের এই অনির্বাণ সংগ্রাম বিন্দুমাত্র অনুরণন তোলেনি। সুতরাং ওপরের উদ্ধৃত গানগুলিকে আধুনিক আখ্যা দেওয়া কোন কানা ছেলেকে পদ্মলোচন আখ্যা দেওয়ারই সামিল।

আর এক ধরনের তথাকথিত আধুনিক গান আছে যাদের মধ্যে অসুস্থ যৌন অভিব্যক্তির নোংরামি নেই এবং বক্তব্যও কোনরকম নেই। যাদের মধ্যে আছে শুধু একটা চমকপ্রদ আঙ্গিকসর্বস্বতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিখ্যাত এই গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে: প ম জ্ঞ র স—তার চোখের জটিল ভাষা / স দ প ম জ্ঞ র—পড়ে পড়ে বোঝার আশা / ম প দ ণ স—জানি শুধুই দুরাশা। আধুনিক গানের যাঁরা ভক্ত, তাঁরা এই গানটির উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন। এই গানের নতুনত্বে তাঁরা মুগ্ধ। তাঁরা আরো দাবি করেন—যেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক—যে এই গানটি অপসংস্কৃতির সহায়ক নয়। এ একটা মারাত্মক ভ্রম। শ্রেণী-বিভক্ত শোষণ-ভিত্তিক সমাজে ধনিক-বণিক শ্রেণীর শাসক যখন চায় না যে বিপর্যস্ত সমাজের সত্যরূপ সাহিত্য ও সংগীতে প্রতিফলিত হোক, তখন স্থিতাবস্থার আশ্রয়পুষ্ট কিছু শিল্পী সমাজ-সত্যকে সুকৌশলে আড়াল করে নিজেদের শিল্পের মধ্যে নানাধরনের অর্থহীন আঙ্গিকগত কায়দা আমদানি করে জনচিত্তরঞ্জন করতে এগিয়ে আসে। এই কায়দা আমদানির পশ্চাতে লুকিয়ে রয়েছে 'শিল্পের জন্যই শিল্প' (art for art's sake) নামক অসার তত্ত্বটি। তাই সমস্ত মার্কসবাদীই জানেন যে, এই ধরনের উদ্দেশ্যবিহীন আঙ্গিকসর্বস্ব শিল্প প্রতিক্রিয়ার হাতকেই শক্ত করে।

অনেকে মনে করেন শুধুমাত্র স্থূল যৌন আবেদনপূর্ণ শিল্প সাহিত্যই অপসংস্কৃতিমূলক। অপসংস্কৃতি বললেই তাঁদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অর্ধনগ্ন ক্যাবারে নাচ কিংবা 'বারবধূ' নাটকের ছবি। এই দৃষ্টিভঙ্গী ভুল। অপসংস্কৃতির সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এককথায় বলতে গেলে যে শিল্প সাহিত্য প্রকৃত সমাজ-সত্যকে (social reality) আড়াল করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে, সেই শিল্প সাহিত্যই অপসংস্কৃতিমূলক। একটি যাত্রাপালায় দেখানো হয়েছে এক মহৎ জমিদার খরার সময় চাষীদের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে ধান বিতরণ করছেন। আর একটিতে দেখানো হয়েছে বিরাট ধনী জমিদারের এক শিক্ষিত মেয়ে দরিদ্র ভূমিহীন চাষীর এক মূর্খ ছেলের প্রেমে

পড়ে গেছে। এই দুটি পালাই অপসংস্কৃতিমূলক, কেননা এখানে বিকৃত মিথ্যা সমাজ-সত্য তুলে ধরা হয়েছে। জমিদার ও চাষী শ্রেণীর তীব্র স্বার্থ-সংঘাতটাই প্রকৃত সমাজ-সত্য। সেখানে অবাস্তব শ্রেণী-সমঝোতা দেখাে সমাজের বিপ্লবী শক্তিকে বিভ্রান্ত করা হয়, বিপথগামী করা হয়। সুতরাং, যৌনতা যেমন অসুস্থ উত্তেজনা মারফত মানুষকে বিপথে চালিত করে অপসংস্কৃতি ছড়ায়, সমাজ-সত্য সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীও ঠিক একইভাবে অপসংস্কৃতিকে পুষ্ট করে। তথাকথিত আধুনিক বাংলা গানগুলি তাই প্রতি-বিপ্লবী শক্তির সহায়ক। সত্যি কথা বলতে গেলে এগুলি আধুনিকও নয় এবং গানও নয়।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। কোন শিল্প বর্তমানকালে সৃষ্টি হয়েছে বলেই তা আধুনিক হবে, এমন কোন কথা নেই। আবার পঁচিশ, পঞ্চাশ বা একশো বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে বলেই সে শিল্প আধুনিক হতে পারবে না, এ কথাও ঠিক নয়। শিল্পের আধুনিকতা কালিক ব্যাপার নয় বলেই তা বর্তমানকালের ওপর নির্ভর করে না। যে শিল্পে কতগুলি মূল জীবন-সত্য প্রতিফলিত হয়, সেই শিল্পই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক। সে শিল্প একশো বছর আগেরও হতে পারে আবার এক বছর আগেরও হতে পারে। 'নীলদর্পণ' একশো বছর আগে রচিত হওয়া সত্ত্বেও সে নাটক এখনো আধুনিক, কেন না নীলকর সাহেবদের কৃষক শোষণ ও সামন্ত প্রভুদের কৃষক শোষণ সমশ্রেণীভুক্ত এবং ঐ শোষণের মূল চরিত্র আমাদের গ্রাম্য সমাজে আজও রূঢ় বাস্তব। ৫০-৬০ বছর আগে লেখা হলেও মুকুন্দদাসের অনেক গান এখনো আধুনিক, কেন না সেই সব গানের মর্মসত্য আমাদের সমাজে আজও বর্তমান। কিন্তু "কি দারুণ দেখতে" গানখানা মাত্র কয়েক মাস আগে সৃষ্টি হলেও তা আধুনিক নয়। প্রকৃত আধুনিক শিল্পে শোষণ-ভিত্তিক সমাজের মূল দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোন-না-কোন ভাবে প্রতিফলিত হয়ে তাকে দীর্ঘদিন ধরে আধুনিক করে রাখে। বর্তমানের তথাকথিত আধুনিক গানগুলির মধ্যে আমাদের সমাজের মূল দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলি বিন্দুমাত্র রূপায়িত হয়নি। তাই এগুলি প্রকৃত অর্থে আধুনিক নয়। তাই এগুলি অপসংস্কৃতির কালো হাত জোরদার করছে।

প্রতিবাদের ঝড় প্রতিরোধের ফসল

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

কিছুকাল যাবৎ পশ্চিমবাংলায় সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি সম্পর্কে যে বিতর্ক, আলোচনা, সংগ্রাম ও সৃষ্টির পালা শুরু হয়েছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য সেদিক থেকে নীরব বলা চলে। তার অর্থ এই নয় যে, অপসংস্কৃতির দাপট একমাত্র পশ্চিমবাংলাতেই সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চরিত্রে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাটি মোটেই স্পষ্ট নয়। কেন্দ্রের একচেটিয়া আধিপত্যের সুবাদে নানান বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি বারবার হোঁচট খেয়েছে ঐক্য গড়ার পথে। অর্থনীতিতে অসম বণ্টন ব্যবস্থা রাজ্যে রাজ্যে নিয়ে এসেছে ব্যবধানের অভিশাপ। সংঘর্ষ ও অনৈক্যের অনেক লজ্জার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে।

কিন্তু ভারতবর্ষের নানান বর্ণ, ধর্ম, ভাষার মানুষ সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে নিজেদের তাগিদে বারবার হাত বাড়িয়েছে একে অন্যের দিকে। জানতে চেয়েছে পরস্পর পরস্পরকে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিতে ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ঐক্যের পথে সে মূলধন করেছে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে।

আমাদের দেশে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যক মেহনতকারী মানুষের যে সংগ্রাম চলছে প্রতিনিয়ত তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। বিপদটা আজ এমনই সর্বগ্রাসী মূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, তাকে চিহ্নিত করে সরাসরি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সম্মুখভাগে 'অপ' উপসর্গ এবং 'সুস্থ' শব্দটি বসাতে হয়েছে। যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে আজ পশ্চিমবাংলার মাটিতে, অচিরে তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। পশ্চিমবাংলা সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে মাত্র।

দুই

এ সংগ্রাম চলেও আসছে বহুকাল ধরে—বলা চলে প্রায় মানবসভ্যতার জন্মকাল থেকে। জমির ওপর কতিপয় মানুষের দখলদারীর সঙ্গে সঙ্গে শোষণ-

ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পাশাপাশি শোষিত শ্রেণীর সংগ্রাম ছোট-বড় আকারে নিরন্তর ঘটেই চলেছে। একটা সমাজব্যবস্থা গিয়েছে আর একটা সমাজব্যবস্থা এসেছে। নতুন নতুন সমাজব্যবস্থায় মানুষ তার অধিকার প্রয়োগ করে ঘটাতে চেয়েছে সভ্যতার বিকাশ। অমনি চোখ রাঙিয়েছে সমাজ প্রভুদের দাপট। সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। মানুষ তার বুকের রক্ত ঢেলে সৃষ্টি করেছে আগামী দিনের জন্যে জ্বলন্ত ইতিহাস। পৃথিবীর দেশে দেশে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ শোষণহীন সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী মানুষ সেই জ্বলন্ত ইতিহাসকে বুকে করে পা বাড়িয়েছে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, অফিসে-আদালতে, সংস্কৃতির আঙিনায়।

এই ইতিহাস সৃষ্টি করতে মানুষকে অনেক বাঁক, অনেক মোড় পার হতে হয়। চলতি ব্যবস্থায় অভ্যস্ত মানুষ থাকে বিভ্রান্ত। বিভ্রান্তিকর নীতির কাছে প্রাথমিকভাবে সে আত্মসমর্পণ করে। হিটলার যেদিন সমাজতন্ত্রের বুলি দিয়ে ফ্যাসিবাদের কালো দৈত্যটাকে বিশ্বময় বিস্তার করতে চেয়েছিল সেদিনও বহু মানুষ ছিল বিভ্রান্ত। ভারতবর্ষের বুকে বিগত কয়েকটি বছরে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বুলির আড়ালে স্বৈরতন্ত্রের অভ্যুত্থানের দিনগুলিতেও মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু নিশ্ছিদ্র অন্ধকারময় অরণ্যের বুক চিরে উজ্জ্বল সূর্যের আলো যেমন দিক্‌হারা মানুষকে সাহসী করে তোলে তেমনি ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী ভূমিকাও ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সচেতন করে সংগ্রামের ময়দানে সামিল করেছে।

সভ্যতা বিনষ্টকারী রোগবীজাণু-সর্বস্ব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশসাধনের জন্য সংগ্রামের আহ্বানেও মানুষ তাই সচকিত হয়ে উঠেছে। সচকিত মানুষকে বিভ্রান্তিতে ডুবিয়ে রাখার অপকৌশলও চলেছে। অপসংস্কৃতির যারা ধারক এবং বাহক তারা চলতি সমাজব্যবস্থাটাকে বজায় রাখতে চায়। পক্ষান্তরে যারা সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে তারা চায় শ্রেণীহীন সুস্থ সুন্দর সমাজব্যবস্থার পত্তন। বিষাক্ত কীটের ধ্বংসকামী দংশন থেকে তারা সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সুন্দর টবে বসানো সমগ্র গাছ পাতা ফুলটিকে। এ এক কঠিন দুরন্ত সংগ্রাম। বহুদিনের সংগ্রাম। সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে তাই এ সংগ্রাম ওতপ্রোত জড়িত।

সুস্থ সংস্কৃতি কি? সুস্থ সংস্কৃতির জন্যে সংগ্রাম কেন?

সুস্থ সংস্কৃতি বলতে আমরা এটাই বুঝি, যা মানুষকে সুস্থ চেতনায় সমৃদ্ধ করে তোলে, সমস্ত শরীর মন ঘিরে জেগে ওঠা সেই চেতনাবদ্ধ মানুষ যাতে

বৈষম্যহীন সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতে পারে এবং সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্য পায়ে পা মিলিয়ে পথ হাঁটতে পারে।

অপসংস্কৃতি কি? অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেন?

সুস্থ সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝেছি তার বিপরীত সবকিছুই অপসংস্কৃতি। যা মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, খর্ব করে, মানুষকে পিছনের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, অন্যায়কে পর্যুদস্ত করার সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়, সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ার কাজ থেকে সুকৌশলে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামই হল অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

তিন

পৃথিবীর দেশে দেশে মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর ক্রমাগত শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের প্রতিটি সংগ্রামে অনুপ্রেরণা লাভ করে তার অতীতের ইতিবাচক ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে। এর মধ্যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে বর্তমান অথবা আগামী দিনের সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আজকে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির লড়াইয়ের সামিল অসংখ্য গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা তাই স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রেরণা লাভ করছেন অতীত ও বর্তমানের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডগুলি থেকে। চমকে উঠেছে ধনিকশ্রেণী ও ভূস্বামীদের দল।

অতি সম্প্রতিকালে ধনিকগোষ্ঠী পরিচালিত সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে আমাদের অতীত ঐতিহ্যগুলিকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চলছে। এমনকি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের, বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্যের যা কিছু সুন্দর, যা-কিছু মানবসভ্যতার বিকাশে সাহায্যকারী তাকে যাতে মানুষ গ্রহণ করতে না পারে, যাতে বর্তমান এবং আগামী দিনের মানুষ এক নিরালম্ব ভাবচেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে নিরন্তর নিজেকে খণ্ডিত করতে পারে তার জন্য "অতীত বলে আমাদের কিছু নেই, বর্তমানের স্রোতে গা ভাসানোটাই বড় কথা" অথবা "অতীত এবং বর্তমানের সব কিছুই খারাপ" কিংবা "পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার যা-কিছু সংস্কৃতি তা তাদেরই একচেটিয়া, তার থেকে সাধারণ মানুষের গ্রহণের কিছু নেই" ইত্যাদি শ্লোগান তুলে মানুষের ধারাবাহিক সংগ্রামটিকে ভোঁতা করে দেবার কৌশল চালানো হচ্ছে।

লেনিন বলেছিলেন, "বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির যা-কিছু সুন্দর তা

আমাদের গ্রহণ করতে হবে।" লেনিনের এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, পতনের জন্যে লাফ দেওয়া নয়, উত্তরণের জন্যে সিঁড়ি ভাঙাই সমাজ-সচেতন মানুষের কাজ। প্যারি কমিউনের পথ বেয়ে বিশ্বব্যাপী নবজাগরণের যে সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা এক প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। সে জোয়ারের ঢেউ ভারতবর্ষের বুকেও আছড়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রবেশ এদেশের বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত মানুষদের চিন্তা-চেতনায় যে নতুন ফসল বুনেছিল তার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটি দিকই আছে। ইতিবাচক দিকগুলিকে অবশ্যই আমরা স্মরণ করব, আয়ত্ত করব, প্রয়োগ করব। নবজাগরণের সেই যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতার প্রকাশ যে কেবল কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক চিত্রশিল্প প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সমাজের বুকে ধর্মীয় কুসংস্কার, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডূকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুস্থ সুন্দর মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার কার্যকরী ভূমিকাও ছিল। সেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি হিসাবে আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে। পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র-প্রেমচন্দ-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষিরোদপ্রসাদ-অমৃতলাল-অমরেন্দ্র-শিশিরকুমার-অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-নন্দলাল-দেবীপ্রসাদ-বিনোদবিহারী-যামিনী রায়-নজরুল-সুকান্ত-মানিক-মুকুন্দদাস-গোমানি-রমেশ শীল-ডি. জি,-প্রমথেশ-দেবকী বসু প্রমুখ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষকে আমরা পেয়েছি—পরস্পরের মধ্যে নানান মতপার্থক্য, স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও, যাঁদের সৃষ্টিকর্মগুলির মধ্য দিয়ে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে এমন মানুষও আছেন যাঁরা পরিপূর্ণ সাম্যবাদী আদর্শের আলোকে তাঁদের শিল্পকীর্তিকে গণমুখী করে তুলেছেন ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে সমসাময়িক বাস্তবতার সার্থক সংযুক্তি ঘটিয়ে। এসব যাঁরা অস্বীকার করেন এবং করাতে চান তাঁরা কিন্তু আসলে বর্তমানের বুকে এমন এক অন্ধকারের গহ্বর তৈরী করতে বদ্ধপরিকর যার কবলে অতীত এবং ভবিষ্যৎ মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়।

কিন্তু যে মানুষ আবিষ্কার করেছে আগুন, শক্ত ধাতুকে ব্যবহারিক জীবনের অঙ্গীভূত করেছে, ভাষা যুগিয়েছে মানুষের মুখে, লিপির মাধ্যমে রচনা করেছে ইতিহাস, গড়ে তুলেছে সংস্কৃতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বারবার, উন্মুক্ত কণ্ঠে গেয়েছে শেকল ভাঙার গান—মানুষের সৃষ্টি করা সেই উজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে মুষ্টিমেয় একদল মানুষ তার শোষণ-ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার জন্য নানান অপকৌশলে যতই না কেন মানুষকে

আবার দাসত্বের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুক—মানুষই একদিন তাদের মৃত্যুঘণ্টায় সজোরে আঘাত করবে।

চার

পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে মদগর্বী ধনবাদীদের অহঙ্কার চুরমার করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে মানুষের অধিকার। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষের প্রদীপ্ত ভূমিকায় বিশ্বের মেহনতী মানুষ আজ অনুপ্রাণিত। অবক্ষয়ী বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের নামাবলীর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে কালো দৈত্যটা। মানুষের সমগ্র সুস্থ চিন্তা চেতনায় নগ্ন আক্রমণ নেমে আসছে। এ দেশের মানুষও তার থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার এটাই নিয়ম। জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে মানুষকে সীমাহীন বঞ্চনার মধ্যে ডুবিয়ে রাখার পাশাপাশি শোষকশ্রেণী সংস্কৃতিকেও তার কব্জায় রাখতে চায়। একটা অসুস্থ সমাজব্যবস্থা, অসুস্থ পরিবেশে সংস্কৃতির স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শী বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রীর মত সংস্কৃতিও তখন উৎপাদনের অঙ্গ হিসেবে পণ্যে পরিণত হয়। লেনিন বলেছেন: "ব্যক্তিগত মালিকানার উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, শিল্পী সেখানে শিল্প সৃষ্টি করে বাজারের জন্য, ক্রেতারা তার প্রয়োজন।" যেখানে বাজার তৈরীর প্রশ্ন স্বভাবতই সেখানে প্রতিযোগিতা চলে। এইসব বাজার তৈরীর জন্যে আছে পুঁজির মালিকদের উদার হস্ত। যে ক্যাবারে ছিল বিত্তবানদের আরাম-বিলাসের উপকরণ হিসাবে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ তাকে খোলা বাজারে এনে হাজির করা হল। শুরু হল নাটকে যাত্রায় চলচ্চিত্রে নগ্ন প্রতিযোগিতার খেলা। নারীত্বকে অপমানিত করে নগ্ন নারীবক্ষের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার আদিম প্রবৃত্তির বাহ্যিক প্রকাশ ঘটতে থাকল। ভবিতব্যের দোহাই দিয়ে কবচ মাদুলীর পসরা সাজিয়ে নরম মখমলের কার্পেটে জাঁকিয়ে বসল গুরুজীদের দল।

সত্তর ভাগ দারিদ্র্যপীড়িত নিরক্ষর মানুষের সামনে যে নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট, ভূমিহীন কৃষকের দুঃসহ যন্ত্রণা, বেকারের সংখ্যাতীত মিছিল, জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা, পুরুষশাসিত সমাজে নারীত্বের দুঃসহ প্রতিচ্ছবি—অর্থাৎ এককথায় চরম সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে তার প্রাত্যহিক জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এবং অবসর মুহূর্ত বড় নির্মম। মঙ্গলের চিন্তায় অস্থির

মানুষের কাছে অবসর মুহূর্তগুলি আজ আতঙ্কের সামিল হয়ে উঠেছে। বেকারত্বের জ্বালায় অস্থির যুবক-যুবতী ঘরে টি`কতে পারে না। সে বেরিয়ে আসে রাস্তায় অলিতে-গলিতে। তখন তার সামনে ছুঁড়ে দেওয়া হয় সস্তা পণ্যসামগ্রী। বেপরোয়া উত্তেজনার শিকারে পরিণত হয় সে। অনুকরণের মাধ্যমে সমগ্র সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে ভুয়ো সম্মান প্রতিষ্ঠায় সময় কাটায়। যে মানুষ কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে অফিসে-আদালতে কাজ করে তার অবসর মুহূর্তের চিন্তায় জড় হয়, সংসার, স্ত্রীপুত্র পরিবার, শিক্ষাব সংকট, চিকিৎসার সংকট, ভাত কাপড়ের সংকট। সংকটগ্রস্ত মানুষের সামনে তখন আমদানি করা হয় সস্তা চিত্তবিনোদন সামগ্রী, বিচ্ছিন্নতাবাদী জীবনদর্শন, ঈর্ষা, কলহ, সহজে অবস্থা বদলাবার মাধ্যম হিসাবে লটারী, রেস জুয়া সাট্টা কবচ মাদুলী শনি লক্ষ্মী ইত্যাদি। "কি করে সময় কাটাবো" এই চিন্তায় ছটফট করতে করতে ট্রেনের কামরায় দু'টাকার বই এক টাকা অথবা পঞ্চাশ পয়সায় কিনে বুঁদ হয়ে পড়ে। লঘু অপরাধ বিজ্ঞানের সিরিজ ঘুরতে থাকে হাতে হাতে। ওয়ান ডায়মণ্ড থ্রি স্পেডের ধাক্কায় সমাজভাবনার গতি হয়ে যায় রুদ্ধ। বৈচিত্র্যহীন অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা, অন্ধকারময় ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রসমাজ উত্তরণের সহজ পথ হিসেবে বেছে নেয় 'গণটোকাটুকি'র রাস্তা। স্থূল উত্তেজনা এবং হতাশার পরিণতিতে হাতে হাতে ঘুরতে থাকে ম্যানড্রেক্স অর্থাৎ মানুষের সমগ্র জীবনচর্চা, তার সুস্থ চিন্তাভাবনাকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সুকৌশলে চলতে থাকে প্রকাশ্যে এবং নেপথ্যে।

পাশাপাশি আমরা সেই সমাজব্যবস্থার দিকে যদি তাকিয়ে দেখি, যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আজ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষকে তার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তারা বেকারত্বকে সমূলে উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেশি অবসর দিয়েছে মানুষকে। তফাত হল এই যে, দেশের মানুষের কাছে অবসর মুহূর্ত আতঙ্কের নয়, আনন্দের। কারণ তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে কাজ হল জাতিগঠনের কাজ, সমাজ পুনর্গঠনের কাজ, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করার কাজ, রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়ার কাজ—সর্বোপরি সভ্যতা বিকাশের কাজ।

পাঁচ

আমাদের দেশের মুক্তিকামী মানুষ শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার সুফলটুকু

কামনা করে বলেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। সামগ্রিক সেই শ্রেণীসংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে আজকে বহু-উচ্চারিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এইরকম একটা সংঘর্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু পণ্ডিত মানুষ বলছেন যে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যখন অপসংস্কৃতি থাকবেই তখন সমাজ-ব্যবস্থাটা না পালটানো পর্যন্ত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলে লাভ কি? গত কয়েকটি বছরে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যে সংগ্রাম চলেছিল তখনও এইসব ব্যক্তি বলেছিলেন যে, ওরা অধিকার ফিরিয়ে দেবে বলে তো আর অধিকার কেড়ে নেয়নি, কাজেই অধিকার চাই বলে আওয়াজ তোলার চেয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই মূল কাজ।

তর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, উক্ত ধারণাগুলি গ্রহণ-যোগ্য নয়। চলতি ব্যবস্থার অবসান দাবী করার অর্থ ঈপ্সিত ব্যবস্থার অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে যায় বলেই চলতি ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই দাবি তোলে। শাসকগোষ্ঠী দাবি মেনে নেবে কি নেবে না তার জন্য দাবি তোলা নয়, দাবি তোলার কারণ মানুষকে সেই দাবির সপক্ষে সমবেত করে মানুষের অধিকার অর্জন করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়া যাবে কি যাবে না তা নির্ভর করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ওপর। এবং সেই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন হয় বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ এবং বাস্তব অবস্থায় দাঁড়িয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামটিকেও আমাদের সেই নিরিখে বিচার করা দরকার। সুস্থ সংস্কৃতির পরিবেশ গড়ে তুলতে গেলে অপসংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজ অপরিহার্য। অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি ছাড়া কোন অলৌকিক শক্তি যে মঙ্গলসাধন করতে পারবে না অথবা প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সমাজ বদলের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না করলে যে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, একথা যতক্ষণ না মানুষে হৃদয়ঙ্গম করছে ততক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় অসম্ভব। এ কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য, মানুষকে সচেতন করার জন্য চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের গুরুদায়িত্ব আছে।

এ কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসংঘর্ষের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া চিন্তাভাবনার সঙ্গে গণমুখী চিন্তাভাবনার সংঘর্ষও অনিবার্য। দীর্ঘকাল ধরে মানুষ বুর্জোয়া সংস্কৃতির মৌতাতে আচ্ছন্ন

হয়ে আছে। বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ভাব ভাষা শৈলী পরিণতি এবং অন্যদিকে গণমুখী শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ভাব ভাষা শৈলী পরিণতি ভিন্ন হতে বাধ্য। এই যে ভিন্নরূপে ভিন্ন পরিণতির ইঙ্গিত তার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা সহজ কাজ নয়। বর্তমানে যে অসংখ্য লেখক শিল্পী কলাকুশলী বুদ্ধিজীবী মানুষের সপক্ষে তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে নিয়োজিত রেখেছেন, একথা বললে ভুল হবে যে সেই সব সৃষ্টিকর্মের প্রতি মানুষ ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। যে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতির পাদপীঠে মানুষ লালিত-পালিত তার বিকল্প রূপকে অনায়াসে মেনে না নেওয়ার মধ্যে একদিকে থাকে বিরোধিতা অন্যদিকে থাকে দ্বিধাগ্রস্ততা। যাবতীয় প্রচার মাধ্যমগুলি ধনিকগোষ্ঠীর কব্জায়। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সেই প্রচার ছড়িয়ে গিয়েছে। অর্থ আর ব্যাপক প্রচারের জোরে চটকদারী সংস্কৃতির মাধ্যমে গণমুখী সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করার পরিকল্পনাও রয়েছে। বুর্জোয়াদের তৈরী করা চমকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্থিতধী মনের শিল্পী সাহিত্যিকদের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। বুর্জোয়ারা অর্থ, যশ ও প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে লেখক শিল্পীদের ক্রয় করে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, আর গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন লেখক শিল্পীরা নিজেদের নিয়োজিত করে মানুষের কল্যাণের স্বার্থে।

এই বিরোধের মাঝখানে বুর্জোয়ারা এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে ডুবে থাকা মানুষ একথা প্রচার করে বিভ্রান্ত করতে চায় যে, যাদের তোমরা অপসংস্কৃতির ধারক বাহক বলে আক্রমণ করছ তাদের শিল্পশৈলী অনেক পরিশীলিত, তাদের কলমের তুলির জোর আছে, রূপকল্পে তারা সিদ্ধহস্ত, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যারা সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাইছে তাদের চিন্তা চেতনা বদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, কেবল প্রচারমুখী বিষয়বস্তুর কচকচানি, উন্নত শৈলী বলতে কিছু নেই, ইত্যাদি।

এসব কথা যাঁরা বলেন হয় তাঁরা আচ্ছন্নতায় মগ্ন অথবা মানুষকে পেছনের দিকে টেনে রাখার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বিশ্ব ধনতন্ত্র আজ চরম সংকটের মুখোমুখি। এই সংকট থেকে তার পরিত্রাণের কোন রাস্তা নেই। অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে ধনিক শ্রেণীর সংস্কৃতিও চরম অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। নতুন সে কিছু দিতে পারছে না, পারবেও না। এই পরিণতির আর্ত চিৎকার শোনা যায়:

"অন্ধকার হয়ে আছি, অন্ধকার থাকবো, অন্ধকার হব।"

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

পাশাপাশি মানুষের সপক্ষে সৃষ্টিতে মাতোয়ারা কবিকণ্ঠের আশাবাদী কণ্ঠস্বর শুনি :

"ভালুক নাচে ময়না নাচে
সুদেল বাণিজ্যে ;
আগুনে পোড়া যমুনাবতী
জীবন খুঁজছে।" (দীপংকর চক্রবর্তী)

অথবা

"বৈশাখের ঝড় শেষে শক্ত বাঁধা চৈতালীর নীড়
সব স্মৃতি সূর্য হলে আহা বসতীতে বসন্তের ভীড়।"
(প্রণব চট্টোপাধ্যায়)

ছয়

অবক্ষয়ের বুক চিরে নতুন শক্তির এই অভ্যুদয়কে আমরা স্বাগত জানাবো। 'রক্তকরবী'তে ধনবাদী যন্ত্রসভ্যতার নিঃস্ব আর্ত চিৎকারের পাশাপাশি আমরা শুনেছি ভোরের আলোয় ফসলের গান। "লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনার" কবি বুদ্ধদেব বসুদের নির্লজ্জ প্রয়াসের বিরুদ্ধে সুকান্তর দৃপ্তবাণী "রক্তে আনো লাল/রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল" আমাদের সাহসী করেছে। মাণিকের ভুবন মণ্ডল আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রত্যয়নিষ্ঠা জাগিয়ে সচেতন করেছে আমাদের। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রগতি সাহিত্যের সপক্ষে, গণনাট্যের তীরভাঙা জোয়ারের কলোচ্ছ্বাস আমাদের ধমনীতে সদাচঞ্চল। অতীতের নির্যাস বুকে করে সমাজসচেতন লেখক শিল্পীরা পা বাড়িয়েছেন ভবিষ্যতের নিশানার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে। একক শক্তি থাকে দুর্বল কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শক্তির দাপটের ঢেউকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সেই সম্মিলিত স্পন্দন আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অপসংস্কৃতির দিক থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনতে হলে সুস্থ সংস্কৃতির আঙিনাকে সমৃদ্ধ করা দরকার। শোষিত মানুষের সপক্ষে বিষয় ভাবনার অঙ্গ হিসাবে তার জীবনদর্শন ও জীবনদ্বন্দ্বকে অনুভব ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ সৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ধারালো করে গড়ে তুলে যে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ সস্তা পণ্যের বাজারে আকৃষ্ট হয়েছে তাদের আকর্ষণ করা যাবে সুস্থ সংস্কৃতির পাদপীঠে।

মানুষের কাছে আপন আপন সৃষ্টিকে বোধগম্য ও প্রিয় করে তুলতে হলে কোন্ শিল্পশৈলী তার কাছে গ্রহণীয় তা উপলব্ধির মধ্যে আনা দরকার। চোখের সামনে যেন থাকে আমাদের দেশের সত্তর ভাগ দরিদ্র নিরক্ষর মানুষ। কেবল চিত্তবিনোদনের জন্য নয়, বিষয় ভাবনাকে বুঝতে সাহায্য করবে এমন শিল্পশৈলীই আজ কাম্য।

ধর্মকে গ্রহণ না করলে, ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকলে সে অধার্মিক, সে পাপী ইত্যাদির আতঙ্ক ছড়িয়ে অপসংস্কৃতি কিভাবে মানুষকে দাসত্বের কালো

যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে, কিংবা নিরন্ন মানুষের ক্ষুধা এবং সংগ্রামকে অসুস্থ যৌনতা এবং হতাশার মোড়কে গেঁথে কিভাবে কুৎসা ছড়িয়েছে এবং ছড়াচ্ছে মুষ্টিমেয় মানুষ; মানুষের অধিকারকে পদদলিত করে মুষ্টিমেয় শোষকগোষ্ঠীর অত্যাচারের বীভৎস কাহিনীকে আগামী দিনের মানুষের কাছে দলিল হিসেবে রেখে দেবার জন্য শিল্পকর্মকে সহজ অথচ বলিষ্ঠভাবে গড়ে তোলা দরকার। তার অর্থ এই নয় যে, উন্নত শিল্পশৈলী থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে রাখা হবে। আজকের সুস্থ সংস্কৃতির জন্য ব্যাপক মানুষের সংগ্রাম আগামী দিনে গণসংস্কৃতির যে কেন্দ্রভূমি তৈরী করবে সে পথে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে স্বাভাবিকভাবে। উন্নত শিল্পশৈলীর সঙ্গে সর্বহারার সংস্কৃতির সংযুক্তি সাধনের কাজে তাই নিরলস অনুশীলন প্রয়োজন। জমিতে ভালো ফসল ফলাতে হলে বারবার কর্ষণ করতে হয়। সমস্যাও আছে। জীবনজীবিকার প্রাত্যহিক সংগ্রামে এই সব লেখক শিল্পীরাও ক্ষতবিক্ষত। তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যা, সময়ের অভাব, সুযোগের অভাব, প্রচারের অভাব, প্রকাশমাধ্যমের অভাব—এসব আছে। কিন্তু যেহেতু সমস্ত কাজটাই কঠিন তাই অগ্রণী বাহিনী হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর আগুয়ান সংগ্রামের পাশাপাশি লেখক শিল্পীদেরও সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হয়।

সমাজসচেতন লেখক শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চার প্রতিবাদের ঝড়ের দাপটে এবং প্রতিরোধী ফসলের আহ্বানে মানুষ সচেতন হয়ে আকর্ষণ অনুভব করবে। সংগ্রামের রথচক্র এভাবেই তার গতিপথ নির্ধারণ করে। মানবসভ্যতার বিকাশ তো কোথাও থেমে থাকে না। চিরজঙ্গম মানবধারায় সভ্যতার বিকাশও চিরচলিষ্ণু। সেই চিরজঙ্গম মানুষের ধারাবাহিক অগ্রগতির সংগ্রামে ঐতিহাসিক নিয়মেই বেশী বেশী করে গড়ে উঠতে থাকে সমাজসচেতন মানুষদের সংঘবদ্ধ শক্তি।

যে শ্রমিক নিরাপত্তাহীনতার সামনে দাঁড়িয়েও লড়াই করছে, যে যুবক বেকারত্বের কারণগুলিকে উপলব্ধি করে সেই কারণগুলিকে দূর করার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যে ছাত্র ভবিষ্যতের সূর্যকে প্রত্যক্ষ করে অনুকরণকে ঘৃণা করতে শিখেছে, যে ক্ষেতমজুর তার অবসর মুহূর্তে ঝুমুর গানে মানুষের মুক্তির শব্দ বসিয়ে প্রতিবেশীকে সচেতন করতে প্রয়াসী হয়েছে, যে শিল্পী বুর্জোয়াদের সমস্ত প্রলোভন এবং ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে শ্রমজীবী মানুষকে আত্মীয় বলে অনুভব করেছে—সংখ্যায় তারা কম হলেও ক্ষতি নেই। তাদের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য মানুষের মনে মনে সঞ্চারিত হোক। অবক্ষয়ের শরীরে আমূল বিদ্ধ হোক অভ্যুদয়ের অগ্নিশলাকা। সংঘবদ্ধ শক্তির এই দাপট গোর্কির নায়কের মত মাথা তুলে সদর্পে ঘোষণা করুক "আমাদের নিরন্ন জীবন নিয়ে কুৎসা করার অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে।"—তোমরা দূর হটো।